যোগী নানাপ্রকার আসন ও অঙ্গসংস্থান দেখাইতে লাগিলেন। পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া বাম করতলের উপরে দক্ষিণ করপৃষ্ঠ সংস্থাপন পূর্ব্বক ঐভাবে উভয় হস্ত বক্ষে ধারণ ও চক্ষু নিমীলন করিয়া বলিলেন, ইহাই সকল প্রকার সাকার ধ্যানের প্রশস্ত আসন। পরে ঐ আসনেই উপবিষ্ট থাকিয়া বাম ও দক্ষিণ হস্তদ্বয় বাম ও দক্ষিণ জানুর উপরে রক্ষাপূর্ব্বক প্রত্যেক হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত ও অপর সকল অঙ্গুলী ঋজু রাখিয়া এবং ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিলেন, ইহাই নিরাকার ধ্যানের প্রশস্ত আসন। ঐকথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বলপূর্ব্বক মনকে সাধারণ জ্ঞানভূমিতে নামাইয়া বলিলেন, "আর দেখান হইল না; ঐরূপে উপবিষ্ট হইলেই উদ্দীপনা হইয়া মন তন্ময় ও সমাধিলীন হয় এবং বায়ু ঊর্দ্ধগামী হওয়ায় গলদেশের ক্ষতস্থানে আঘাত লাগে; ডাক্তার ঐজন্য সমাধি যাহাতে না হয় তাহা করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছে।" যুবক তাহাতে কাতর হইয়া বলিল, 'আপনি কেন ঐ সকল দেখাইতে যাইলেন, আমি ত দেখিতে চাহি নাই।' তিনি তদুত্তরে বলিলেন "তা ত বটে, কিন্তু তোদের একটু আধটু না বলিয়া, না দেখাইয়া থাকিতে পারি কৈ?" যুবক ঐ কথায় বিস্মিত হইয়া ঠাকুরের অপার করুণা এবং তাঁহার মনের অলৌকিক সমাধিপ্রবণতার কথা ভাবিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ঠাকুরের দৈনন্দিন ব্যবহারসকলের মধ্যেও এমন মাধুর্য্য ও অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত যে, নবাগত অনেক ব্যক্তি তাহা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া পড়িত। দৃষ্টান্তস্বরূপে নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাটি আমরা মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বন্ধুবৎসল কনিষ্ঠ সহোদর পরলোকগত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। যথা সম্ভব তাঁহারই ভাষায় আমরা উহা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব—

উপেন্দ্র * আমার বিশেষ বন্ধু ছিল, বিদেশে ডেপুটিগিরি চাকরি করিত। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পরে তাহাকে চিঠিতে লিখিয়াছিলাম, 'এবার যখন আসিবে তখন তোমাকে এক অদ্ভুত জিনিস দেখাব।' বড়দিনের ছুটিতে আসিয় সে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিল। আমি বলিলাম, 'মনে করেছিলাম তোমায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখাব—কিন্তু এখন তাঁর অসুখ, শ্যামপুকুরে আছেন, কথা কহিতে ডাক্তারদের বারণ—তুমি নূতন লোক, তোমায় এখন কেমন করিয়া লইয়া যাই?' সে দিন গেল। তাহার পর উপেন্দ্র আর একদিন মেজদাদার (গিরিশচন্দ্রের) সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, ঠাকুরের কথা উঠিল এবং মেজদাদা তাহাকে বলিলেন, 'যাস্ না একদিন অতুলের সঙ্গে, তাঁকে দেখ্‌তে।' উপেন বলিল, 'উনি তো ছয় মাস (পূর্ব্ব) হইতে বলিতেছিলেন—লইয়া যাইব, কিন্তু যখন এখানে আসিয়া সেই কথা বলিলাম তখন বলিলেন,—এখন হইবে না।' আমি শুনিয়া মেজদাদাকে বলিলাম—'আমরাই এখন সব সময় ঢুকিতে পাই না, নূতন লোককে কেমন করিয়া লইয়া যাই।' মেজদাদা বলিলেন, 'তাহা হউক, তবু একদিন লইয়া যাস্, তাহার পরে ওর অদৃষ্টে থাকে তিনি ওকে দর্শন দিবেন, আদর করিবেন।'

তাহার পর একদিন অপরাহ্নে উপেনকে লইয়া যাইলাম। সেদিন ঠাকুরের ঘরে তাঁহার বিছানার নিকট হইতে দুটি সপ্ বিছাইয়া একঘর লোক বসিয়া, আর, নানারকম আজে বাজে কথা হইতেছে—যেমন, ছবি আঁকার কথা (কারণ, চিত্রবিদ্যাকুশল অন্নদা বাগ্‌চি সেখানে ছিল), সেক্‌রার দোকানে সোনারূপা গলানর কথা†।

---

* শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ইনি শ্যামবাজারস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কোন আত্মীয়াকে বিবাহ করেন এবং মুন্সেফ ছিলেন।

† সেকরাদিগের সোনারূপা চুরি করিবার দক্ষতা সম্বন্ধে ঠাকুর আমাদিগকে একটি মজার গল্প সময়ে সময়ে বলিতেন। অতুলবাবু এখানে ঐ গল্পটির ইঙ্গিত করিয়াছেন। গল্পটি ইহাই—

ইত্যাদি। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলাম, (ঐরূপ কথা ভিন্ন) একটিও ভাল কথা হইল না! ভাবিতে লাগিলাম, আজ এই নূতন লোকটিকে লইয়া আসিলাম আর আজই যত আজে বাজে কথা! ও (উপেন) ঠাকুরের সম্বন্ধে কিরূপ ভাব লইয়া যাইবে!—ভাবিয়া আমার মুখ শুষ্ক হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে উপেনের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু যত বার দেখিলাম, দেখিলাম তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন—যেন ঐ সকল কথায় সে বেশ আনন্দ পাইতেছে। তখন ইসারা করিয়া তাহাকে উঠিতে বলিলাম, সে তাহাতে আর একটু বসিতে ইসারায় জানাইল। ঐরূপে দুই তিন বার ইসারা করার পরে সে উঠিয়া আসিল। তখন তাহাকে বলিলাম, 'কি শুনছিলি এতক্ষণ? ঐসব কথার শুনিবার কি আছে বল দেখি?—সাধে তোকে 'বাঙাল' বলি (তাহার কপালে একটি উল্‌কির টিপ ছিল বলিয়া তাহাকে আমরা ঐরূপ বলিতাম)।' সে বলিল, 'না হে, বেশ শুনিতেছিলাম। পূর্ব্বে universal love (সকলের প্রতি সমান ভালবাসা) কথাটা শুনেছি, কিন্তু কাহাতেও উহার প্রকাশ দেখি

কয়েক জন বন্ধু সমভিব্যাহারে এক ব্যক্তি একখানি গহনা বিক্রয়ের জন্য এক স্বর্ণকারের দোকানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিলকাঙ্কিত-সর্ব্বাঙ্গ শিখামালাধারী বৃদ্ধ স্বর্ণকার সম্মুখে বসিয়া গম্ভীর ভাবে হরিনাম করিতেছে এবং তাহার তিন চারি জন সহকারী ঐরূপ তিলকমালাদি ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে নানাবিধ অলঙ্কার গঠনে নিযুক্ত আছে। বৃদ্ধ স্বর্ণকার ও তাহার সহকারীদিগের সাত্ত্বিক বেশভূষা দেখিয়া ঐ ব্যক্তি ও তাহার বন্ধুগণ ভাবিল—ইহারা ধার্ম্মিক, আমাদিগকে ঠকাইবে না। পরে যে অলঙ্কারখানি তাহারা বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল তাহা বৃদ্ধের সম্মুখে রাখিয়া উহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য অনুরোধ করিল। বৃদ্ধও তাহাদিগকে সাদরে বসাইয়া একজন সহকারীকে তামাকু দিতে বলিল, এবং কষ্টিপাথরে কসিয়া অলকারের স্বর্ণের দাম বলিয়া তাহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক উহা গলাইবার নিমিত্ত গৃহমধ্যস্থ এক সহকারীর হস্তে প্রদান করিল। সেও উহা তৎক্ষণাৎ গলাইতে আরম্ভ করিয়া সহসা দেবতার স্মরণপূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, 'কেশব, কেশব'। ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপনায় বৃদ্ধও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল 'গোপাল, গোপাল'। গৃহমধ্যস্থ এক সহকারী উহার পরেই বলিয়া উঠিল 'হরি, হরি, হরি'। যে তামাকু আনিয়াছিল সে ইতিমধ্যে কলিকাটি

নাই। সকল বিষয় লইয়া সকলের সঙ্গে উঁহাকে (ঠাকুরকে) আনন্দ করিতে দেখিয়া আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। কিন্তু আর এক দিন আসিতে হইবে, আমার তিনটি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা করিব।'

তাহার পর একদিন প্রাতে উপেনকে লইয়া যাইলাম। তখন ঠাকুরের নিকটে বড় একটা কেহ নাই—কেবল, সেবকদিগের দুই একজন ও আমার ভগ্নীপতি মল্লিক মহাশয় ছিলেন। যাইবার পূর্ব্বে উপেনকে পৈ পৈ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম, 'যাহা জিজ্ঞাসা করিবার স্বয়ং করিবি। তাহা হইলে মনের মত উত্তর পাইবি—কাহাকেও দিয়া প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করাইবি না।' কিন্তু সে মুখচোরা

আগন্তুকদিগকে প্রদানপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, 'হর, হর, হর'। ঐরূপ বলিবামাত্র প্রথমোক্ত সহকারী কতকটা গলিত স্বর্ণ সম্মুখস্থ বারি পরিপূর্ণ পাত্রে দক্ষতার সহিত নিক্ষেপ করিয়া আত্মসাৎ করিল। স্বর্ণকার ও তাহার সহকারিগণ শ্রীভগবানের পূর্ব্বোক্ত নামসকল যে ভিন্নার্থে ব্যবহার করিতেছে—অর্থাৎ 'কেশব', না বলিয়া 'কে সব, ইহারা চতুর অথবা নির্ব্বোধ, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে ও ঐ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপেই 'গোপাল' অথবা গরুর পালের ন্যায় নির্ব্বোধ, এই কথা বলিতেছে, এবং 'হরি' ও 'হর' শব্দদ্বয় অপহরণ করি ও কর, এই অর্থে উচ্চারণ করিতেছে—একথা বুঝিতে না পারিয়া আগন্তুক ব্যক্তিগণ ইহাদিগের ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া নিশ্চিন্ত-মনে তামাকু সেবন করিতে লাগিল। অনন্তর গলিত স্বর্ণ ওজন করাইয়া উহার মূল্য লইয়া তাহারা প্রসন্নমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ঠাকুরের পরম ভক্ত অধরচন্দ্র সেনের ভবনে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যেদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেদিন বঙ্কিমবাবু সন্দেহবাদীর পাক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক ঠাকুরকে ধর্ম্মবিষয়ক নানা কূটপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ সকলের যথাযথ উত্তর দিবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'তুমি নামেও বঙ্কিম, কাজেও বঙ্কিম।' প্রশ্নসকলের হৃদয়স্পর্শী উত্তর লাভে প্রীত হইয়া বঙ্কিমবাবু অনন্তর বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আপনাকে একদিন আমাদের কাঁটালপাড়ার বাটিতে যাইতে হইবে, সেখানে ঠাকুরসেবার বন্দোবস্ত আছে এবং আমরা সকলেও হরিনাম করিয়া থাকি।' ঠাকুর তাহাতে রহস্যপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'কেমনতর হরিনাম গো, সেকরাদের মত নয় ত?' বলিয়াই ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন এবং সভামধ্যে হাস্যের রোল উঠিয়াছিল।

ছিল, যাহা বারণ করিয়াছিলাম এখানে আসিয়া তাহাই করিয়া বসিল—মল্লিক মহাশয়ের দ্বারা প্রশ্ন করাইল। ঠাকুর উত্তর করিলেন, কিন্তু উপেনের মুখের ভাবে বুঝিলাম, উত্তরটি তাহার মনের মত হইল না। তখন আমি তাহাকে পুনরায় চুপি চুপি বলিলাম, 'ঐরূপ ত হইবেই, আমি যে তোকে বার বার বলে এলাম, যা জিজ্ঞাসা কর্‌বার আপনি কর্‌বি ; নিজে জিজ্ঞাসা কর্ না, মোক্তার ধরেছিস্ কেন ?'

সাহস করিয়া এইবার স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ? আর যদি দুই-ই হন্, তাহা হইলে একসঙ্গে ঐরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের দুই-ই কেমন করিয়া হইতে পারেন ?" ঠাকুর শুনিয়াই বলিলেন, "তিনি (ঈশ্বর) সাকার নিরাকার দুই-ই—যেমন জল, আর বরফ।" উপেন কলেজে বিজ্ঞান (Science Course) লইয়াছিল, তজ্জন্য ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত তাহার মনের মত হইল এবং উহার সহায়ে সে তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইয়া আনন্দিত হইল। ঐ প্রশ্নটি করিয়াই কিন্তু সে নিরস্ত হইল এবং কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। বাহিরে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উপেন, তুমি তিনটি প্রশ্নের কথা বলিয়াছিলে, একটি মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই উঠিয়া আসিলে কেন ?' সে তাহাতে বলিল, 'তাহা বুঝি বুঝ নাই—ঐ এক উত্তরে আমার তিনটি প্রশ্নেরই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।'

তোমার মনে আছে বোধ হয়, রামদাদা * এই সময়ে প্রায়ই বাটিতে সকাল সকাল আহারাদি করিয়া আফিসের কাপড় চোপড় সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের নিকটে আসিতেন এবং দুই এক ঘণ্টা এখানে কাটাইয়া বেশ-পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইতেন। ঠাকুর যখন আজ উপেনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন তখন তিনি আফিসে যাইবার বেশ পরিতে পরিতে ঐ ঘরে সহসা আসিয়া ঠাকুরের কথাগুলি শুনিয়াছিলেন। এখন আমরা যেমন বাহিরে আসিয়াছি অমনি রামদাদা

* শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত।

বলিয়া উঠিলেন, "অতুলদাদা ওঁকে (উপেনকে) এদিকে নিয়ে এস; ঠাকুর ওঁর প্রশ্নের উত্তরে বড় শক্ত কথা বলিয়াছেন, উনি বুঝিতে পারিবেন না। আমার এই বইখানা ওঁকে পড়িতে হইবে তবে উনি ঠাকুরের ঐকথা বুঝিতে পারিবেন।" ঐকথা শুনিয়া আমার ভারি রাগ হইল, বলিয়া ফেলিলাম, "রামদাদা, তুমি না আমাদের চেয়ে সাত বৎসর আগে ঠাকুরকে দেখেছ ও তাঁর কাছে যাওয়া আসা কর্‌ছ?—উনি (ঠাকুর) যা বল্‌লেন তা বুঝ্‌তে পার্‌বে না, আর, তোমার বই পড়ে উনি যা বোঝাতে পার্‌লেন না তা বুঝ্‌তে পার্‌বে! এটা তোমার কেমনতর কথা? তবে উপেনকে তোমার বইখানা * পড়্‌তে দেবে, দাও—সেটা আলাদা কথা।" রামদাদা ঐ কথায় একটু অপ্রস্তুত হইয়া পুস্তকখানি উপেনকে দিলেন।

(ক্রমশঃ)

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(স্বামী বিবেকানন্দ)

প্রকৃত শিক্ষার প্রথম লক্ষণ এই হওয়া চাই যে, ইহা কখনও যুক্তিবিরোধী হইবে না। এবং আপনারা দেখিতে পাইবেন, উল্লিখিত সকল যোগগুলি এই ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে রাজযোগের কথা ধরা যাউক। রাজযোগ মনস্তত্ত্ববিষয়ক যোগ—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া একত্বে পঁহুছিবার উপায়। বিষয়টী খুব বড়; তাই আমি এক্ষণে এই 'যোগে'র অভ্যন্তরীণ মূল ভাবটীই আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। জ্ঞান লাভ করিবার আমাদের একটী মাত্র উপায় আছে। নিম্নতম মনুষ্য হইতে সর্ব্বোচ্চ 'যোগী'

---

* শ্রীরামচন্দ্র দত্ত প্রণীত "তত্ত্বপ্রকাশিকা"।

পর্য্যন্ত সকলকেই সেই এক উপায় অবলম্বন করিতে হয়—একাগ্রতাই এই উপায়। রসায়নবিদ্ যখন তাঁহার পরীক্ষাগারে (Laboratory) কাজ করেন, তখন তিনি তাঁহার মনের সমস্ত শক্তি একীভূত করেন—কেন্দ্রীভূত করেন, এবং সেই কেন্দ্রীভূত শক্তিকে মূলভূতগুলির উপর প্রয়োগ করিবামাত্র তাহারা বিশ্লেষিত হইয়া যায় এবং এইরূপে তিনি তাহাদের জ্ঞান লাভ করেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ও তাঁহার সমুদয় মনঃশক্তিকে একীভূত করিয়া কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া বস্তুর উপর প্রয়োগ করেন, এবং ভ্রাম্যমান নক্ষত্রনিচয় ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল তাঁহার নিকট তাহাদের রহস্য উদ্ঘাটিত করে। অধ্যাপনারত আচার্য্যই বল, অথবা পাঠনিরত ছাত্রই বল যেখানে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, সকলের পক্ষেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন, উহা যদি আপনাদের ভাল লাগে, আপনাদের মন উহাদের প্রতি একাগ্র হইবে; তখন যদি নিকটেই একটা ঘড়ি বাজে, আপনারা তাহা শুনিতে পাইবেন না, কারণ আপনাদের মন তখন অন্য বিষয়ে একাগ্র হইয়াছে। আপনাদের মনকে যতই একাগ্র করিতে সক্ষম হইবেন, ততই আপনারা আমার কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন, এবং আমিও আমার প্রেম ও শক্তিসমূহকে যতই একাগ্র করিব, ততই আমার বক্তব্য বিষয়টী আপনাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইতে সক্ষম হইব। এই একাগ্রতা যত অধিক হইবে, মানুষ তত অধিক জ্ঞান লাভ করিবে, কারণ ইহাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়—'নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। এমন কি, অতি নীচ মুচিও যদি একটু বেশী মনঃসংযোগ করে, তাহা হইলে সে তাহার জুতাগুলি আরও ভাল করিয়া বুরুশ করিবে; পাচক একাগ্র হইলে তাহার খাদ্য আরও ভাল করিয়া রন্ধন করিবে। অর্থোপার্জ্জনই হউক অথবা ভগবদারাধনাই হউক—যে কাজে মনের একাগ্রতা যত অধিক হইবে, কাজটী ততই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। দ্বারের নিকট গিয়া ডাকিলে বা উহাতে করাঘাত করিলে যেমন দ্বার

উদ্ঘাটিত হয়, তেমনি একমাত্র এই উপায়েই প্রকৃতির ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া জগতে আলোকবন্যা প্রবাহিত করায়। এই একাগ্রতা-শক্তিই জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের একমাত্র উপায়। রাজযোগে প্রায় শুধু ইহারই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় আমরা অতিশয় অন্যমনস্ক রহিয়াছি—আমাদের মন শত দিকে ধাবিত হইয়া তাহার শক্তি ক্ষয় করিতেছে। যখনই আমি বাজে চিন্তা বন্ধ করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য কোন বিষয়ে মনঃস্থির করিতে চেষ্টা করি, তখনই না চাহিলেও শতসহস্র বাসনা মস্তিষ্কে আসিয়া এককালে উপস্থিত হয়, শতসহস্র চিন্তা যুগপৎ মনে উদিত হইয়া উহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। কিরূপে ঐ সকলকে নিবারণ করিয়া মনকে বশে আনিতে পারা যায়, ইহাই রাজযোগের একমাত্র আলোচ্য বিষয়।

এক্ষণে কর্ম্মযোগের অর্থাৎ কর্ম্মের মধ্য দিয়া ভগবানলাভের কথা ধরা যাউক। সংসারে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কোন না কোন প্রকার কাজ করিতেই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহাদের মন শুধু চিন্তার রাজ্যেই একাগ্র হইয়া নিবদ্ধ থাকিতে পারে না—তাহারা বোঝে কেবল কাজ—যা চখে দেখা যায় এবং হাতে করা যায়। এই প্রকার লোকদের জন্যও একটী সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা থাকা দরকার। আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন কর্ম্ম করিতেছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই অধিকাংশ শক্তির অপব্যবহার করিয়া থাকে। কারণ, আমরা কর্ম্মের রহস্য জানি না। কর্ম্মযোগ এই রহস্যটী বুঝাইয়া দেয় এবং কোথায় কি ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, উপস্থিত কর্ম্মে কি ভাবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফললাভ হইবে, তাহা শিক্ষা দেয়। কিন্তু এই রহস্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের বিরুদ্ধে, উহা দুঃখজনক এই বলিয়া যে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করা হয়, আমাদিগকে তাহারও বিচার করিতে হইবে। সমুদয় দুঃখকষ্ট আসক্তি হইতে আসে। আমি কাজ করিতে চাই—আমি কোন লোকের উপকার

করিতে চাই ; এবং প্রায়ই দেখা যায় যে, আমি যাহাকে সাহায্য করিয়াছি সেই ব্যক্তি সমস্ত উপকার ভুলিয়া আমার শত্রুতা করিবে ; ফলে আমাকে কষ্ট পাইতে হয়। এবম্বিধ ঘটনার ফলেই মানুষ কর্ম্ম হইতে বিরত হয় এবং এই দুঃখকষ্টের ভয়ই মানবের কর্ম্ম ও উদ্যমের অনেকটা নষ্ট করিয়া দেয়। কাহাকে সাহায্য করা হইতেছে, কিসের জন্য সাহায্য করা হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া অনাসক্ত-ভাবে শুধু কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিতে হয়, কর্ম্মযোগ তাহাই শিক্ষা দেয়। কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করেন, কারণ উহা তাঁহার স্বভাব, তিনি প্রাণে প্রাণে বোধ করেন যে এরূপ করা তাঁহার পক্ষে কল্যাণজনক—ইহা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তিনি জগতে সর্ব্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করেন, কখনও কিছুর প্রত্যাশা করেন না। তিনি জ্ঞাতসারে দান করিয়াই যান, কিন্তু প্রতিদানস্বরূপ কিছুই চান না, সুতরাং তিনি দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পান। যখনই দুঃখ আমা-দিগকে গ্রাস করে, তখনই বুঝিতে হইবে 'আসক্তির' প্রতিক্রিয়া মাত্র।

অতঃপর ভাবপ্রবণ বা প্রেমিক লোকদিগের জন্য ভক্তিযোগ। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসিতে চান, তিনি ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপে ক্রিয়া-কলাপের সাহায্য লন এবং পুষ্প, গন্ধ, সুরম্য মন্দির, মূর্ত্তি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ রাখেন। আপনারা কি বলিতে চান, তাঁহারা ভুল করেন? আমি আপনাদিগকে একটী সত্য কথা বলিতে চাই, তাহা, আপনাদের, বিশেষতঃ এই দেশে, মনে রাখা ভাল।—যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অনুষ্ঠান ও পৌরাণিক তত্ত্বসম্পদে সমৃদ্ধ, তাহাদের মধ্য হইতেই জগতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আর যে সকল সম্প্রদায় কোন প্রতীক বা অনুষ্ঠান বিশেষের সহায়তা ব্যতীত ভগবানলাভের চেষ্টা করিয়াছে, যাহারা ধর্ম্মের যাহা কিছু সুন্দর ও মহান্, সমস্ত নির্ম্মমভাবে পদদলিত করিয়াছে, খুব ভাল চক্ষে দেখিলেও তাহাদের ধর্ম্ম গোঁড়ামী মাত্র, তাহা শুষ্ক। জগতের ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং এই সকল অনুষ্ঠান ও পুরণাদিকে গালি দিও না। যে

সকল লোক তাহাদের লইয়া থাকিতে চায় তাহারা তাহাদিগকে লইয়া থাকুক। তোমরা অযথা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিও না, "তাহারা মূর্খ, উহা লইয়াই থাকুক।" তাহা কখনই নহে; আমি জীবনে যে সকল আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই এই সকল অনুষ্ঠানের নিয়মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। আমি নিজেকে তাঁহাদের পদতলে বসিবার যোগ্য মনে করি না, আবার আমি কিনা তাঁহাদের সমালোচনা করিতে যাইব। এই সমুদয় ভাব মানবমনে কিরূপ কার্য্য করে, এবং তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী আমার গ্রাহ্য, কোন্‌টী ত্যাজ্য, তাহা আমি কিরূপে জানিব? আমরা উচিত অনুচিত বিচার না করিয়াই পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের সমালোচনা করিয়া থাকি। লোকে এই সকল সুন্দর সুন্দর উদ্দীপনা-পূর্ণ পুরাণাদি যত ইচ্ছা গ্রহণ করুক, কারণ, আপনাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, ভাবপ্রবণ লোকেরা সত্যের কতকগুলি নীরস সংজ্ঞা মাত্র লইয়া থাকিতে মোটেই পছন্দ করেন না। ভগবান্ তাঁহাদের নিকট 'ধরা ছোঁয়ার' বস্তু, তিনিই একমাত্র সত্য বস্তু। তাঁহারা অনুভব করেন, তাঁহার কথা শোনেন, তাঁহাকে দেখেন, ভাল-বাসেন। তাঁহারা তাঁহাদের ভগবান্ লইয়াই থাকুন। তোমার যুক্তিবাদী, ভক্তের চক্ষে সেইরূপ নির্ব্বোধ—যেমন কোন ব্যক্তি একটী সুন্দর মূর্ত্তি দেখিলে তাহাকে চূর্ণ করিয়া উহা কি পদার্থে নির্ম্মিত তাহা দেখিতে চায়। 'ভক্তিযোগ' তাহাদিগকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়, কোন গূঢ় অভিসন্ধি থাকিবে না। লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, কোন এষণাই থাকিবে না, শুদ্ধ ভগবানকে এবং যাহা কিছু মঙ্গলময় তাহাকে শুধু কর্ত্তব্যবোধে ভালবাসা। প্রেমই প্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান এবং ভগবানই প্রেমস্বরূপ—ইহাই ভক্তিযোগের শিক্ষা। ভক্তিযোগ তাঁহাদিগকে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান্, শাস্তা, এবং পিতা ও মাতা বলিয়া তাঁহার প্রতি হৃদয়ের সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করিতে শিক্ষা দেয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষা যাহা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে অথবা মানুষ তাহার সম্বন্ধে যে সর্ব্বোচ্চ

ধারণা করিতে পারে তাহা এই—তিনি প্রেমময়। "যেখানেই কোন প্রকার ভালবাসা রহিয়াছে, তাহাই তিনি, সেখানেই প্রভু বিদ্যমান। স্বামী যখন স্ত্রীকে চুম্বন করেন, সে চুম্বনে তিনিই বিদ্যমান; মাতা যখন শিশুকে চুম্বন করেন, তথায় তিনিই বিদ্যমান; বন্ধুগণের কর-মর্দ্দনে সেই প্রভুই প্রেমময় ভগবানরূপে বিদ্যমান।" যখন কোন মহাপুরুষ মানবজাতিকে ভালবাসিয়া তাহাদের কল্যাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রভুই তাঁহার মানবপ্রেমভাণ্ডার হইতে মুক্তহস্তে ভালবাসা বিতরণ করিতেছেন। যেখানেই হৃদয়ের বিকাশ হয়, সেখানেই তাঁহার প্রকাশ। ভক্তিযোগ এই সকল শিক্ষা দেয়।

সর্ব্বশেষে আমরা 'জ্ঞানযোগীর' কথা আলোচনা করিব—তিনি দার্শনিক ও চিন্তাশীল যিনি এই দৃশ্য জগতের পারে যাইতে চান। তিনি এই সংসারের তুচ্ছ জিনিষ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নহেন। তিনি আমাদের পানাহারাদি প্রাত্যহিক কার্য্যাবলীর পারে যাইতে চান; সহস্র সহস্র পুস্তক পড়িয়াও তাঁহার শান্তি হয় না; এমন কি সমুদয় জড়বিজ্ঞানও তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। কারণ, তাহারা বড় জোর, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটী তাঁহার জ্ঞানগোচর করিতে পারে। বাহ্য এমন কি আছে যাহা তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে পারে? কোটী কোটী সৌরজগৎ তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না; তাঁহার চক্ষে তাহারা 'সৎ' সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র। তাঁহার আত্মা এই সকলের পারে, সকল অস্তিত্বের যাহা সার তাহাতেই ডুবিয়া যাইতে চায়—সত্যস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিতে চায়; তিনি ইহাকে উপলব্ধি করিতে চান, ইহার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিতে চান, সেই বিরাট সত্তার সহিত এক হইয়া যাইতে চান। তিনিই জ্ঞানী। ভগবান্ জগতের পিতা, মাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, পথপ্রদর্শক—ইত্যাদি বাক্য তাঁহার নিকট ভগবানের মহিমা প্রকাশে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তিনি ভাবেন, ভগবান্ তাঁহার প্রাণের প্রাণ, তাঁহার আত্মার আত্মা। ভগবান্ তাঁহার নিজেরই আত্মা। ভগবান্ ছাড়া আর কোন বস্তুই নাই।

তাঁহার যাবতীয় নশ্বর অংশ বিচারের প্রবল আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া যায়, অবশেষে যাহা সত্যসত্যই বিদ্যমান থাকে, তাহাই ভগবান্ স্বয়ং।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

একই গাছে দুইটী পাখী রহিয়াছে, একটী উপরে একটী নীচে। উপরের পাখীটী স্থির নির্ব্বাক, মহান্, আপনার মহিমায় আপনি বিভোর; নীচের ডালের পাখীটী কখনও সুমিষ্ট, কখনও তিক্ত ফল খাইতেছে, এক ডাল হইতে আর এক ডালে লাফাইয়া উঠিতেছে এবং পর্য্যায়ক্রমে আপনাকে সুখী ও দুঃখী বোধ করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে নীচের পাখীটী একটা অতি মাত্রায় তিক্ত ফল খাইল এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়া উপরের দিকে তাকাইল এবং অপর পাখীটীকে দেখিতে পাইল সেই অপূর্ব্ব সোনার রঙের পাখাওয়ালা পাখীটী—সে মিষ্ট বা তিক্ত কোন ফলই খাইতেছে না এবং আপনাকে সুখী বা দুঃখীও মনে করিতেছে না, পরন্তু প্রশান্তভাবে আপনাতে আপনি রহিয়াছে—আপনার আত্মা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। নীচের পাখীটী ঐরূপ অবস্থা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল কিন্তু শীঘ্রই ইহা ভুলিয়া গিয়া আবার ফল খাইতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকাল পরে সে আবার একটা অতি তিক্ত ফল খাইল। তাহাতে তাহার মনে অতিশয় দুঃখ হইল এবং সে পুনরায় উপরের দিকে তাকাইল এবং উপরের পাখীটীর কাছে যাইবার চেষ্টা করিল। আবার সে একথা ভুলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় উপরের দিকে তাকাইল। বার বার এইরূপ করিতে করিতে সে অবশেষে সুন্দর পাখীটীর খুব নিকটে আসিয়া পৌঁছিল এবং দেখিল তাহার

পক্ষ হইতে জ্যোতির ছটা আসিয়া তাহার নিজ দেহের চতুর্দ্দিকে পড়িয়াছে। সে এক পরিবর্ত্তন অনুভব করিল—যেন সে মিলাইয়া যাইতেছে; সে আরও নিকটে আসিল, দেখিল তাহার চারিদিকে যাহা কিছু ছিল সমস্তই গলিয়া যাইতেছে—অন্তর্হিত হইতেছে। অবশেষে সে এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের অর্থ বুঝিল। নীচের পাখীটী যেন উপরের পাখীটীর ঘনীভূত ছায়া মাত্র—প্রতিবিম্ব মাত্র ছিল। সে নিজে বরাবর স্বরূপতঃ সেই উপরের পাখীই ছিল। নীচের ছোট পাখীটীর এই মিষ্ট ও তিক্ত ফল খাওয়া এবং পর পর সুখদুঃখ বোধ করা—এ সমস্তই মিথ্যা—স্বপ্ন মাত্র; সেই প্রশান্ত, নির্ব্বাক, মহিমময়, শোকদুঃখাতীত উপরের প্রকৃত পাখীটী সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান ছিল। উপরের পাখীটী ঈশ্বর, পরমাত্মা- জগতের প্রভু; এবং নীচের পাখীটী জীবাত্মা—এই জগতের সুখদুঃখরূপ বিষ ও তিক্ত ফলসমূহের ভোক্তা। মধ্যে মধ্যে জীবাত্মার উপর প্রবল আঘাত আসিয়া পড়ে; সে কিছুক্ষণের জন্য ফলভোগ বন্ধ করিয়া সেই অজ্ঞাত ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয় এবং তাহার হৃদয়ে সহসা জ্ঞান-জ্যোতির প্রকাশ হয়। সে তখন মনে করে, এই জগৎ মিথ্যা দৃশ্যজাল মাত্র। কিন্তু পুনরায় ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে বহির্জগতে টানিয়া নামাইয়া আনে, এবং সেও পূর্ব্বের ন্যায় এই জগতের ভালমন্দ ফল ভোগ করিতে থাকে। আবার সে এক অতি কঠোর আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং আবার তাহার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হইয়া জ্ঞানালোক প্রবেশ করে। এইরূপে ধীরে ধীরে সে ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় এবং যতই সে অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই দেখিতে পায়, তাহার 'কাঁচা আমি'র আপনা আপনি লয় হইতেছে। যখন সে খুব নিকটে আসিয়া পড়ে তখন দেখিতে পায়, সে নিজেই ভগবান্ এবং বলিয়া উঠে, "যাঁহাকে আমি তোমাদিগের নিকট জগতের জীবন এবং অণুপরমাণুতে ও চন্দ্র-সূর্য্যেও বিদ্যমান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তিনিই আমাদের এই জীবনের অবলম্বন— আমাদের আত্মার আত্মা। শুধু তাহাই নহে,

তুমিই সেই, তত্ত্বমসি।" 'জ্ঞানযোগ' আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয়। ইহা মানুষকে বলে, তুমি স্বরূপতঃ ভগবান্। ইহা মানুষকে প্রাণীজগতের মধ্যে যথার্থ একত্ব দেখাইয়া দেয়—আমাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়া স্বয়ং প্রভুই এই জগতে প্রকাশ পাইতেছেন। অতি সামান্য পদদলিত কীট হইতে যাঁহাদিগকে আমরা সবিস্ময়ে হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করি সেই সকল শ্রেষ্ঠ জীব পর্য্যন্ত সকলেই সেই এক ভগবানের প্রকাশ মাত্র।

শেষ কথা এই যে, এই সকল বিভিন্ন যোগগুলিকে আমাদিগকে কার্য্যে পরিণত করিতেই হইবে; কেবল তাহাদের সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিলে কিছুই হইবে না। 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' প্রথমে তাহাদিগের সম্বন্ধে শুনিতে হইবে। পরে শ্রুত বিষয়গুলি চিন্তা করিতে হইবে। আমাদিগকে সেগুলি বেশ বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে—যেন আমাদের মনে তাহাদের একটা ছাপ পড়ে। অতঃপর তাহাদিগকে ধ্যান এবং উপলব্ধি করিতে হইবে—যে পর্য্যন্ত না আমাদের সমস্ত জীবনটাই তদ্ভাবভাবিত হইয়া উঠে। তখন ধর্ম্ম জিনিষটা আর শুধু কতকগুলি ধারণা বা মতবাদের সমষ্টি অথবা বুদ্ধির সায মাত্র হইয়া থাকিবে না তখন ইহা আমাদের জীবনের সহিত এক হইয়া যাইবে। বুদ্ধির সায দিয়া আজ আমরা অনেক মূর্খামিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া কালই হয়ত আবার সম্পূর্ণ মত পরিবর্ত্তন করিতে পারি। কিন্তু যথার্থ ধর্ম্ম কখনই পরিবর্ত্তিত হয় না। ধর্ম্ম অনুভূতির বস্তু—উহা মুখের কথা বা মতবাদ বা যুক্তিমূলক কল্পনা মাত্র নহে—তাহা যতই সুন্দর হউক না কেন। ধর্ম্ম জীবনে পরিণত করিবার বস্তু—শুনিবার বা মানিয়া লইবার জিনিষ নহে, সমস্ত মনপ্রাণ বিশ্বাসের বস্তুর সহিত এক হইয়া যাইবে। ইহাই ধর্ম্ম।

(সমাপ্ত)

শিখগুরু।

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র)

সাগর-সৈকতে দাঁড়াইয়া একটী মহোর্ম্মি উত্থিত হইতে দেখিলাম—পরক্ষণেই উহা অতলবারিধিতলে মিলাইয়া গেল; তৎপরে সমুদ্রবক্ষ আবার শান্ত-স্নিগ্ধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল—পুনরায় কালাতিপাতে নূতন তরঙ্গ উঠিবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। জাতীয় জীবন-প্রবাহও ঐ একই নিয়মানুসরণ করিয়া চলিয়াছে। গুরু হরগোবিন্দের আদর্শ তেজস্বিতা, সাহস ও মহাপ্রাণতা শিখদিগের মধ্যে যে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়াছিল, তাঁহার সময়ে শিখজীবনে যেরূপ নূতন কর্ম্মপ্রবণতা ও প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়াছিল তদীয় দেহত্যাগের অব্যবহিতকাল পরেই আবার ততোধিক প্রাণহীনতা ও জড়ভাব পরিলক্ষিত হয়; উহার কারণ আর কিছুই নহে—পরবর্ত্তী গুরুদ্বয় জাতীয় শক্তি-সঞ্চয়ের প্রতি প্রবল ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন—তাঁহারা তুচ্ছ গৃহবিবাদ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্যই শিখদিগের জাতীয় জীবন কিয়ৎকাল শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সিন্ধু আপাত শুদ্ধভাব ধারণ করিলেও তাহারই মধ্যে যেমন তরঙ্গ-লীলার মহাশক্তি নিহিত থাকে—তদ্রূপ শিখজাতি হরগোবিন্দের পরবর্ত্তী গুরুদ্বয়ের সময় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেও হরগোবিন্দ কর্ত্তৃক সঞ্চারিত শক্তি তাহাদেরই মধ্যে গূঢ় ভাবে ছিল। তাহাদের এই তূষ্ণীম্ভাব যেন ভবিষ্যতের মহা উত্থানেরই পরিচায়ক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু শিখদিগের সুপ্তশক্তি উদ্দীপ্ত করিতে মহামতি হরগোবিন্দের ন্যায় আর একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন হইল—শিখগণ যেন তাঁহারই আশায় পথপানে চাহিয়া রহিল। কবে তাহাদিগের নৈরাশ্যের অমানিশা অতিবাহিত হইয়া আবার সৌভাগ্য-সূর্য্য শুভ্ররশ্মি বিকিরণ করিবে!

হরকিষণ।

হবরাওয়ের মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র হরকিষণ আপনাকে গুরু বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিলেন; জ্যেষ্ঠ রামরাও তখন মোগল দরবারে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সংবাদ অবগত হইয়া তিনি অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং স্বীয় কনিষ্ঠকে বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত পুরস্কার প্রদানে সঙ্কল্প করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক অভীষ্টসাধনোদ্দেশ্যে হরকিষণকে বলিয়া পাঠাইলেন—"আমি জ্যেষ্ঠ, সুতরাং গুরুপদের আমিই অধিকারী। আমার অবর্ত্তমানে আমাকে না জানাইয়া এরূপ কার্য্য করা তোমার উচিত হয় নাই। স্থির জানিও, আমাকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে তোমাকে শীঘ্রই উহার ফলভোগ করিতে হইবে।" কিন্তু তাঁহার ভয়প্রদর্শন বিশেষ কার্য্যকরী হইল না—তদীয় ভৃত্য অপমানিত হইয়া দরবারে ফিরিয়া আসিল। হরকিষণ সঙ্কল্প করিলেন—কোনমতেই আমি পরাজয় স্বীকার করিব না—প্রাণত্যাগ করিতে হয় সেও স্বীকার! কিন্তু তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা বেশী দিন অটুট রহিল না। রামরাও সম্রাটের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন এবং কনিষ্ঠ যে কিরূপ অন্যায় করিয়াছে তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে সহসা একদিবস বাদশার সশস্ত্র সিপাহী আসিয়া গুরুকে ধরিয়া লইয়া গেল। হররাও কর্ত্তৃক উৎপীড়িত শিখসমাজ কোনই বাধা প্রদান করিল না। তখন হরকিষণ মনে মনে অত্যন্ত ত্রাস্ত হইলেন—আপন গর্হিত কর্ম্মের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে দিল্লীর সমীপবর্ত্তী স্থানসকলে বসন্ত রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। গুরু নিরাশ হইয়া ভগবানের নিকট সকাতর প্রার্থনা জানাইলেন, যেন শীঘ্র তিনিও ঐ রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন—তাহা হইলে আর তাঁহাকে মোগলের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। ঐভাবে চিন্তান্বিত হইয়া তিনি সিরাই নামক স্থানে পৌঁছিলেন - তথায় তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল গুরুপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দিল্লীর পথে বসন্ত রোগে

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিলেন। তদীয় মৃতদেহ দিল্লীতে সমাহিত করা হয়।

তেগ্‌বাহাদুর।

হরকিষণ নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুশয্যায় আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে গুরুনির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করায় তিনি এই মাত্র বলেন, "আমার পর বাবা বোকালাই গুরুপদ পাইবেন।" গুরু কাহাকে নির্দ্দেশ করিলেন—তাহা ঐ সময়ে তাহাদিগের মধ্যে কেহই নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইল না। বোকালার একটী স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। উহা বিপাশা নদীর দক্ষিণোপকূলে গোবিন্দওয়ালের সন্নিকটস্থ একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র। গুরু হরগোবিন্দ পার্ব্বত্যপ্রদেশে যাত্রা করিবার পথে ঐ স্থানেই নিজ অনুচরদিগের মধ্যে কয়েকজনকে রাখিয়া যান। তদবধি উহারা ঐ স্থানেই বসবাস করিত। তেগ-বাহাদুরের জননীও ঐ সঙ্গে পরিত্যক্তা হন।

হরকিষণের শেষ ইচ্ছার কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে বোকালার সোদীগণ স্বাধিকার লাভের আশায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। তেগবাহাদুর সেই সময়ে মাতার সহিত ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি ঘূণাক্ষরেও কাহাকে জানিতে দেন নাই যে হরগোবিন্দ তাঁহাকেই গুরুপদে নির্ব্বাচিত করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, ঐরূপ চাঞ্চল্য ও অস্থৈর্য্যে কিয়ৎকাল গত হইলে সকলে মুখহানশাহ নামক হরগোবিন্দের কোন এক অনুচরকে মধ্যস্থ মানিল। মুখহানশাহ ইতিপূর্ব্বেই হরগোবিন্দের মনোভিপ্রায় অবগত ছিলেন। তিনি শান্তভাবে উহার কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া হরকিষণের শেষ ইচ্ছার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উহা যথাযথভাবে বিবৃত করিলে তিনি নানারূপ বহুমূল্য উপ-ঢৌকনাদি লইয়া তেগ্‌বাহাদুরকে গুরুপদে বরণ করিয়া লইলেন এবং বিনয়নম্রবচনে ঐগুলি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। জাগতিক ঐশ্বর্য্যে তেগ্‌বাহাদুরের কোনরূপ আসক্তি ছিল না, তাই তিনি বলিলেন—"আমি ফকির—ইহা লইয়া আমার কি হইবে?

আমার নাম দেগ্ বাহাদুর—আমি তেগ্ বাহাদুর (অর্থাৎ তরবারির অধিস্বামী) নহি—তোমরা বোধ হয় ভুল করিতেছ। আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তি কি কখনও গুরুপদে আসীন হইতে পারে?" তিনি যে আত্মগোপন করিতেছেন তাহা মুখহানশাহ অনায়াসেই বুঝিয়া লইলেন ; তদ্দিবসেই ঐ স্থানে সকলে সমবেত হইয়া তেগ্ বাহাদুরকে সানন্দে গুরুপদে বরণ করিয়া লইল।

যাহা হউক, নির্ব্বাচনকার্য্য সমাহিত হইলে কিয়ৎকালের জন্য সর্ব্বত্র সুখশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল এবং গুরু প্রথম প্রথম কার্য্যক্ষমতাও দেখাইলেন। তেগ্ বাহাদুরের পদপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রামরাও তৎপ্রতি একান্ত বিরূপ হইল। হরকিষণের মৃত্যুর পরও রামরাও দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিল। ঈর্ষায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল এবং সমুচিত দণ্ডবিধানের জন্য আওরঙ্গজেবের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। কিছুদিন অতীত হইলে বোকালার সোদীগণের সহিত গুরুর দুই একটা সামান্য বিষয় লইয়া বিবাদের সূত্রপাত হইতে আরম্ভ হইল, কালে উহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদিগের দ্বারা একান্ত অপমানিত হইয়া তিনি ক্রমে ধৈর্য্য হারাইলেন এবং সমুচিত শাস্তিদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। মুখহান শাহের নিকট তিনি প্রস্তাব করিলেন যে উহাদিগের সকলকে বোকালা হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়াই সমীচীন। কিন্তু মুখহানশাহ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে উহাতে তাঁহার বিপদ অবশ্যম্ভাবী, কারণ সোদীগণ সকলেই যদি তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে, হয়ত তাহারা অনায়াসেই তাঁহার প্রাণনাশে সক্ষম হইবে, সুতরাং শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত উক্ত পন্থা অবলম্বন করা কোন প্রকারেই বিধেয় নহে। যাহা হউক, উহা বিশেষ ফলপ্রদ হইবে না দেখিয়া তিনি আপনিই ঐ স্থান পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় বোধ করিলেন। অতঃপর মুখহানশাহের সহিত আপন পরিবারবর্গ লইয়া রাজধানী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গুরু স্বয়ং দিল্লীতে আসিতেছেন শুনিয়া রামরাও মনে মনে খুব আনন্দিত হইল, কারণ তাহা হইলে প্রতিশোধ লইবার শুভসুযোগ উপস্থিত হইবে। তাহা ছাড়া—গুরু তখন আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ত্রস্ত ও ভীত হইয়া রাজধানীতে শান্তিলাভের আশায় আসিতেছেন, সুতরাং ঐ সময়ে তদীয় একান্ত অন্যায় কার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া উহার একটা প্রতিবিধানের জন্য রামরাও সমুৎসুক হইল। নিজ মনোভাব গোপন রাখিয়া রামরাও সম্রাটকে বলিল -“মহারাজ! বোকালার সোদীগণের সহিত তেগ বাহাদুর অতীব দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, আপনি উহাকে সত্বর দরবারে আহ্বান করিয়া ঐ সম্বন্ধীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করতঃ গুরুর অন্যায় কর্ম্মের জন্য শাস্তিবিধান করুন।” ইসলামধর্ম্ম প্রচার করিতে উদ্যত হইয়া আওরঙ্গজেব ঐ সময় অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপর বলপ্রয়োগ ও নানারূপ উৎপীড়নের আয়োজনে উদ্যত ছিলেন। শিখসম্প্রদায়টীকেও সমূলে বিনষ্ট করিবেন বলিয়া বহুদিন হইতেই তাঁহার বাসনা ছিল। উহার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত বুঝিয়া তিনি স্থির করিলেন, গুরুকে আপন সম্মুখে আহ্বান করিবেন এবং তদীয় ব্যবহারের কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেই শাস্তি প্রদানের আজ্ঞা দিবেন। কিন্তু সভাসদ্-দিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না—তাঁহারা একবাক্যে গুরুকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিয়া দিলেন এবং গুরুকে বিনা কারণে রাজদ্বারে উপস্থাপিত করা যে কিরূপ অন্যায়, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাদিগের সকল যুক্তি নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিয়া অবশেষে উহাদিগের সহিত একমত হইলেন। কারণ, তিনি জানিতেন উহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি আপন অভীপ্সিত কর্ম্ম কোনমতেই সুসিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন না—বহু বাধাবিঘ্ন আসিয়া সকল পণ্ড করিয়া ফেলিবে।

ঐ ঘটনার বিবরণ শুনিয়া গুরু প্রমাদ গণিলেন। বিপদ হইতে আত্মরক্ষার্থ তিনি দিল্লী যাত্রা করেন কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতর বিপদজালে পতিত হইয়াছেন।

তিনি আরও নিরাশ ও হতোদ্যম হইলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া পেটনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া তাঁহার সকল চিন্তা ও ভীতি দূর হইল এবং তিনি সকলপ্রকার কোলাহল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কিয়ৎকাল শান্তিময় জীবনযাপন করিয়া ধন্য হইলেন। অতঃপর স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায়ে তিনি উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া আবার দিল্লীতে পৌঁছিলেন। এবার রামরাও আওরঙ্গজেবের সহিত অভিসন্ধি করিয়া গুরুকে রাজদরবারে আহ্বান করিতে অনুরোধ করিল। রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া গুরু বুঝিলেন, রামরাওয়ের হস্ত হইতে তাঁহার আর উদ্ধার নাই; সুতরাং আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার আশায় নির্জ্জন পার্ব্বত্যপ্রদেশে কুলুরাধিপতির নিকট আশ্রয় লইলেন। তথায় কিয়ৎকাল অবস্থানের পর তিনি 'দেবা মুখু' নামক স্থানটী পঞ্চশত মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করিয়া উহারই উপর 'মুখওয়াল' নামক একটী সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ দিল্লীতে নীত হইলে রামরাও অতীব ক্রুদ্ধ হইল এবং গুরুর প্রাণনাশকল্পে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহার চক্রান্তজালে বিজড়িত হইয়া মোগলসম্রাট স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়াই কঠিন আজ্ঞা দিয়া একজন সশস্ত্র সৈনিককে গুরুকে লইয়া আসিবার জন্য ঐস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। রাজানুচরকে সম্মুখীন দেখিয়া তেগ্‌বাহাদুরের সকল ভরসা বিলুপ্ত হইল—একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া তিনি অনুচরের সহিত গমন করিলেন। কিন্তু স্থির জানিতেন, তাঁহাকে আর ফিরিতে হইবে না—তাই, যাইবার পূর্ব্বে স্ত্রীপুত্রের নিকট চিরবিদায় লইয়া গেলেন। বালক গোবিন্দসিংহকে আপন পিতৃদত্ত তরবারি প্রদান করিয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণপূর্ব্বক কহিলেন—"পুত্র! শত্রুগণ আমাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। যদি তাহারা আমাকে নিহত করে, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর জন্য শোকে অধীর হইও না। তুমি আমার উত্তরাধিকারী হইলে। দেখিও—মৃত্যুর

পর আমার দেহ যেন শৃগালকুক্কুরে নষ্ট না করে; যেন এই অপমৃত্যুর সমুচিত প্রতিশোধ লওয়া হয়। ভগবদ্‌পদে ভক্তি রাখিবে, তিনিই তোমার রক্ষাকর্ত্তা—তোমার পালক। আশীর্ব্বাদ করি যেন দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া স্বকার্য্যসাধনে সিদ্ধ হইতে পার।”

যাহা হউক, কোনপ্রকার বিচারের পূর্ব্বেই তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল; বিনাপরাধে এই ভাবে নিগৃহীত হইয়া এবং কঠোর দণ্ড ভোগ করিয়া গুরু অবিচলিত রহিলেন—ক্রমে সুখদুঃখে তাঁহার সমভাব আসিল এবং সহাস্যাননে প্রাণত্যাগ করাই তিনি স্থির করিলেন। দুই চারি দিবস ঐভাবে অবস্থানের পর তিনি অবশেষে রাজসমক্ষে নীত হইলেন। স্বয়ং আওরঙ্গজেব বিচারাসনে সমাসীন—চতুর্দ্দিকে উৎসুক দর্শকবৃন্দ অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে শিখগুরুর বিচার আরম্ভ হইল। গুরুর মুখমণ্ডল আজ স্বর্গীয় জ্যোতিতে সুশোভিত। সর্ব্বপ্রথমে ধূর্ত্ত রামরাও তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, “তেগ! তুমি আমাকে বঞ্চিত করিয়া গুরুপদ লইয়াছ—এইবার শাস্তিভোগের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত—প্রস্তুত হও। যদি এখনও আত্মরক্ষা করিতে চাও তাহা হইলে এক্ষণে ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য আছে তাহা প্রকাশ কর, নতুবা প্রাণ হারাইবে।” তেজস্বী শিখগুরু রামরাওয়ের ন্যায় সামান্য একজন লোকের ভৎর্সনাবাক্যে বিচলিত হইবার পাত্র ছিলেন না—সেইজন্য অতীব সাহসের সহিত অম্লানবদনে উত্তর করিলেন—“প্রাণনাশের ভয় কাহাকে দেখাইতেছ? তুচ্ছ মানবজীবনের জন্য আমি কখনও মিথ্যা কহিতে পারিব না। আমি একজন ফকির—এমন কোন অন্যায় কর্ম্ম আমি করি নাই যাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের আরাধনা, তাঁহার মহিমা ও গুণকীর্ত্তনেই আমি আমার কালক্ষেপ করি—আমার নিকট মানবশক্তি তুচ্ছ।” এইরূপ নির্ভীক উত্তর শ্রবণে রামরাওয়ের ঈর্ষ্যানল জ্বলিয়া উঠিল। আওরঙ্গজেব উপায়ান্তর না দেখিয়া গুরুকে অগত্যা স্বীয় ধর্ম্মমাহাত্ম্য প্রদর্শন করিতে আজ্ঞা করায় গুরু উত্তর করিলেন—“জীবনের শেষে আমি একটী—জিনিষ

দেখাইতেছি। একখণ্ড কাগজে কয়েকটী কথা লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া রাখিলাম। দেখিবেন, ঘাতকের অসি যেন উহা স্পর্শ না করে—উহাতেই আমার সমুদয় বক্তব্য লিখিত রহিল।” এই বলিয়া তিনি আপন মাথা বাড়াইয়া দিলেন—সম্রাটের আজ্ঞায় নিমেষমধ্যে ঘাতকের শাণিত অসি শিখগুরুর শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিল। মরজগতে অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গুরু দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার নির্ভীকতা ও সাহসিকতার পরিচয় সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইল। ধর্ম্মান্ধ ভূপতি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন—কাগজখণ্ড খুলিয়া দেখিলেন, জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—

“শির্ দিয়া সার না দিয়া।”

“মাথা দিলাম, কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব দিলাম না।”

এই ভীষণ ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া সভাসদ্ ও দর্শকগণ সকলেই চমকিত হইল। গুরুর পবিত্র দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখা হইল এবং ছিন্ন মুণ্ড মুখহানশাহকে প্রদত্ত হইল। এইভাবে প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষের কিঞ্চিদধিক কাল গুরুপদে অবস্থিত থাকিয়া ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তেগ্‌বাহাদুর অমরধামে চলিয়া গেলেন। তদীয় স্ত্রী গুজুরির গর্ভে প্রথিতনামা পুত্র গোবিন্দসিংহের জন্ম হয়। সেই সময়ে গোবিন্দসিংহ চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকমাত্র ছিলেন।

শিখজাতির ভাগ্যনির্ণায়ক দশম গুরু গোবিন্দসিংহ তৎপরে কিরূপ অভিনব সংস্কারসাহায্যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন, আত্মবলে বলীয়ান হইয়া কি ভাবে জাতীয় উন্নতি বিধান করেন, অতঃপর আমরা তাহারই বিশদালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পথের সম্বল।

(শ্রীহরিপ্রসাদ বসু এম, এ, বি, এল)

কোন অপরিচিত দূরদেশে যাইতে হইলে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু পথের সম্বল সংগ্রহ করিয়া থাকেন ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটনা। কেহ অর্থ, কেহ আহার্য্য, কেহ বা বস্ত্র শয্যাদি ভবিষ্যতের প্রয়োজন বুঝিয়া সঙ্গে লইয়া থাকেন। যেরূপ স্থানে ও যে উদ্দেশ্যে গমন, এই সম্বলও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। বালক যখন প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা দিবার জন্য যাত্রাকালে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরু-জনের চরণে প্রণত হয় ও তাঁহাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ বালকের মস্তকে বর্ষিত হয়, বালক তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ সম্বল জ্ঞান করিয়া বহির্গত হয়; স্বামী যদি পীড়িত হইয়া আরোগ্যলাভের আশায় দূর-দেশস্থ সুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ জন্য দেবমন্দিরে প্রণাম করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হন, পত্নী সেই সময়ে দেবতার নিকট তাঁহার প্রত্যক্ষ দেবতার নিমিত্ত মঙ্গল কামনা করেন—পত্নীর সেই শুভেচ্ছা স্বামীর অন্যতম পথের সম্বল। এইরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল ঘটনা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তা সে নিজেই করুক অথবা তাহার জন্য তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়েরাই করুন—যাহা তাহার জীবনসৌধের ভিত্তিস্বরূপ হয়, সেইগুলিকে তাহার জীবনযাত্রার সম্বল বলিয়া আখ্যা দিলে অসঙ্গত হইবে না। এখন জিজ্ঞাস্য, এই যে সম্বলের আবশ্যক যাহা প্রতি জীবনে প্রত্যেক ব্যাপারে দৃষ্ট হয়, তাহার শেষ কোথায়? যে পর্য্যন্ত আমার এই পৃথিবীতে অবস্থান, যে পর্য্যন্ত মৃত্যু না আসিয়া আমাকে গ্রাস করে, যে পর্য্যন্ত না আমি আমার আত্মীয় বন্ধুবর্গকে কাঁদাইয়া ও আমার শত্রু বা দ্বেষ্টাদিগকে হাসাইয়া প্রস্থান করি, সেই পরিমিত সময়ের জন্যই কি আমাকে সম্বল সংগ্রহ করিতে হইবে,

না তাহার পরের কোন অবস্থা সম্ভবপর হইলে তাহার জন্যও সংগ্রহ করিতে হইবে এবং সেইরূপ সম্বল সংগ্রহ সম্ভবপর কি না? ইহার উত্তর দেওয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এবং ইহার উত্তর দিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক ঃ—

১। আমি কে? ২। মৃত্যুর পরিণাম কি? ৩। আমার গন্তব্য স্থান কোথায়? ৪। সেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার জন্য সম্বল সংগ্রহ চলে কি না? যদি চলে, তাহা কি?

১। আমি কে?

এই প্রশ্ন নূতন নহে, জগতে দর্শনশাস্ত্রের প্রথমাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া উহার পরিণত অবস্থা পর্য্যন্ত ঐ প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান হইতেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ঐ প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন মীমাংসাও করিয়াছেন।

এক শ্রেণীর লোক "আমি" বলিতে দেহের অতিরিক্ত কিছু বুঝেন না। তাঁহাদের মতে এই দেহ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আমার সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই দেহের অবসানেই "আমি"র অবসান হয়—মরিয়া গেলে কিছুই থাকে না—"Mind is a function of the brain"—মন মস্তিষ্কের স্পন্দনব্যাপার মাত্র। ইহাই দেহাত্মবাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রতীচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই এই মতের পরিপোষক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সুখের বিষয় এইরূপ দেহাত্মবাদীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

অন্য শ্রেণীর মতে মন ও দেহ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মধ্যে লক, হিউম, বেন, মিল প্রভৃতি এক শ্রেণীর লেখকগণ Mind, Ego বা Self এর একপ্রকার ব্যখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা এই ঃ—আমাদের মানসিক অবস্থাগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা thought or intellect, feeling, will or volition। একটী গোলাপফুল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে আমরা তাহার বর্ণ, আকার, ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করি—ইহাই হইতেছে গোলাপফুল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান,

ইহাকে thought বলা যায়। গোলাপফুলের সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আমাদের মনে যে আনন্দ উত্থিত হয় তাহাই হইল feeling বা ভাব; আর ঐরূপ জ্ঞান ও আনন্দ হওয়ার পর আমরা যে তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি, ইহাই হইল will or volition। অথবা মনে করুন আপনার সম্মুখে কোন এক নিষ্ঠুরপ্রকৃতি পাষণ্ড দুর্ব্বল ও সহায়হীন ব্যক্তির প্রতি অযথা অত্যাচার করিতে উদ্যত, দর্শনমাত্রেই আপনার ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হইল ও আপনি তাহাকে বাধা দিয়া আর্ত্ত ব্যক্তির পরিত্রাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এখানে দর্শনক্রিয়া, জ্ঞানের অন্তর্গত ও পরিত্রাণের চেষ্টা, ইচ্ছাশক্তি বা ক্রিয়াশক্তির অন্তর্গত এবং ক্রোধ ও ঘৃণা, ভাবের অন্তর্গত। মানসিক যে কোন অবস্থা পর্য্যালোচনা করা যাউক না কেন, তাহা এই তিনটীর একটী হইবেই হইবে, কিন্তু মন যে এই তিনটী বিভাগের কোন একটীকে আশ্রয় করিয়া অপর দুইটীকে একেবারে বাদ দিয়া কার্য্য করে, তাহা নহে। মনের প্রত্যেক অবস্থাতেই এই তিনটী বৃত্তি অল্পাধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে—কোন অবস্থা জ্ঞানপ্রধান, কোন অবস্থা ভাবপ্রধান, কোন অবস্থা বা বা ইচ্ছাপ্রবল। বাহ্য জগতেও ইহা সুন্দররূপে প্রতীত হয়; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই সকলের সমবায়ে জগৎ—ইহার কোনটী সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে আমরা উপলব্ধি করি না, তবে কোন বস্তু শব্দ-প্রধান কোন বস্তু বা স্পর্শপ্রধান ইত্যাদি। সংস্কৃতশাস্ত্রে ইহার নাম "পঞ্চীকরণ" দেওয়া হইয়াছে। এখন উপরোক্ত দার্শনিকগণ বলেন যে মন এই অবস্থাসমূহের সমষ্টিমাত্র। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা যে ভিন্ন ভিন্ন আন্তরিক অবস্থা অনুভব করিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা বর্ত্তমান সময়ে উপস্থিত থাকে ও অবশিষ্ট অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত থাকে, কিন্তু স্মৃতিশক্তির প্রভাবে আমরা তাহাদিগকে অতীতের গর্ভ হইতে বর্ত্তমানে উপস্থিত করিতে পারি এবং ইহাও আমরা উপলব্ধি করি যে, এই সকল অবস্থা পর্য্যায়-ক্রমে একের পর আর—শ্রেণীবদ্ধভাবে ঘটিয়া আসিয়াছে ও তাহাদের মধ্যে একটী শৃঙ্খলা বিদ্যমান আছে। স্মৃতিশক্তিপ্রভাবে উপস্থাপিত,

পর্য্যায়ক্রমে সঙ্ঘটিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ অতীত অবস্থানিচয়ের সহিত সম্পর্কিত বর্ত্তমান মানসিক অবস্থাসমষ্টিকে মন আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। Millএর মতে Mind is a permanent possibility of sensations, thought emotions and volition. এই শ্রেণীর দার্শনিকগণের মতে এই সকল অবস্থা হইতে পৃথক স্বতন্ত্র কোন পদার্থের অস্তিত্ব জানিবার উপায় নাই—মিলের মতকে সেই জন্য অজ্ঞেয়-বাদ বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু Mind বা Egoর এই ব্যাখ্যায় অনেকে তৃপ্তি লাভ করেন না; তাঁহারা বলেন যে, একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়—মানসিক কোন এক অবস্থা অন্য এক অবস্থাকে জানিতে পারে না। আমরা কখনই বলিতে পারি না যে, আমার একটী দর্শনক্রিয়া বা শ্রবণক্রিয়া আর একটী দর্শনক্রিয়া বা শ্রবণক্রিয়াকে জানিতে পারিল, কি আমার কোন এক চিন্তা বা thought, কোন একটী feeling (ভাব) বা will (ইচ্ছা) কে জানিতে পারিল। যদি তাহাই না হইল, তবে যুগপৎ বর্ত্তমান মানসিক অবস্থাসমূহের সমষ্টিই বা কোন এক অবস্থা-বিশেষকে জানিবে কি করিয়া? ব্যষ্টিভাবে মানসিক অবস্থায় যে শক্তি নাই, সমষ্টিভাবে তাহার সে শক্তি কোথা হইতে আসিবে? ব্যক্তি সাধারণ বলিয়া থাকেন "আমার মন" "আমার সুখ দুঃখ" "আমার জ্ঞান" "আমার ইচ্ছা"। এইরূপ ব্যবহার হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই জ্ঞাতা বা ভোক্তা বা কর্ত্তা ইনি আপনাকে স্বীয় জ্ঞান বা ভাব বা ইচ্ছাদি কার্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক বলিয়া জ্ঞান করেন ও সেইরূপই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে আমি এক্ষণে অবস্থাবিশেষ অনুভব করিতেছি, সেই আমি পূর্ব্বেও অবস্থাবিশেষ অনুভব করিয়াছিলাম; পূর্ব্ব অনুভূত-অবস্থা ও বর্ত্তমান অনুভব-অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও অনুভবকর্ত্তা যে আমি—তাহা একই। অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থায়ী একত্বের এই যে ধারণা, ইহাই হইতেছে "আমিত্বে"র বা egoর প্রাণ।

"Self is thought to be the unity in the midst of diverse kinds of sensations, the permanent element in the midst of

transient and successive sensations, the one conscious subject in the midst of many known objects.'

এইরূপ চিন্তাপ্রণালী দ্বারা আমরা এই সত্যে উপস্থিত হইলাম যে মন বা ego দেহ নহে বা মানসিক অবস্থানিচয়ের সমষ্টিমাত্র নহে। ইহা তাহা হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ—অবস্থানিচয় যাহার বিকার মাত্র। ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে ইহাকে noumenon কহে, as opposed to phenomenon। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্যাণ্ট প্রভৃতি এই মতের পোষক।

এইখানে ইহা বলা উচিত যে, ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মতের পরিচয় দিবার কালে Self ego mind পরস্পর convertible terms বা অনুরূপ শব্দ বলিয়া ব্যবহার করিয়াছি। আমাদের শাস্ত্রে Self বা Ego এবং মন ইহাদের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। Self বা Ego চৈতন্য পদার্থ, মন জড় ইন্দ্রিয় মাত্র—একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম। আমাদের দর্শনশাস্ত্রের পরিচয় দিবার কালে ঐ বিষয় পরিষ্কার করা যাইবে। আরও বলা উচিত, আধুনিক জার্ম্মাণ দার্শনিকগণ অনেকাংশে বেদান্তের উপর তাহাদের দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কাজেই হিন্দুদর্শনের সহিত তাঁহাদের মতের অনেক সাদৃশ্য আছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, "আমিত্বে"র একটা ধারণায় আমরা উপস্থিত হইলাম, এই "আমিত্বে"র শেষ কোথায়? ইহার goal কোথায়? যত দিন আমার দেহ, তত দিনই কি আমি? মৃত্যুতেই কি "আমার" অবসান? এই যে সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া, আশা নিরাশার ভিতর দিয়া, "জয় পরাজয় উপযুক্ততা অনুপযুক্ততার" ভিতর দিয়া প্রীতি অপ্রীতির সহিত বন্ধুত্ব ও বিবাদ করিয়া, সুশিক্ষা ও কুশিক্ষার ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া, মায়া মমতার গণ্ডী দিয়া আমাকে তৈয়ার করিলাম—মৃত্যু ধ্রুব জানিয়াও "আমায় আমার" এই গগনভেদী শব্দে জগতের মধ্যে আমার নিজস্ব একটা অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া আসিলাম, পাঞ্চভৌতিক দেহের বিশ্লেষণের সহিত কি তাহা লোপ পাইল? তাই যদি হয় তবে এত

করিবার প্রয়োজন কি? এত জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিবার, এত পরীক্ষা দিবার, এত যত্ন চেষ্টা উৎসাহ উদ্যমের আবশ্যক কি? কোথায় দায়িত্ব-বোধ, কোথায় পাপপুণ্য, কোথায় ধর্ম্মাধর্ম্ম, কোথায় দণ্ড পুরস্কার—কিছুরই ত অবসর থাকিল না? জীবন যে মুহূর্ত্তে অসহ্য বোধ হইল তাহা তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া ফেলিলেইত আপদ চুকিয়া গেল! মহাকবি সেক্সপীয়র তাঁহার অমরসৃষ্টি হ্যামলেটের মুখ দিয়া—এই জীবনসমস্যা তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।—"To be, or not to be, that is the question— ইত্যাদি—বাহুল্যভয়ে সমস্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

সংসারে মানবজীবন লাভ করিয়া এই প্রশ্ন মানবহৃদয়ে উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক, তাই জগতের সাহিত্যভাণ্ডারে ইহারও মীমাংসার চেষ্টা দেখিতে পাই।

২। মৃত্যুর পরিণাম কি?

প্রথমে জনৈক চিন্তাশীল ইংরাজ লেখকের এই সম্বন্ধে চিন্তা পাঠকগণের সম্মুখে স্থাপন করিব। তিনি বলেন—

(ক) মানবেতর জীবের প্রতি লক্ষ্য করিলে জন্মাবধি অন্তকাল পর্য্যন্ত তাহাদের অবস্থার কত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই না ঘটিয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায় গুটীপোকা প্রজাপতি আকারে পরিণত হইলে, পক্ষী ডিম্ব ভেদপূর্ব্বক শাবক আকারে পরিণত হইলে তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার, শক্তিসামর্থ্যের কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়। মানবজাতিতে এই বিচিত্র ও বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। মাতৃগর্ভে বীজ আকারে অবস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্যের পলিত কেশ জীর্ণ দেহ কুঞ্চিত ত্বক পর্য্যন্ত যেমন দৈহিক পরিবর্ত্তন, ক্ষুদ্র মানসিক শক্তির উন্মেষ হইতে প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার বিকাশ পর্য্যন্ত তেমনি মানসিক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তবে মৃত্যুও যে একটা পরিবর্ত্তন নয়, তাহা কে বলিল?

(খ) পরমেশ্বর আমাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ অনুভব করিবার বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন—নিত্যই আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করি। কার্য্য

বিশেষ আমাদের সুখের কারণ, অপরদিকে কার্য্যান্তর আমাদিগের নিকট দুঃখ আনিয়া উপস্থিত করে। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের সুখ দুঃখানুভবের শক্তি বর্ত্তমান থাকে। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, মৃত্যুরূপ পরিবর্ত্তনের পরেও আমাদের সেই শক্তি বর্ত্তমান থাকিবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা শক্তির ধারাবাহিকরূপে বিদ্যমান থাকা বিশ্বাস করিয়া থাকি। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ আজ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সুদূর অতীতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ও সুদূর ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে—ইহা কি আমরা বিশ্বাস করি না? তাহা যদি বিশ্বাস করিয়া থাকি, তবে আমাদের সুখদুঃখানুভবের শক্তি যাহা ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, তাহা যে পরেও বর্ত্তমান থাকিবে ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ কি?

(গ) এই বিশ্বাস দুই প্রকারে জন্মিতে পারে।

(১) মৃত্যুরূপ পদার্থের প্রকৃতিগত শক্তি অথবা ধর্ম্ম (reason of the thing) পর্য্যালোচনা দ্বারা অথবা (২) জাগতিক ব্যাপার হইতে অনুমান দ্বারা।

মৃত্যুর প্রকৃতিগত শক্তি অথবা ধর্ম্ম যে কিরূপ—সে বিষয়ে সাধারণ মানব অজ্ঞ। মৃত্যু যে স্বরূপতঃ কি তাহা আমরা অবগত নহি, আমরা কেবল মৃত্যুজনিত কতকগুলি ক্রিয়া বা ফলের সহিত পরিচিত—যেমন আমরা দেখিতে পাই মৃত্যু হইলে জীবের অস্থিমাংসাদি গঠিত দেহ নষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে জীবের ধ্বংস হয়, ইহা অনুমান করা সমীচীন নহে। যেমন জড়পদার্থে গতি শক্তি অলক্ষিতভাবে বিদ্যমান থাকে তেমনি নিদ্রিত বা মূর্চ্ছিত অবস্থাতে জীবের অন্তর্নিহিত শক্তি অলক্ষিত ভাবে বর্ত্তমান থাকে। ইন্দ্রিয়গোচর নয় বলিয়া ঐ শক্তি-সমূহ যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

জাগতিক ব্যাপার হইতেও ইহা অনুমান করিবার বিশিষ্ট কোন কারণ দেখা যায় না। কারণ, জগতে এমন কোন উদাহরণ আমরা

দেখিতে পাই না, যাহা হইতে আমরা মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অস্তিত্বশালী শক্তিগুলির তাহার পরক্ষণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল—ইহা বলিতে পারি। আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিতে আমরা তাহাদিগকে উপলব্ধি না করিতে পারি, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম মৃত্যুর অপর পারে তাহাদিগকে অনুসরণ না করিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া কি বলিব যে তাহারা লোপ পাইল? আমাদের শক্তিহীনতা তাহাদের আযকালের পরিমাপযন্ত্র হইতে পারে না।

যাহা হউক, ঐ সম্বন্ধে আর একটু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখা যাউক।

(১) বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, যাহা মৌলিক, অন্য বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন নহে তাহার বিনাশ নাই। যাহা একাধিক বস্তুর সংযোগে গঠিত তাহার বিনাশ হইতে পারে অর্থাৎ ঐ একাধিক বস্তুর পরস্পর বিয়োগ ঘটায় সেই সংযোগোত্থ বস্তু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহা মূলেই এক, তাহার বিয়োগ ঘটান চলে না। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের জ্ঞান কি যৌগিক? তাহা কোন অংশেই আমরা অনুভব করি না। জ্ঞান এক হইলে জ্ঞানের আধার যে জীব বা পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞাতা তিনিও এক এবং বিজ্ঞানের নিয়মে তাঁহার বিনাশ হইতে পারে না। অবশ্য দেহের সহিত এই জীবের অর্থাৎ জড়ের সহিত চৈতন্যের সাহচর্য্য রহিয়াছে বটে কিন্তু জড় সংযোগ ব্যতীত চৈতন্যের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তাহা অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নহে।

(২) জ্ঞাতা বা পুরুষের একত্ব বা অপরিচ্ছিন্নতা বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা প্রমাণ করা দুষ্কর হইলেও ইহা বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে দেহস্থিত জ্ঞাতা পুরুষ দেহ নহেন। দৈব দুর্ব্বিপাকে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হানি হইতে পারে, আমাদের ইন্দ্রিয়-বিশেষ বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে এমন কি আমাদের দেহের অধিকাংশ নষ্ট হইতে পারে তথাপি আমরা পূর্ব্বেও যে জীব ছিলাম অঙ্গহানি বা ইন্দ্রিয়াদি বিনাশের পরেও সেই জীবই

থাকি। বিশেষ বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটা পরীক্ষিত সত্য যে জীবের দেহগঠনকারী অণুপরমাণু নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। বাল্যাবস্থায় আমার দেহে যে উপাদান বর্ত্তমান ছিল বৃদ্ধাবস্থায় তাহার কিছুই থাকে না, অথচ আমার তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। আমি শিশু অবস্থাতেও যে আমি, মৃত্যুশয্যাতেও সেই আমি। একটু বিশেষভাবে যদি ইন্দ্রিয়াদির প্রতি লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলেও ঐ সত্যে উপনীত হওয়া যায়। চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের দর্শনশক্তি লাভ হয়, কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের শ্রবণশক্তি লাভ হয় ইত্যাদি। আমরা নিত্যই দেখিয়া থাকি যে, চল্লিশ বৎসর বয়স হইলে আর নিরপেক্ষ চক্ষুদ্বারা দৃষ্টিকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। তখন তাহার সাহায্য জন্য চশমার প্রয়োজন হয়; অনেকের নানাকারণে শ্রবণশক্তির অল্পতা আসিবার পরে তাহার সাহায্যজন্য যন্ত্রের আবশ্যক হইয়া পড়ে। পদহীনতার জন্য গমনশক্তির হ্রাস বা অভাব হইলে কৃত্রিম উপায়ে গমনাগমন সাধন করিতে পারা যায়। আবার স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা সম্পন্ন করিয়া থাকে। স্বাভাবিক গমনশীল ব্যক্তি কৃত্রিম উপায়ে চলাচলের দ্রুততা সম্পাদন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে একজন মৃত ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি হয়ত বেশ নির্দ্দোষ অবস্থায় আছে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোন ক্রিয়াই নিষ্পন্ন হয় না। এইরূপ বিচার দ্বারা আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রমাত্র, তদতিরিক্ত যন্ত্রী যিনি তিনিই "আমি"। যন্ত্রের বিনাশের সহিত যন্ত্রীর বিনাশের কোন সম্ভাবনা নাই।

এ পর্য্যন্ত আমরা দেহ ও ইন্দ্রিয় লইয়া আলোচনা করিলাম কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয় ব্যতীত মানবের আরও কতকগুলি সম্পদ্ আছে, যেমন তাহার চিন্তা বৃত্তি, প্রীতি বৃত্তি। একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল বৃত্তির চরিতার্থতা জন্য দেহ বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎভাবে আবশ্যক হয় না। অবশ্য ঐজন্য প্রথমে

পঞ্চেন্দ্রিয়সহযোগে উপাদান সংগ্রহ করিতে হয় বটে, কিন্তু উপাদান সংগ্রহ হওয়ার পর আর ইন্দ্রিয় যে অবস্থাতেই থাকুক না, আমি অনায়াসে চিন্তা করিতে ও প্রীতির অনুশীলন করিতে পারি। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রবণবৃত্তি রোধ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া আমি প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা সম্ভোগ করিতে পারি স্বপ্নে দেবত্ব লাভ করিয়া জগতে জীবকল্যাণের জন্য অপরিমেয় শান্তিসুধা বিতরণ করিতে পারি। তবেই দেখা যায় যে, চেতনের ঐ ঐ বৃত্তির সহিত অচেতনের ঘনিষ্ঠ কোন সম্বন্ধ নাই। একের লয়ে অপরের লয় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। স্থূল দেহের বিনাশে sensation (ইন্দ্রিয়ানুভূতি) গ্রহণ করিতে না পারি, reflection (মনন) এর কোন বাধা নাই।

এই সকল যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া Bishop Bulter বলিতেছেন—"And thus when we go out of the world, we may pass into new scenes, and a new state of life and action, just as naturally as we came into the present. And this new state may naturally be a social one And the advantages of it advantages of every kind, may naturally be bestowed, according to some fixed general laws of wisdom, upon every one in proportion to the degrees of virtue

এতক্ষণ আমরা এই দুই প্রশ্ন সম্বন্ধে ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মত দেখিলাম ; এইবার আত্মা, মন, মৃত্যুর ফলাফল সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শন কি বলিতেছেন তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব। এখানে আমরা কেবল মাত্র যুক্তিতর্কের ক্ষীণ ভাষা শুনিয়াই পরিতৃপ্ত নহি—প্রত্যক্ষদর্শীর গুরুগম্ভীর নির্ঘোষ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

প্রথমেই পঞ্চদশী কি বলেন দেখুন। স্থানাভাব তত সুগম নহে বলিয়া মূল শ্লোকগুলির অনুবাদ মাত্র নিম্নে দিতেছি। জীব সাধারণতঃ তিন অবস্থায় থাকে—জাগ্রৎ, অর্দ্ধজাগ্রৎ ও অর্দ্ধসুষুপ্ত (অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা) এবং সুপ্ত—এই তিন অবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সকলের জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"শব্দস্পর্শাদি জ্ঞেয় বিষয়সকল বিচিত্রতাবশতঃ জাগ্রৎকালে পৃথক্ পৃথক্।

সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা বিবিক্ত ঐ বিষয়সকলের যে সম্বিৎ (Consciousness) একরূপতাপ্রযুক্ত অভিন্ন।

"স্বপ্নকালেও সেইরূপ, পার্থক্য এই যে স্বপ্নকালে বেদ্য বিষয়সকল অস্থির অর্থাৎ অব্যবস্থিত, জাগৎকালে স্থির অর্থাৎ সুব্যবস্থিত।

"স্বপ্নকালে ও জাগ্রৎকালে দুয়ের মধ্যে বিষয়ঘটিত এইরূপ প্রভেদ কিন্তু উভয় কালের সাক্ষীস্বরূপা যে সম্বিৎ তাহা একই, অভিন্ন (কেননা সম্বিৎ যদি একই না হইত তাহা হইলে নিদ্রাভঙ্গের সময় নিদ্রাবস্থার কোন স্বপ্নবৃত্তান্ত কাহারও স্মরণে আবির্ভূত হইত না)।

"সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতিতে সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান অন্ধকার-বোধ আবির্ভূত হয় অর্থাৎ নিদ্রাকালে আমি কিছুই জানিতেছিলাম না এইরূপ স্মরণ হয়। এখন দেখুন যে জ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় ভিন্ন অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় কখনও স্মৃতির বিষয় হইতে পারে না। অতএব সুষুপ্তিকালে 'আমি কিছু জানিতেছি না।

'এইরূপ অজ্ঞান অন্ধকার সুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানে বর্ত্তমান ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। এই অজ্ঞান অন্ধকার বোধ অজ্ঞান অন্ধকাররূপ বিষয় হইতে পৃথক।

"এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, একই সম্বিৎ যেমন এক দিনের জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত এই তিন অবস্থার সাক্ষী তেমনি তাহা দিনান্তরেরও সাক্ষী।

তাহার পর পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"মাসাব্দ যুগকল্পেষ গতাগম্যেষ্বনেকধা
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা॥"

মাস, বৎসর, যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে—তাহার মধ্যে কেবল স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎ উদয়ও হয় না, অস্তও যায় না। তার পরেই বলিতেছেন

"ইয়ং আত্মা"—"এই সম্বিৎই আত্মা"। *

পঞ্চদশী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, আত্মা বা Self শব্দস্পর্শাদি-ভূত বিষয়সমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক বস্তু।

অতএব আমরা যদি সাংখ্যের বা বেদান্তের বা ভাগবতপুরাণের কি গীতার এই সম্বন্ধে মত আলোচনা করি তাহা হইলেও দেখিতে পাইব, তাঁহারা সমস্বরে প্রকাশ করিতেছেন—আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আত্মা পুরুষ ও মন প্রকৃতির বিকারজনিত

* পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ।

ইন্দ্রিয়াদির অন্যতম একাদশ ইন্দ্রিয়—ঐ সকল শাস্ত্রের মধ্যে ঐ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। সাংখ্যের দুই একটী শ্লোকের অনুবাদ এখানে দিলাম।

'মূল প্রকৃতি বিকৃতি নহেন, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সাতটী বস্তু প্রকৃতি বটে, ষোলটী বস্তু শাঁটী বিকৃতি এবং পুরুষ অর্থাৎ আত্মা প্রকৃতিও নাহেন বিকৃতিও নহেন।

"প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার অহঙ্কার হইতে ষোড়শ তত্ত্ব, সেই ষোড়শ তত্ত্বের অপকৃষ্ট পঞ্চতত্ত্ব হইতে (স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি।

"অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই দ্বিবিধ কার্য্য উৎপন্ন হয়

এই একাদশ ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক, তাহা সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে এবং পঞ্চ তন্মাত্র তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয় এই উভয়াবধ কার্য্যেরই রাজস অহঙ্কার অন্যতর কারণ।

"জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী।

মন জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়স্বরূপ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনও একটী ইন্দ্রিয়

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাংখ্যদর্শনের সহিত অন্য দর্শনের বা শাস্ত্রের এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। সকল শাস্ত্রের শিক্ষার স্থূল মর্ম্ম এই যে—পুরুষ আত্মা, প্রকৃতি তাঁহার শক্তি এবং উভয়ই অনাদি—অবশ্য সাংখ্যে ও বেদান্তে এই স্থানে মর্ম্মান্তিক প্রভেদ আছে। সাংখ্য প্রকৃতি ও পুরুষ স্থাপন করিয়া এই দ্বৈতভাবের উর্দ্ধে উঠেন নাই, বেদান্ত ঐ দ্বৈতভাব ঘচাইয়া এক চরম একত্বে উপস্থিত হইয়াছেন— "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। বেদান্তের মতে পুরুষ ও প্রকৃতি একই পরমাত্মার বিভিন্ন ভাব মাত্র (different aspects)। কিন্তু আমরা যে আত্মা ও মনের পার্থক্য বুঝিতেছিলাম, তৎ সম্বন্ধে উহাতে আসে যায় না। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির ক্ষোভ হইয়া মহত্তত্ত্ব মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই অহঙ্কারতত্ত্ব ত্রিবিধ— সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়ের নাম 'করণ' এবং সেই জন্য

মনের নাম 'অন্তঃকরণ'—এই সকল তত্ত্ব হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি। কিন্তু এই সমস্তই জড়; চৈতন্যময় আত্মার অধিষ্ঠানবশতঃই তাহারা চেতনের ন্যায় প্রতিভাত হয়। (পৌরাণিক কথা)।

এই যে শাস্ত্রমতে দেহ ও মন হইতে পৃথক আত্মা পাইলাম—এই আত্মার স্বরূপ কি? ইনিই ব্রহ্ম। ইঁহাকে শ্রুতিতে নির্গুণও বলিয়াছেন সগুণও বলিয়াছেন। কোন মতে তিনি নিরুপাধিক, নির্গুণ, বাক্য-মনের অগোচর, অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য। কোন মতে তিনি সগুণ, অশেষ কল্যাণ গুণের আকর; তিনি বাক্য মন ও বুদ্ধির অগোচর নহেন। তিনি অজ্ঞেয় বা অচিন্ত্য নহেন (গীতায় ঈশ্বরবাদ)। অদ্বৈতবাদীর ও বিশিষ্টা দ্বৈতবাদীর এই মতদ্বৈতরূপ গহনবনে ক্ষুদ্র আমাদের যাইবার আবশ্যক নাই। যাহা হউক, সেই আত্মাই কি 'আমি'? জ্ঞানীর মতে তাহাই বটে। কিন্তু ভক্ত বলেন, না। 'আমি' তাঁহার অংশবিশেষ, তিনি চিদ্ঘন, আমি চিদংশ, তিনি অগ্নি আমি স্ফুলিঙ্গ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন—'ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন। জীবের স্বরূপ-যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥" সমাধিযোগে চরম একত্বের উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণ মানবের অহংবুদ্ধি থাকিবেই এবং ততদিন পর্য্যন্ত তাহার পক্ষেও দ্বৈতবাদীর পন্থাই প্রশস্ত। শুধু তাহাই নহে, উহা ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর নাই। তাই তিনি বলেন, তিনি সাগর আমি বুদ্‌বুদ, তিনি সূর্য্য, আমি সূর্য্যকিরণ। কি জানি কোন লীলা করিবার অভিপ্রায়ে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরম পুরুষ পরমাত্মা "বহু" হইবার ইচ্ছাকরতঃ উপাধি গ্রহণ করিয়া জীবরূপে দেখা দেন—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"। আমি সেই জীব—আমার আত্মা সেই জীবাত্মা "আমি সেই সর্ব্বব্যাপী পরমানন্দনিলয় অনাদি অনন্ত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার অংশবিশেষ। পরমাত্মা বিভু, তিনি নিজ মহিমায় মহিমান্বিত; আমি দুর্ব্বল, শোকমোহে মুহ্যমান জীব, তথাপি তাঁহারই মহিমা আমাকেও মহিমান্বিত করিয়াছে।" এখন এই যে "আমি" বা জীবাত্মা—মৃত্যুর সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? মৃত্যুতেই কি ইহার

বিনাশ? এ সম্বন্ধে ইংরাজী দর্শনের উত্তর পাইয়াছি, হিন্দুশাস্ত্র কি বলেন দেখুন —

"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭
"অন্তবন্ত ইমে দেহানিত্যাস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮
"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯
"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ২০
"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩
"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

ভগবান্ বলিতেছেন যে আত্মা অবিনাশী, অব্যয়, নিত্য, অপ্রমেয়, বাহ্যরহিত, শাশ্বত, পুরাণ, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থাণু, অনাদি; এ শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না।

তবে মৃত্যু কি?

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩
"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

"দেহাভিমানী জীবের যেমন এই দেহে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও সেইরূপ অবস্থান্তর মাত্র অতএব জ্ঞানী তাহাতে মোহিত হন না।"

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ

করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে।”

"দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥ ভাঃ ১০।২য় ৩৯
ব্রজং তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবেকেন গচ্ছতি।
যথাতৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ॥ ঐ ৪০

এই দেহ নাশ হইলে—কর্ম্মানুবর্ত্তী দেহী, দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রাক্তন শরীর ত্যাগ করে। যেমন পুরুষ গমনকালে এক পদ ভূমিতে স্থাপন করিয়া, অপর পদে ভূমি পরিত্যাগ করে—যেরূপ জলৌকা তৃণান্তর অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে; সেইরূপ কর্ম্মপথে বর্ত্তমান জীবও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মৃত্যু তাহা হইলে দেহান্তর প্রাপ্তি, জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন বস্ত্র গ্রহণ ভিন্ন কিছুই নহে। জলৌকা যেমন এক তৃণ পরিত্যাগ করিয়া তৃণান্তর গ্রহণ করে, আমি তেমনই আমার জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করি। তবেই দেখিতেছি, মহামনা সেক্ষপীয়র যে সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কেবল কবির কল্পনা মাত্র নহে, তাহার মূলে নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রহিয়াছে—চিন্তার বিশেষ কারণ রহিয়াছে। এক্ষণে বুঝিলাম যে, আমার মৃত্যুর সঙ্গেই আমার জীবনের পরিসমাপ্তি নহে, জীবনযাত্রার শেষ হইল না, গন্তব্য স্থান আছে। কোথায় সে স্থান ইহাই তৃতীয় প্রশ্ন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

উদ্ধব ও ব্রজগোপী।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার, বি, এল)

বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগ। দেবভাগের পুত্র শ্রীউদ্ধব। বৃহস্পতির শিষ্য এবং বৃষ্ণিগণের মন্ত্রিপ্রবর উদ্ধব অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে মথুরা যাত্রার সময় গোপীগণকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিলেন, আমি শীঘ্র ব্রজে ফিরিব। ভগবান্ জানিতেন, ব্রজপুরীস্থ গোপীরা তাঁহার অদর্শনে বিরহোৎকণ্ঠা-বিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন। সেজন্য ভগবান্ অনন্যমনা অতিপ্রিয় উদ্ধবকে একদিন নির্জ্জনে বলিলেন, "হে সৌম্য! একবার ব্রজে যাও এবং পিতামাতার নিকট প্রীতি লইয়া যাও, আর বিয়োগ-বিধুরা গোপীগণকে আমার সন্দেশ দ্বারা শান্ত করিয়া আসিও। আহা! তাহারা আমার অদর্শনে মৃতকল্প হইয়া আছে।" উদ্ধব নিজ প্রভুর সন্দেশ বহন করিয়া গোকুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন, দিবাকর অস্তোন্মুখ হইবার সময় নন্দালয়ে পৌঁছিলেন। সন্ধ্যার গোধূলি-ধূসরিত আবরণে তাঁহার রথ কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল না। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর আসিয়াছেন শুনিয়া নন্দ আনন্দে বাসুদেব জ্ঞানে তাঁহার সৎকার করিলেন। পরে কৃষ্ণরামের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথামৃত আলোচনা করিতে লাগিলেন। উদ্ধব নন্দযশোদার শ্রীভগবানে পরম অনুরাগ দেখিয়া প্রীত হইলেন। নন্দযশোদার তীব্র অনুরাগাতিশয্যহেতু শ্রীকৃষ্ণে মানুষ-বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া উদ্ধব বুঝাইলেন যে, রাম ও কৃষ্ণ মানুষ নহেন, দেবতাও নহেন, কিন্তু জগৎকারণ অন্তর্যামী। তাঁদের আশ্চর্য্য মহিমা, তাঁরা সামান্য নন।

যস্মিন জনঃ প্রাণবিয়োগকালে ক্ষণং সমাবিশ্য মনোবিশুদ্ধং।
নির্হৃত্য কর্ম্মাশয়মাশু যাতি পরাং গতিং ব্রহ্মময়োহর্কবর্ণঃ॥

এই রাম বা কৃষ্ণে যদি প্রাণ বিয়োগকালে ক্ষণমাত্রও কেহ

বিশুদ্ধ মন নিবিষ্ট করিতে পারে সে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মবাসনা ছেদন করিয়া "ব্রহ্মময" আনন্দস্বরূপ ও "অর্কবর্ণ" প্রকাশস্বরূপ হইয়া পরপদ প্রাপ্ত হয়। তোমাদের তাঁহাতে পরম অনুরাগ, অতএব তোমরা নিশ্চযই কৃতকৃতার্থ হইয়াছ। নন্দযশোদার তীব্র দর্শনলালসা বুঝিয়া বলিলেন :—

মা খিগুতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি॥

হে মহাভাগ! খেদ করিওনা। কৃষ্ণ কাছেই বহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখ। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠে, সেইরূপ তিনি ভূতগণের অন্তর্হৃদয়ে রহিয়াছেন। সত্য বটে, কাষ্ঠ মন্থন না করিলে অগ্নি দেখা যায় না, সেইরূপ ভক্তি বিনা কৃষ্ণ দেখা যায না। কিন্তু তোমাদেব তো পূর্ণ ভক্তি, তোমাদের সাক্ষাৎকার অবশ্যই হইতেছে।

নন্দযশোদার ভগবানে আত্মীয়বুদ্ধি লক্ষ্য করিযা বলিতেছেন,

ন হ্যস্যাতিপ্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ বাস্তি অমানিনঃ।
নোত্তমঃ নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপি বা।
ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদযঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এবচ।
ন চাস্য কর্ম্ম বা লোকে সদসন্মিশ্র যোনিষ্।
ক্রীড়ার্থঃ সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে।

তিনি দেহাভিমান শূন্য ও সমদ্রষ্টা। কেহ তাঁর প্রিয় নহে, কেহ অপ্রিয় নহে; সেইরূপ কেহ উত্তম নহে, কেহ অধম নহে, কেহ অসমও নহে।

তাঁহার কেহ মাতা নাই, কেহ পিতা নাই; তাঁহার ভার্য্যা নাই, পুত্র নাই, আত্মীয নাই, পর নাই, তাঁহার দেহ নাই, জন্ম নাই, কর্ম্ম নাই; তবে লীলাহেতু ও সাধুগণের পরিত্রাণজন্য কখন কখন দেবাদি শরীরে, কখন কখন মৎস্যাদি শরীরে, কখন কখন নৃসিংহাদি শরীরে স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হন।

তাঁদের পুত্রবুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।
সর্ব্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতামাতা চ ঈশ্বরঃ॥

ভগবান হরি কেবল তোমাদের পুত্র নহেন, কিন্তু সকলের পুত্র। তিনি সকলের আত্মা, পিতা, মাতা ও স্বামী।

তার পর উদ্ধব বুঝাইলেন, এই বিশ্ব কৃষ্ণময়। দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং বা। বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ॥

যাহা কিছু দেখ, শুন, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থাবর, জঙ্গম, মহৎ, অল্পক—সবই সেই অচ্যুত; সেই অচ্যুত ছাড়া আর কিছু বাচ্য নাই। কারণ পরমার্থভূত তিনিই সব। এইরূপ কথাবার্ত্তায় উদ্ধব ও নন্দ সে নিশা যাপন করিলেন। রাত্রিশেষে গোপীকণ্ঠে কৃষ্ণগান শুনিতে লাগিলেন। "নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্"—ঐ প্রভাতী কৃষ্ণ-গীতি সর্ব্বদিকের অমঙ্গল নাশ করে। দিনমণি উদিত হইলে গোপীরা নন্দদ্বারে হেমময় রথ দেখিল। গোপীরা রথদর্শন করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, এ কে আসিল। আবার কি অক্রূর আসিল! এইবার আমাদের মাংস দ্বারা পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধা করিবেন! তারপর তাঁহারা দেখিলেন, অক্রূর নহে, কিন্তু এক আজানুলম্বিত বাহু কমললোচন, পীতাম্বর, পুষ্করমালি সুন্দর পুরুষ। তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহার বেশ কৃষ্ণের ন্যায়। ইনি কে! কোথা হইতে আসিলেন? তারপর শুনিলেন, তিনি কৃষ্ণানুচর। গোপীরা তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্ম্মাণি রুদন্ত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ।
তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোরবাল্যয়োঃ।

গোপীরা লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁর কৈশোর ও বাল্যলীলা স্মরণ করিয়া সেই সব বর্ণন করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা অভিমান করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচিন্তা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু পারিয়া উঠিতেছেন না।

যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযুষ বিপ্রুট্ সকৃদ

দনবিধূতস্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদিগৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা।
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি॥

যাঁর লীলা পরমানন্দজনক ও কর্ণপীযুষ তাহার কণিকা একবার আস্বাদন করিলে বহুজনের পতিপত্নীস্নেহ ত্যাগ হইয়া যায় এবং তাহারা অচেতনপ্রায় হয় এবং শীঘ্র দুঃখিত গৃহকুটুম্ব ত্যাগ করিয়া ভোগহীন পক্ষীর ন্যায় ইহলোকে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া মাত্র প্রাণধারণ করে। অতএব কৃষ্ণকথা যদ্যপি পরিত্যজ্য, কিন্তু আমরা তাহা ত্যাগ করিতেছি না, কি করিব?

উদ্ধব তাঁদের কৃষ্ণদর্শনলালসা দেখিয়া বলিলেন—

অহো যূয়ম্ পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসাং ইত্যর্পিতং মনঃ॥
দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা।
ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপিদুর্লভা॥
দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।
হিত্বা বৃণীত যদ্যূয়ং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরং॥

অহো, তোমরা কৃতার্থ হইয়াছে; তোমরা লোকপূজিত, কারণ ভগবান বাসুদেবে তোমরা ঈদৃশ মন সমর্পণ করিয়াছ।

দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, স্বাধ্যায়, সংযম এবং অন্য বিবিধ শ্রেয়সাধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভক্তি সিদ্ধি হয়।

আর তোমাদের ভাগ্যক্রমে উত্তমঃশ্লোক ভগবানে মুনিগণেরও দুর্লভা ভক্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে তোমরা পুত্র, পতি, দেহ, স্বজন, ভবন ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণাখ্য পরমপুরুষকে বরণ করিয়াছ।

উদ্ধব ভাবিতেন, ভগবান নিরর্থক গোপীদের প্রশংসা করেন। ভগবান উদ্ধবের মানস বুঝিয়া তাঁহাকে ব্রজে পাঠান। উদ্ধব গোপী-দের ভক্তি দেখিয়া বলিলেন,

সর্ব্বাত্মভাবেঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে।
বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥

হে মহাভাগ্যবতীগণ। তোমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একান্ত ভক্তিযোগে প্রাপ্ত হইয়াছ। ভগবদ্‌বিরহ দ্বারা একান্ত ভক্তি লাভ হয়, ইহা তোমাদের নিকট শিখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। উদ্ধব তারপর ভগবদ্‌সন্দেশ বলিলেন,—

শ্রীভগবানুবাচ।

ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা কচিৎ।
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জলং মহী।
তথাহং চ মনঃ প্রাণ বুদ্ধীন্দ্রিয় গুণাশ্রয়ঃ॥
আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজেহন্ম্যনুপালয়ে॥
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা॥
আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোঽগুণান্বয়ঃ॥
সুষুপ্তস্বপ্নজাগ্রদ্ভির্ম্মনোবৃত্তিভিরীযতে॥
যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ।
তন্নিরন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত॥
এতদন্তঃ সামাম্নয়োঃ যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ॥
যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরেবর্ত্তে প্রিয়োদৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া॥
যথা দূরপরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চিত্তং সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে॥
ময্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ॥
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥

এই ভগবদ্‌সন্দেশের দুইটী ব্যাখ্যা আছে। কেহ কেহ বলেন, এই সন্দেশ জ্ঞানময়, কেহ কেহ বলেন প্রেমময়। জ্ঞানময় ব্যাখ্যা এইরূপ—

আমি সকলের উপাদান, সেজন্য তোমাদের সঙ্গে আমার বিয়োগ

দেশতঃ কালতঃ হইতে পারে না। যেরূপ চরাচর ভূতে আকাশ বায়ু অগ্নি জল মহী এই মহাভূত আশ্রয়রূপে স্থিত, সেইরূপ আমি মন প্রাণ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের কারণ এই সকলের আশ্রয়রূপে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছি। আত্মমায়া কার্য্য ভূতইন্দ্রিয়গুণরূপে আত্মাতে আত্মদ্বারা আত্মাকে জগদ্রূপে সৃজন করি, পালন করি ও লয় করি। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, শুদ্ধ, ত্রিগুণকার্য্য হইতে ব্যতিরিক্ত, গুণে অন্বিত নহেন। যদিচ আত্মা সুষুপ্তি স্বপ্ন জাগরণাদি মায়াবৃত্তি দ্বারা বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপে প্রতীত হন, কিন্তু উপাধিবিয়োগে বিশ্ব তৈজসও প্রাজ্ঞরূপে প্রতীত হন না, কিন্তু তুরীয়রূপে প্রতীত হন। স্বপ্নোত্থিত জাগ্রত ব্যক্তি স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া জানে। সেইরূপ স্বপ্নবৎ শব্দাদি যে মন দ্বারা চিন্তা কর এবং চিন্তা করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হও, সেই মনকে নিয়মন কর।

প্রেমময় ব্যখ্যা এইরূপ—

আমার সঙ্গে তোমাদের বিয়োগ সর্ব্বরূপে নহে, এক কেবল দেহের বিয়োগ। তোমাদের মন বুদ্ধি আমাতে আছে, আমার মন বুদ্ধি তোমাতে আছে। তোমরা সর্ব্বদা প্রেমের সহিত আমাকে চিন্তা করিতেছ, আমিও তোমাদের মন প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় শব্দাদি আশ্রয় করিয়া আছি, যেরূপ করিয়া ভূতগণ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী আশ্রয় করিয়া আছে। তোমাদের মনে, আমার মনপ্রভাবে দেহ-ইন্দ্রিয়-সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির সহিত আমার রূপ আবির্ভাব করি, অন্তর্দ্ধান হই ও সংভোগলীলার্থ মুহূর্ত্তের জন্য পালন করি। আমি তোমাদিগকে বিস্মৃত হই নাই, অন্য কাহারও সঙ্গ করি নাই। তোমাদের বিয়োগে আমি খিন্ন। তোমাদের সৌন্দর্য্য সুষুপ্তিকালে সামান্যভাবে, স্বপ্নে বিশেষভাবে, জাগ্রতে নানামাধুর্য্যময়রূপে সাক্ষাৎ অনুভব করি। মূর্চ্ছার অবসানে তোমরা প্রবুদ্ধ হইয়া সত্য আমার দর্শনস্পর্শন যে মন দ্বারা স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিয়া চিন্তা কর, সেই মনকে তিরস্কার কর। যেহেতু বিনিদ্র হইলে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রত্যক্ষ পাইয়া থাক—অনুরাগান্ধ তোমাদের সহিত আমার সত্য সংযোগ মিথ্যা বলিয়া মনে কর, সেজন্য এই সন্দেশ প্রেরণ।

যেরূপ মন নিরোধ হইলে সংসার তরণ হয়, সেইরূপ আমার বিরহ তরণ তোমাদের মননিরোধ হইলে হইবে।

মনীষিগণের সাধনকলাপের এই মন নিরোধই অবধি অর্থাৎ পর্য্যাবসান। অষ্টাঙ্গ যোগ, বিবেক, সন্ন্যাস, স্বধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়দমন, সত্য, ইহাদের ফল মননিরোধ অর্থাৎ মার্গভেদ হইলেও ফল এক— যেরূপ বহু নদীর এক সমুদ্রে পর্য্যবসান। যদিচ আমি তোমাদের প্রিয় কিন্তু চক্ষুর দূরে রহিয়াছি, তোমরা আমাকে অনুধ্যান করিবে বলিয়া। সেই ধ্যান দ্বারা মনের সন্নিকর্ষ হইবে। যেরূপ স্ত্রী পুরুষের দূরচর প্রিয়জনে মন আবিষ্ট হইয়া থাকে—সেরূপ নিকটে চক্ষুর সম্মুখে থাকিলে হয় না। অতএব আমাতে সম্পূর্ণ অশেষ বৃত্তিশূন্য মন স্থির করিয়া আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া অচিরে আমাকে পাইবে।

গোপীরা বলিল—

কিমস্মাভির্বনৌকোভিরন্যাভির্বা মহাত্মনঃ।
শ্রীপতেরাপ্তকামস্য ক্রিয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ॥
পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া॥
ক উৎসহেত সংত্যক্তুমুত্তমঃশ্লোকসংবিদং।
অনিচ্ছতোঽপি যস্য শ্রীরঙ্গান্ন চ্যবতে ক্বচিৎ॥
সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে।
সঙ্কর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো॥
পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত।
শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্বিস্মর্ত্তুং নৈব শক্নুমঃ॥
গত্যা ললিতয়োদারহাসলীলাবলোকনৈঃ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তদ্বিস্মরামহে॥
হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন।
মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবে॥

মহাত্মা শ্রীপতি আপ্তকাম পুরুষ। বনবাসিনী আমাদিগে তাঁর কি

প্রয়োজন? অথবা অন্য কামিনীতেই বা তাঁর কি প্রয়োজন? স্বৈরিণী পিঙ্গলা বলিয়াছিল, নৈরাশ্যই পরম সুখ। আমরা তাহা জানি। তথাপি শ্রীকৃষ্ণে আমাদের দুরত্যয়া আশা। উত্তমঃশ্লোকের একান্ত বার্ত্তা কোন প্রাণী ত্যাগ করিতে পারে? তাঁর ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁর উরুস্থল হইতে কমলশ্রী বিচলিত হন না। হে প্রভো! রামকৃষ্ণ-সেবিত সেই সরিৎ, শৈল, বনোদ্দেশ গাভী, বেণুরব, শ্রীর নিকেতনস্বরূপ আর তাঁর পদাঙ্ক তাঁকে মুহুর্মুহু আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অতএব তাঁকে বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। তাঁর ললিত গতি, উদারহাস, লীলাবলোকন, ও মধুর বচনে আমাদের হৃদয় হরণ করিয়াছে। কিরূপে বিস্মৃত হইব? হে নাথ, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ, হে আর্ত্তিনাশন, এই গোকুল দুঃখসমুদ্রে মগ্ন, ইহাকে উদ্ধার কর।

গোপীরা প্রিয় সন্দেশ পাইয়া বিরহজ্বর ত্যাগ করিল উদ্ধবকে আত্মা ও অধোক্ষজ জানিয়া পূজা করিল। উদ্ধবও কয়েক মাস গোপীদের সহিত বাস করিলেন। উদ্ধবের সঙ্গে কৃষ্ণবার্ত্তায় সে কয় মাস ক্ষণপ্রায় বোধ হইয়াছিল।

গোপীদের ব্যাকুলতা দেখিয়া উদ্ধব বলিয়াছেন—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এবম নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।

বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়োঃ বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥

ক্কেমা স্ত্রিয়ো বনচরী ব্যভিচারদুষ্টাঃ কৃষ্ণে ক্বচৈষ পরমাত্মনি রূঢ়
ভাবঃ।

নন্বীশ্বরো স্নু ভজতো বিদুষোঽপি সাক্ষাৎ শ্রেয়স্তনোত্য-
গদরাজ ইবোপযুক্তঃ॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধ রুচাং
কুতোঽন্যাঃ।

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজ-
সুন্দরীণাং॥

আসাম্ অহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মল-
তৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভি-
র্বিমৃগ্যাম্॥
যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈর্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি
রাসগোষ্ঠ্যাম্।
কৃষ্ণস্য তদ্ ভগবতঃ প্রপদারবিন্দং ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য
তাপম্॥
বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ যসাং হরিকথোদ্গীতং
পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥

এই গোপীরা দেহধারীর মধ্যে ধন্য, কারণ নিখিলাত্মা গোবিন্দে তাঁহাদের প্রেম হইয়াছে। এই অনুরাগ সংসারভীরু মুনিরাও বাঞ্ছা করেন। আর ভক্ত আমরাও ইচ্ছা করি। ভক্তিই মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য। ভগবানের কথাতে যাদের অনুরাগ হয়, তাদের চতুর্মুখ জন্মেও কোন আতিশয্য হয় না। বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। এই বনচরী ব্যভিচারদুষ্টা গোপী কোথায়? আর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চল স্নেহ কোথায়? ঔষধিশ্রেষ্ঠ অমৃত উপভুক্ত হইলে যে তার প্রভাব জানে না, তাকেও শ্রেয়োফল দান করে। সেইরূপ এই গোপীরা জানে না যে কার সঙ্গ করিয়াছে, কিন্তু তাদের ফল ফলিয়াছে। রাসক্রীড়াতে ব্রজবল্লভীদের ভুজদণ্ড দ্বারা আলিঙ্গনরূপ প্রসাদ যেরূপ আবির্ভূত হইয়াছিল সেরূপ প্রসাদ নলিনগন্ধকান্তি স্বর্গাঙ্গনারা পায় নাই। এমন কি বক্ষস্থিত একান্তরতি লক্ষ্মীর ভাগ্যে এ প্রসাদ লাভ হয় নাই। যে শ্রীপদ লক্ষ্মী পূজা করেন ও আপ্তকাম পুরুষগণ, চতুর্মুখ, ও সিদ্ধ যোগেশ্বরগণ মনে মনে যে পদ চিন্তা করেন সেই চরণারবিন্দ রাসক্রীড়াতে স্তনে ন্যস্ত করিয়া ইহারা আলিঙ্গন দ্বারা কামসন্তাপ ত্যাগ করিয়াছিল। অর্থাৎ ভগবদালিঙ্গনে তাদের কাম নিঃশেষে নাশ হইয়াছিল। উদ্ধব গোপীদের প্রণাম করিলেন। অহো! এই গোপীদের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনস্থ গুল্মলতৌষধির

মধ্যেও আমি যেন একটা কিছু হই। এই গোপীরা দুস্ত্যজ পতিপুত্র ও ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অতিদুর্ল্লভ মুকুন্দপদবী আশ্রয় করিয়াছে। [উদ্ধব গোপী হইবার প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু গোপীদের পদরজসেবী গুল্মলতৌষধি হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন] যাদের হরিকথাচরিত ত্রিলোক পবিত্র করিতেছে, সেই নন্দব্রজস্ত্রীগণের পাদরেণু আমি বারংবার বন্দনা করি।

গোপগণও প্রার্থনা করিলেন—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু ॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া ॥
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতি র্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥
আমাদের মনোবৃত্তি কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয় হউক।
আমাদের বাক্ তাঁর নামাভিধায়িনী হউক।
আমাদের কায় তাঁর নমস্কার করুক।

মঙ্গলাচরিত ও দান দ্বারা, বা পুণ্য পাপ কর্ম্ম দ্বারা, ঈশ্বরেচ্ছায়, যে কোন জন্ম হউক, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যেন আমাদের অনুরাগ হয়।

ভারতীয় শিক্ষা।

শ্রীবুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম্ম।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

You must not imagine that there was ever a religion in India called Buddhism, with temples and priests of its own order! Nothing of the sort. It was always within Hinduism—Only at one time the

influence of Buddha was paramount and this made the nation monastic.

—Vivekananda.

সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম-মহাসমুদ্র-মন্থনোদ্ভব নির্ব্বাণামৃত কলসহস্ত ধন্বন্তরি শ্রীবুদ্ধদেবের রহস্যময় জন্মগ্রহণ বৃত্তান্ত আমরা সকলেই জানি—যাহা প্রায় সকল অবতারেই ঘটিয়াছে। একটী নক্ষত্র হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি রত্ন-প্রস্থ নারী মায়ার অঙ্গে প্রবেশ করে এবং তাহাতেই তিনি রত্ন গর্ভ ধারণ করেন। তাহারই ফল জগতে এই অতুল মণি শ্রীবুদ্ধ। রাজপুত্র সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে এই ভয়ে পিতা শুদ্ধোধন স্বর্ণ পিঞ্জরে পোষা পাখীবন্যায় তাঁহাকে প্রমোদ কাননে রাজধানী কপিল'-বস্তুতে রাখিয়া দিলেন।—কিন্তু ব্যাধি, জরা, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী পরে নর্ত্তকীর বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁর চটক ভাঙ্গিল—শব দেখিয়া সিদ্ধার্থ শিহরিয়া জীবের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিলেন। এবং সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

ইহাই কি সকলের পরিণাম ?

হাঁ, প্রভু।

কেন আমার বিম্বাধরা রমণীদের—তাহাদের কোমল অঙ্গও কি জরায় লোল হইবে ?

তাহাদেরও ! সিদ্ধার্থ পুনরায় চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

আমার দেহেরও কি ঐ পরিণাম।

হাঁ প্রভু, আপনারও ! যাহাদের জন্ম আছে তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। রাজপুত্র শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু সে নিস্তব্ধতার অন্তরে সমগ্র সাগর-ব্যাপী প্রবল তরঙ্গের একত্র সমাবেশ হইল। চন্নকে কহিলেন—রথ ফিরাও, বুঝিয়াছি, সন্ন্যাসই জীবের একমাত্র আশ্রয়।

এদিকে জীবের মুক্তি চিন্তা করিয়া অন্তরীক্ষে দেবতারা আনন্দধ্বনি করিলেন। লীলাময়ের জগৎরঙ্গমঞ্চের একটী পট পরিবর্ত্তন হইল। নবজাত-শিশু-ক্রোড়ে নিদ্রিতা গোপা ও অতুল

মহিমান্বিত রাজপদ সমস্তই তুচ্ছ করিয়া জগদ্গুরু জীবের মুক্তির উপায় আবিষ্কারে জন্য বাহির হইলেন। নানাদেশ বিদেশ ঘুরিলেন, নানা তন্ত্র মন্ত্র বেদ বেদান্ত দেখিলেন কোথাও শান্তি পাইলেন না। অবরুদ্ধ সিংহের ন্যায় মুক্তির পথের সন্ধান না পাইয়া উন্মাদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পরে নানা সঙ্কল্প বিকল্পের মধ্যে তাঁহার এক দৃঢ় সঙ্কল্প আসিল। "ইহাসনে মে শুষ্যতু শরীরম্ ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু। অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্প দুর্লভাম্ নৈবাসনাৎ কায়ঃ সমুচ্চলিষ্যতে॥" যুগ, যুগ প্রবাহী সংস্কার তরঙ্গিণীকে যেন তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে ভীম বিক্রমে তাহার নিজ জন্মস্থানে পুনরায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। হইলও তাহাই। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন—মারের চাতুরী খাটিল না। সকল জড় জীব প্রাণী আনন্দে জয়ধ্বনি করিল সেইদিন হইতে তাহারা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিরহ এই পঞ্চ মহাদুঃখের কবল হইতে রক্ষা পাইল।

দান করিবে, সত্য কথা বলিবে, হিংসা করিবে না, সৎ কর্ম্মের ফল সুখ, অসৎ কর্ম্মের ফল দুঃখ, সমস্ত বাসনা ত্যাগ না করিতে পারিলে মুক্তি লাভ হয় না—এ সকল কথাত ভারতবর্ষে নূতন নহে—তবে শ্রীবুদ্ধ ভারতে এবং জগতে কি নূতন দান করিলেন?—তাঁহার প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান নির্ভীকতা। যে মুহূর্ত্তে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেছ দেবদত্ত ও চিঞ্চার ন্যায় ধূর্ত্তের শত চাতুরীসত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ তাহা উচ্চৈস্বরে সকলের নিকট বল ও দৃঢ়তার সহিত উহা সম্পাদন কর। সংসার যদি মিথ্যা বুঝ এই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ কর। বেদ, হাঁ মানিব, যদি আমার বিবেক-বৈরাগ্য প্রসূত অপরোক্ষানুভূতির সহিত মিলে।—দেখিতে পাই, জগতে যদি এমন কোনও লোক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, যিনি কখনও জ্ঞানতঃ ভাবের ঘরে চুরি করেন নাই, তাহা হইলে তিনি আমাদের বুদ্ধ। তাঁহার দ্বিতীয় দান সঙ্ঘ। আশ্রম ভারতবর্ষে অনেক কাল ধরিয়াই ছিল কিন্তু এ ধর্ম্মসঙ্ঘ অতি অদ্ভুত। যখন জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন তখন এই সঙ্ঘ-সন্তানেরা, পৃথিবীর

একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রীবুদ্ধের আলোক-বাণী বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় দান, চিত্ত-শুদ্ধির জন্য সেবা—ইঁহারা যাগযজ্ঞ করিতেন না, ঔষধ-পথ্য, বিদ্যা ও ধর্ম্মদানের দ্বারা জীবের কল্যাণ সাধন করিতেন। এই সকল কর্ম্মকে চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপাদানরূপে তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন; চিত্তশুদ্ধির জন্য সোমরস, সহধর্ম্মিণী পশুবধ প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন বোধ করিতেন না। শ্রীবুদ্ধের পঞ্চম দান উপনিষদ্। যে শাস্ত্র এতদিন অরণ্যের মধ্যে দুই চারি জন মাত্র ভোগ করিতেন ও লুক্কাইত রাখিয়াছিলেন, তাহাই তিনি নিজ অধ্যবসায় বলে উদ্ধার করিয়া জগৎ সমক্ষ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম জগৎকে দেখাইয়াছেন যে সত্যের উপর, ধর্ম্মের উপর এবং শাস্ত্রের উপর সকলেরই সমান অধিকার। যাহা সত্য স্বরূপ তাহার নিকট 'জাতি কুলের ভরম্' নাই। তাঁহার ষষ্ঠ দান স্ত্রীলোকের মুক্তি—তাহাদিগকে সন্ন্যাসের অধিকারী তিনিই জগতে প্রথম করেন এবং উহা হইতে স্ত্রীসঙ্ঘের উৎপত্তি হয় এবং যাহার পরম পবিত্র ফল—সঙ্ঘমিত্রা।

উপনিষদ্ কথাটী শুনিয়া অস্মদ্দেশীয় কোনও কোনও শ্রেণীর শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা হয় ত বলিয়া বসিবেন, এ কিরূপ হইল! সৌগত ধর্ম্ম ত নিরীশ্বরবাদ পাষণ্ড ধর্ম্ম। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রে ইহার মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীনারায়ণ ত অসুরদিগকে ভুলাইবার জন্য এই নাস্তিক-বাদ প্রচার করিয়াছেন। একথা ত স্পষ্ট করিয়া ভাগবতে অছে।'—আবার অপরদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন, "উৎপত্তির দিক হইতে তথাকথিত ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বত্ব স্বামিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক উচ্চ জন্ম ও উচ্চ পদের অভিভবকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবের যে সাধারণ ব্যক্তিত্ব বুদ্ধি মাথা তুলিয়া দাড়ায় সেই সকল অতি মহৎ ও সর্ব্বথা সম্পূর্ণ প্রতি-ক্রিয়াগুলির মধ্যে এই বৌদ্ধধর্ম্ম অন্যতম। ইহা এমন একজন লোকের ধর্ম্ম, যিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ পুরোহিত-দিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে ও স্বীয় সরল ও নীতিগত

শিক্ষা প্রভাবে ভারতীয় জন সঙ্ঘকে তাহাদের অতীত হইতে সম্পূর্ণ-রূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"*

"বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম্মমতের ভারতীয় দর্শন, সিন্ধু ও গঙ্গাতীরোদ্ভূত আর্য্যেতিহাস হইতে,সহস্র বৎসর অনুশীলিত ভাবগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন। সমগ্র সনাতন ধর্ম্ম ও তৎসহ তদানীন্তন সমাজভিত্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া একমাত্র তাঁহারই কথার উপর ইহা গড়িয়া উঠিল, যিনি ঘোষণা করিলেন যে নিজ শক্তিবলেই তিনি সত্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহা সকলেরই অধিগম্য। এই মতবাদ যেরূপে উত্তরোত্তর বিশালভাবে বহুলোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইতিহাসে সে ঘটনা অতুলনীয়।"†

"পৌরোহিত্যোন্মোথিত বর্ণবিভাগবিধ্বস্ত জাতির পরিত্রাতা, সাহসী সংস্কারক এবং নূতন চিন্তার প্রবর্ত্তক হইয়া যিনি অপরের বহু-কালের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অভাবটীকে পুরুষকার সহায়ে পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার দাবী ঘোষণা করিয়া যাজককুলের দুঃসহ অসাধারণ প্রতিপত্তি ও সকল জাতিগত উচ্চাধি-কারের প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হইবেন এতাদৃশ একজন লোকের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল।" ‡

কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? বৌদ্ধধর্ম্ম যে আমাদের ঘরের কথা। এই ত্রিপিটকীয় ধর্ম্ম যে বহু পূর্ব্ব হইতে বেদেই নিহিত ছিল তাহা বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্ম § নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। উপযুক্ত স্থান বোধে তাহার পুনরাবৃত্তি করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেছি। যাহা হউক বিষয়টী বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার জন্য 'পিয়দশী' অশোকের দ্বাদশ গির্ণার অনুশাসন উদ্ধৃত করিব,—

"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সকল সম্প্রদায়ের কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ

---

* Weber.

† Max Duncker.

‡ Prof. Monier Williams.

§ 'উদ্বোধন'—অগ্রহায়ণ, ১০২৪

সকলকেই দান ও বিবিধ সম্মান সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ দান বা পূজা ব্যতীত অন্য দান বা পূজাকে দেবপ্রিয় উৎকৃষ্ট মনে করেন না—যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সার বৃদ্ধি হয়। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই সার বৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের। কিন্তু তাহার মূলে বাক্য সংযম—কিরূপ? সধর্ম্মীর সম্মান ও পরধর্ম্মীর নিন্দা সামান্য বিষয়ে যেন আদৌ না হয় এবং বিষয় বিশেষে যেন অতি অল্পই হয়। কোনও কোনও কারণে পরধর্ম্মীদিগেরও পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা সধর্ম্মীদিগের সমুন্নতি হয় ও পরধর্ম্মীদিগের উপকার হয়; এরূপ না করিলে স্বধর্ম্মীদিগের ক্ষতি হয় ও পরধর্ম্মীদিগের অপকার হয়। যদি কেহ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ বা স্বধর্ম্মীদিগের গৌরববর্দ্ধনার্থ সধর্ম্মীদিগের পূজা ও পরধর্ম্মীদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স্বসম্প্রদায়ের হানি করে। সুতরাং সমবায়ই ভাল।—কিরূপ? সকলে পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক। দেবপ্রিয় এইরূপ ইচ্ছা করেন।—কিরূপ? সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীরাই বহু অধ্যয়ন সম্পন্ন এবং কল্যাণকর নীতিযুক্ত হউক। যাহারা যে যে ধর্ম্মে অনুরক্ত তাহাদিগকে বলা উচিত যে দেবপ্রিয়ের সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের সার বৃদ্ধি-যেরূপ আদরণীয়,—দান বা পূজা সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত নানাবিধ মহামাত্র্য বচভূমিকেরা ও অন্যান্য অনেক রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যাপৃত আছেন। উহার ফল তত্তদ্ সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ধর্ম্মের বিকাশ।” আবার দেখা যায় হিন্দুর যেমন গীতা, বৌদ্ধদের তেমনি “ধম্মপদ” এই ধর্ম্মপদের আদর্শভাগের নাম “ব্রাহ্মণ বগ্‌গো”। তাহা ছাড়াও সম্রাট্ অশোকের অন্যান্য অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় “ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের প্রতিসদ্ব্যবহার”, “ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের দর্শন ও দান” “ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান প্রভৃতি কার্য্যকে সাধুকার্য্য বলে”। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে তৎকালীন বৌদ্ধধর্ম্ম, ইদানীং যেমন হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে নানা সম্প্রদায়সত্ত্বেও তাহারা সকলেই হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্যও প্রচলিত

আছে, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মের একটী প্রবল সম্প্রদায় মাত্র ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে বিশাখাদির উপাখ্যান পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যায় বৌদ্ধ-যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধে অবাধে বিবাহ হইত ; বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বৌদ্ধ গৃহস্থেরা মানিয়া চলিতেন ; তাহাদেরও গৃহদেবতা থাকিত, তাঁহাকে ভোগ রাগাদি দেওয়া হইত ; জাতি বিভাগ মানিয়া সকলে চলিতেন ; স্ত্রীজাতির হীনত্ব-জ্ঞান বৌদ্ধধর্ম্মেও প্রবল মাত্রায় ছিল। ম্যাক্সমূলর সত্যই বলিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্কুরোৎপত্তির স্থান উপনিষদের মধ্যেই আছে। উপনিষদ্ প্রোক্ত ধর্ম্মাভিমতগুলিকে চরম বিকাশের পথে পৌঁছাইয়া দিলে যাহা দাঁড়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম যে শুধু তাহারই সমর্থক তাহা নহে, পরন্তু ইহা সেই জ্ঞানোপলব্ধি সহায়ে একটী নূতন সামাজিক শৃঙ্খলারও বিন্যাস করিয়াছে। মতবাদ হিসাবে বেদান্তের যাহা সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য সেই আত্মোপলব্ধিই বৌদ্ধের সম্যক্ সম্বোধি ছাড়া আর কিছু নহে। আচার অনুষ্ঠানের দিক হইতে সন্ন্যাসী যাহা ভিক্ষুও তাহাই, তবে সে ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থিগণের নীরস আত্ম সংযমন, ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলের নানা কর্ত্তব্য ভার ও ব্রাহ্মণ প্রব্রজিতগণের নানারূপ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সাধনার ভার হইতে উন্মুক্ত। সন্ন্যাসীর উচ্চ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা বৌদ্ধধর্ম্মে সঙ্ঘ অথবা ভ্রাতৃ-মণ্ডলীর সাধারণ সম্পত্তি—সেই মণ্ডলীর দ্বারা তরুণ কিম্বা বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ কিম্বা শূদ্র, ধনী কিম্বা দরিদ্র, জ্ঞানী অথবা মূর্খ সকলেরই নিকট উন্মুক্ত। বস্তুতঃ বৈদিক ভারত ও ত্রিপিটকীয় ভারত সম্পর্ক-শূন্য নহে—উভয়ের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক ক্রমপরম্পরা বর্ত্তমান এবং আপাত দৃষ্টিতে তীব্র বিরোধ সমন্বিত যে সকল চূড়ান্ত রকমের পার্থক্য আমরা দেখিতে পাই তাহাদের মীমাংসা উপনিষদের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

দর্শন ও ধর্ম্ম মূলতঃ একই ভিত্তির উপর স্থাপিত। দর্শনের কার্য্য স্বধর্ম্মকে বিচারের দ্বারা স্থাপিত করা। সময় সময় এই দর্শনশাস্ত্র বিদেশের এবং অপর ধর্ম্মের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করে। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনে অপর কোনও বিজাতীয়

চিন্তার ছাপ পড়ে নাই। কাজেকাজেই যদি আমরা প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূল তত্বগুলির সহিত প্রাচীনতর বৈদিক ধর্ম্মের তুলনা করি তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বৈদিক ধর্ম্মের মহান্ তত্ব-গঙ্গোত্রী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মরূপ আর একটী নব ধারার উৎপত্তি হইয়াছে মাত্র। সে ধারা স্বদেশের সরসতা সম্পাদন করিয়া, নিজ সঙ্কীর্ণ জাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র জগতের অনুর্ব্বর ভূমি সিক্ত করিয়াছে। পঞ্চ দুঃখ, কর্ম্মবাদ, শূন্যবাদ প্রভৃতি অমূল্য মণি বৈদিক ধর্ম্মের খনিতে বহুদিন হইতেই লুক্কায়িত ছিল। শ্রীবুদ্ধ পুনরায় তাহাদের আবিষ্কার করিলেন এবং সর্ব্বলোক সমক্ষে নূতন ভাষায় নূতন ভাবে সেই তত্বের পুনঃপ্রচার করিলেন—যে দেবতা অরণ্যে গুটিকয়েক লোকের উপাস্য ছিলেন তাঁহাকে নগরের মধ্যে সকলের হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ কার্য্য ভারতে নূতন নহে। ভারতের ভগবান্ বহুবার এই দেশকে এই ভাবে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

অনেকেই প্রশ্ন করে যদি বৈদিক ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের এতই সম্বন্ধ তবে উহা এখন এত বিজাতীয় ও এত বিসদৃশ হইয়া পড়িল কেন? ইহার মূল কারণ প্রচারকের অভাব। বৌদ্ধযুগের পর তক্ষশীলা, নলন্দা ও বিক্রমশীলার ন্যায় আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টিও হয় নাই তথা বিক্রমপুরনিবাসী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভিক্ষুর ন্যায় দৃঢ়ব্রত সন্ন্যাসীও জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি সপ্ততীবর্ষ বয়ঃক্রমকালে হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া নব সভ্যতার উদ্বোধন করিবেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই রাজগৃহ নিবাসী ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারের জন্য আর শাঙ্গনবাসুও জন্মগ্রহণ করিলেন না। শ্রীবুদ্ধ ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক সমুদ্রে একটী বিশাল নব তরঙ্গ, শ্রীশঙ্কর আর একটি। প্রথমটি হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি মালা নিঃসৃত হইয়া ভারতের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া জগতে আধ্যাত্মিকতার বন্যা লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অপরটির সময় তাহা হয় নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলী জগতের প্রতি অন্ধকারময় স্থানে শ্রীবুদ্ধদেবের জ্ঞানালোক লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতে যখন

পুনরায় নব তরঙ্গের উত্থান হইল তখন সে তরঙ্গ আর স্বদেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া অপর পারে পৌঁছিল না। শ্রীশঙ্করের প্রচারের পর ভারতবাসী বুঝিল তাহারা ঋজুপথ ত্যাগ করিয়া বক্র পথ অবলম্বন করিয়াছে—উহা বুঝিয়া তাহারা পুনরায় সত্য পথ অবলম্বন করিল। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্মাবলম্বী অপর দেশসমূহে কি হইল? সে আলোক তথায় পৌঁছাইল না—জ্ঞানালোকবহনকারী প্রচারকের অভাবে বিদেশে ভারতীয় ধর্ম্ম নূতন আকার ধারণ করিতে লাগিল, উপরন্তু তত্তৎদেশীয় মনীষীরা নব নব যুক্তি ও তথ্যের আবিষ্কার করিয়া তাহাকে মাতৃভূমি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অন্ধকারে আলোক অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়, তাই বিদেশের বুদ্ধ এত উজ্জ্বল। কিন্তু ভারতবাসী তাঁহাকে অসংখ্য মহাপুরুষের মধ্যে আর একখানি আসন পাতিয়া দিয়াছিল তাহার অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল, নক্ষত্রমালার মধ্যে যেন আর একটী নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবাসী তাঁহাকে পূজা করে—অবতার বলিয়া মানে কিন্তু তাঁহার পথ যে একমাত্র পথ তাহা তাহারা স্বীকার করে না। তাহারা বলে, শ্রীভগবান্ মানবের অবস্থা বুঝিয়া মানবদেহ ধারণ করিয়া একই সত্য নানা ভাবে প্রচার করিতেছেন। ভারতের ভগবান্ মানবের তৎকালীন অবস্থা বুঝিয়া শ্রীবুদ্ধ হইয়া আসিয়া ভারত এবং ভারতের সনাতন ধর্ম্মকেই গরীয়ান করিয়াছিলেন।

এখন একবার বৈদিক ও ত্রিপিটকের মূল তত্ত্বগুলির লইয়া আলোচনা করা যাক্ সাংখ্যকারিকায় দেখিতে পাই –

দুঃখ ত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ॥

এই যে দুঃখত্রয় বা ত্রিতাপ, ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও রূপ এই পঞ্চস্কন্ধ দুঃখরূপ বৈরাগ্যের কারণ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রুতির "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বাক্যই

"অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা।" এই শ্রীবুদ্ধ বাক্য রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকম।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥
নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরোমৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।

"তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহারও স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখনও মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না।"

প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেই সেই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা শ্রীবুদ্ধদেব নিজের ভাষায় তাহার পুনঃপ্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

"গম্ভীর মিতি সুভূতে শূন্যতায়া এতদধিবচনম্।"
"শূন্যতায়া এতদধিবচনং যদপ্রমেয়মিতি।"
"যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়া অপিতে।"
"শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য পশ্য শূন্যং বহির্গতম্।
ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্॥"

বৌদ্ধ ধর্ম্মে "শূন্যম্" "গম্ভীরম্" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মে তাহাই "পূর্ণম্" "সৎ" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত ছিল।

জাতক গ্রন্থের পুনর্জন্মবাদও শ্রুতিতেই বীজাঙ্কুরাকারে, কখনও বা স্পষ্ট ভাবেই আলোচিত হইয়াছে। কঠোপনিষদে নচিকেতা তৃতীয়-বরে বলিতেছেন:—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতিচৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥

"মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে, কেহ বলেন 'আছে' কেহ বলেন 'নাই' আমি তোমার উপদেশে এই বিষয় জানিতে চাহি; আমার বরের মধ্যে এইটী তৃতীয় বর।"

ঈশোপনিষদে আছে—

অসূর্য্যা-নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

"আলোকবিহীন অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাবৃত লোকসমূহ আছে। যাহারা আত্মঘাতী, অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যাবশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে, তাহারা এই দেহান্তে সেই সমুদায় লোকে গমন করে।"

ছান্দোগ্যে,—

ত ইহ ব্যাঘ্র বা সিংহো বা বৃকো বা ববাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদযদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি॥

তাহারা ইহলোকে ব্যাঘ্র কিংবা সিংহ, বৃক কিংবা বরাহ, অথবা কীট বা পতঙ্গ, ডাঁস বা মশক, যাহা যাহা থাকে, পরেও তাহাই হয়।

আচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

যস্মাচ্চ এবমাত্মনঃ সদ্রূপতামজ্ঞাত্বৈব সৎ সম্পদ্যন্তে, অতঃ তে ইহ লোকে সৎকর্ম্মনিমিত্তাং যাং যাং জাতিং প্রতিপন্না আসুঃ—ব্যাঘ্রা-দীনাং—ব্যাঘ্রোঽহং সিংহোঽহমিত্যেবম্ তে তৎ কর্ম্মজ্ঞান বাসনাঙ্কিতাঃ সন্তঃ সৎ প্রবিষ্টা অপি তদ্ভাবেনৈব পুনরাভবন্তি—পুনঃ সত আগত্য ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ যৎ পূর্ব্বমিহ লোকে ভবন্তি সম্বভুবুরিত্যর্থঃ, তদেব পুনরাগতা ভবন্তি। যুগসহস্রকোট্যন্তরিতাপি সংসারিণো জন্তোর্যা পুরা ভাবিতা বাসনা, সা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। যথা প্রজ্ঞং হি সম্ভবা ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ॥

"যেহেতু তাহারা পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়াই সৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতএব, তাহারা ইহলোকে অর্থাৎ সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে যে কর্ম্মানুসারে ব্যাঘ্রাদি যে যে জাতি—আমি ব্যাঘ্র, আমি সিংহ ইত্যাদি প্রকার প্রাপ্ত ছিল তাহারা সেই সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্ম-সংস্কার

সহকারে সৎস্বরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া সেই ভাবেই পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে ; সৎ হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বস্ব কর্ম্মানুসারে পূর্ব্বে এখানে ব্যাঘ্র, অথবা সিংহ, কিংবা বৃষ, অথবা কীট, পতঙ্গ, কিম্বা বরাহ, ডাশ কিম্বা মশক যাহা যাহা ছিল, ফিরিয়া আসিয়াও ঠিক তাহাই হয় ; কারণ 'প্রজ্ঞা বা জ্ঞান সংস্কার অনুসারে জন্ম হয়', এই অপর শ্রুতি হইতে জানা যায় যে সংসারী জীবের পূর্ব্ব সঞ্চিত যে বাসনা (সংস্কার), তাহা সহস্র কোটী যুগ ব্যবধানেও বিনষ্ট হয় না।"

পরে আর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। শ্রীবুদ্ধ যদি হিন্দু সন্ন্যাসীর মতই জীবন কাটাইয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে মাঝে মাঝে তিনি বেদের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন কেন? আমরা বলি ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবীরদিগের ধারাই এইরূপ। ইহা কিছু নূতন কথা নহে। তাঁহারা যে মুহূর্ত্তে যাহা সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছেন তৎক্ষণাৎ তাহা মুক্ত কণ্ঠে সকলের সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। বেদের ক্রিয়াকাণ্ডকে বহুবার এতদ্দেশীয় আস্তিক বা নাস্তিক দার্শনিকেরা আক্রমণ করিয়াছেন।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদকিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমা সমাসতে॥ ৩৯ ১ম।
১৬৪ সূ, ঋক।

"সকল দেবগণ পরম ব্যোমসদৃশ ঋকের অক্ষরে উপবেশন করিয়াছেন। এ কথা যে না জানে ঋক্‌দ্বারা সে কি করিবে? একথা যাহারা জানে, তাঁহারা সুখে অবস্থান করে।"

পুনশ্চ মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

তস্মৈ সহোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরাচৈবপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো— ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি॥ অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

চার্ব্বাক্ দর্শনে আছে—

অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও দেখা যায়—

নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌত জাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকাইব ॥

যাহা হউক সংক্ষেপে এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া ইহাই অনুমতি হয় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দুজাতির নিজস্ব যিশু খৃষ্টকে তাঁহার স্বদেশবাসীরা বুঝিতে পারে নাই পরন্তু তাঁহার ভিন্নদেশীয় শিষ্যেরাই তাঁহার ধর্ম্মের যথার্থ অনুশীলন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীবুদ্ধের শুদ্ধ-বেদান্ত ধর্ম্ম লইয়া সেরূপ হয় নাই। ইহার ফল পৃথক হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহার স্বদেশবাসীরা ঠিক ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মভিত্তিহীন ভিন্নদেশীয় ভারত-শিষ্যেরা সংযোগস্থাপনকারী প্রচারকের অভাবে এবং ধর্ম্মকে তাহার মূল খাতে প্রবাহিত করিবার শক্তিসম্পন্ন ঋষিগণের অভাব প্রভৃতি নানা কারণ বশতঃ যথাযৎ অনুশীলন না করিতে পারিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম হইতে একটি পৃথক ও বিসদৃশ ধর্ম্মে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। চীন জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধান দেশসমূহের বর্ত্তমান যুগে নবাদর্শে জাতীয় জীবন গঠন করিবার চেষ্টা উহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। শ্রীশঙ্কর নামমাত্রাবলম্বী নাস্তিক ব্যাভিচার-দুষ্ট বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে ভারত বহিস্কৃত করিয়াছিলেন। ধীর ও শান্তচিত্তে অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীবুদ্ধদেবের মধ্যে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে মত বিরোধ থাকিলেও বুদ্ধদেবের যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম তাহাই শ্রীশঙ্কর নিজ ভাষ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মাধ্যমিক, বৈভাষিক, প্রভৃতি নাস্তিক দর্শন যাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্য খণ্ডন করিয়াছেন তাহা

শ্রীবুদ্ধের মত নয় উহা তাঁহার অনুবর্তী শিষ্যেদের মস্তিষ্ক প্রসূত। এবং সেই জন্য অস্মদেশীয় কোনও কোনও পরমভাগবত শঙ্কর দর্শনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন।

এখন কিন্তু বাদ-বিসম্বাদের রজনী গতপ্রায়া। সমন্বয়ের মহা-সূর্য্য উদিত হইতেছে 'যতমত ততপথ'রূপ তীব্র জ্ঞানালোকে সকল ধর্ম্মের মধ্যে এক রাসায়নিক সম্মিলন উপস্থিত। হে পাঠক! আসুন আমরা সকলে শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতি যুগাবতারদিগের শ্রীচরণে ভক্তিনম্র হৃদয়ে প্রণত হই।

(ক্রমশঃ)

সিষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়।

আবেদন।

যাঁহারা ভারতের প্রকৃত উন্নতিকামী তাঁহারাই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কিরূপ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। সেই জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণরূপ অনুষ্ঠানটীর সুসিদ্ধির নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। সহৃদয় স্বদেশবাসীর নিকট পুনঃ পুনঃ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এ পর্য্যন্ত যথাযৎ উত্তর না পাইলেও আমরা আশা করি তাঁহারা এই বিদ্যালয়বাটীর জন্য উপযুক্তরূপ সাহায্য করিয়া প্রকারান্তরে দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

বিবেকানন্দ পুরস্ত্রীশিক্ষালয় ও নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণার্থ আমরা নিম্নলিখিত দান স্বীকার করিতেছি।

প্রাপ্তিস্বীকার।

ব্রহ্মচারী গনেন্দ্রনাথ	৪৭৲	„ রায় রমাপতি মিত্র	কাঁথি	৫৲
জনৈক বন্ধু	১০০৲	„ গিরিশ চন্দ্র ঘোষ	„	৫৲
স্যার জষ্টীস্ আশুতোষ চৌধুরী	৫০৲	„ ঈশ্বর চন্দ্র দিনদা	„	৫৲
মিনার্ভা, বোম্বাই ২য় কিস্তী	২০৲	„ শিবপ্রসাদ জানা	„	৪৲
শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী		মাঃ শ্রীনাথ সাউ		৩৲
লেবটেনেণ্ট সৌরীন্দ্রমোহন পাঠকের		জনৈক বন্ধু মাঃ স্বামী পূর্ণানন্দ		১॥০
মাতার স্মরণার্থ ২য় দফে	২৫৲	„ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় „		২৲
শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র প্রামাণিক বোম্বাই	৫০৲	„ বসন্তকুমার দত্ত	„	১॥০
শ্রীবি. সি, মিত্র „	২০৲	„ শ্রীধর মান্না	„	১৲
শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী শিলং	১৲	„ শ্রীনাথ সাউ	„	১৲
„ জনৈক বন্ধু মাঃ সুরেন্দ্রনাথ সামন্ত		„ নবকুমার বেরা	„	১৲
কাঁথি	২৫৲	„ চন্দ্রমোহন মাইতী	„	১৲
„ কাঙ্গালীচরণ গিরি „	১৲	„ কুমুদবন্ধু পাণ্ডা	„	১৲
„ বিশ্বনাথ দাস „	১৲	„ মুনীন্দ্র নাথ মণ্ডল	„	২৲
„ যতীন্দ্র নাথ বসু „	১৲	রায়, এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্সর		
„ উপেন্দ্র নাথ মজুমদার „	১৲			৩০৲
„ গদাধর মাইতী „	১৲	রায়, নিখিল নাথ রায় বাহাদুর, কাঁথি		৫৲
„ জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা		শ্রীযুক্ত নিলমাধব দেব	ঐ	৫৲
২য় কিস্তি	১০৲	„ দেবেন্দ্র নাথ হাজরা	ঐ	২৲
জনৈক বন্ধু	১৲	„ সুরেন্দ্র নাথ ভৌমিক	„	২৲
শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ কুমার জয়পুর হাট		„ কেনারাম মাঝি	„	২৲
বগুড়া	২৲	„ বিমলকৃষ্ণ বসু	„	২৲
মিস্ বি, ই, বোনাম, নিউজিল্যাণ্ড	১৪৵০	খুচরা আদায় মাঃ ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়		
মোহান্ত যমুনা দাস কাঁথি	১৫৲			২৲
মিঃ এন, সরকার, কলিকাতা	১০৲	„ রামচন্দ্র দাস	„	১৲
শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র নাথ ঘোষ „ ২য় কিস্তি	১০৲	„ উমেশ চন্দ্র বিধা	„	১৲
জনৈক বন্ধু „	১৲	„ সুরেন্দ্রনাথ প্রধান	„	১৲
„ অতুলকৃষ্ণ দে „	৲	„ কৃষ্ণচন্দ্র বেরা	„	১৲
শ্রীমতী সুহাসিনী গুহ রাণীঘাট	২৲	„ শুধীর চন্দ্র মান্না	„	১৲
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় সবজজ		„ নরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তি	সিলেট	৩
সিলেট	৫৲	„ গৌরীকান্ত বিশ্বাস	পুণা	২৲

„ নন্দলাল বসু কলিকাতা ২০৲
সেক্রেটারী ডিবেটিং ক্লাব, হিন্দুহোষ্টেল কলিকাতা ১০৲
ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ কলিকাতা ৪৲
শ্রীযুক্ত যদুপতি চট্টোপাধ্যায় শিলিগুড়ি ২৫৲
„ রমেশ চন্দ্র দত্ত সাকচি ২৲
„ পি, এন, দপমা আমেদনগর ১৲
„ এ, আর কুমার গুপ্ত, বেঙ্গালোর ৪৲
„ জিতেন্দ্র মোহন চৌধুরী রাঁচি ২৲
"দত্ত" ১০০৲
"কনকাঞ্জলী" ৪৲
জনৈক মহিলা ৫
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত বরিশাল ৪৲
শ্রীমতী নিরুপমা দেবী কলিকাতা ৫
"রামচন্দ্র" ৫৲
শ্রীনলিনী নাথ মল্লিক কলিকাতা ৬৲
জনৈক বন্ধু মাঃ শ্রীঅঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় নলহাটি ১০
শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন রায় ভবানীপুর ৫০
"বন্ধু" ৩
পি, এন, নটেশ আয়ার জলগাঁও ১৬৲
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ঘোষ রাঁচি ১৲
মিঃ ডিমেলো মেওয়ালে ৫০৲
সার বিনদ চন্দ্র মিত্র ২৫৲
স্বর্গীয় কাননবালা মিত্রের স্মরণার্থ ১০৲
প্রমথলাল বোস ১৲
ডাঃ অঘোর নাথ ঘোষ কাটিহার ১০৲
শ্রীরাধানাথ সিংহ, পেগু ৫
শ্রীযুক্ত হরিচরণ দে পাঞ্জাব ৫৲
„ নরেন্দ্র ভূষণ দত্ত চাটগাঁ ৫৲
মাঃ নলিনীমোহন গোস্বামী বালী ১৮৶০
৮ম প-টনের সিপাহিগণ বোম্বাই ২০৲
ষষ্টি চন্দ্র দত্ত, স্যাণ্ডওয়ে, বর্ম্মা ২
শ্রীযুক্ত এন সরকার, ভান্ডাড়া হুগলী ২৲
শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী কলিকাতা ৪৲
শ্রীমতী শিবরাণী দাসী ৫০৲
কে, এস, আয়ার বর্ণিও ১৩।৵০
শ্রীমতী সরোজবাসিনী সেনগুপ্তা সন্দিপ ২৲
'শ্রীমতী" ১৲

বস্ত্রসঙ্কট।

বস্ত্র মহার্ঘ্য হওয়ায় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যে কিরূপ কষ্ট হইতেছে, সকলেই বিশেষ অবগত আছেন। যাঁহারা স্বভাবতঃই কষ্টে সৃষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, সেই দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর আবার এই কষ্ট প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন লোকের এই অসহায় অবস্থায় কিরূপে সেবাকার্য্যে অগ্রসর হইবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় হুকুমচাঁদ বিশ্বরাজ নামক জনৈক সহৃদয় মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আসিয়া মিশনের হস্তে উক্ত কার্য্যের জন্য ১৭০ জোড়া বস্ত্র দেওয়ায় মিশন উক্ত কার্য্যে

অগ্রসর হইতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন। মিশন কার্য্যপ্রণালী এই স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে উহার যে শাখাসমূহ আছে, তাহাতে ভাগাভাগি করিয়া ঐ বস্ত্র প্রেরিত হইবে; তাঁহারা দরিদ্র এবং যথার্থ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিয়া বস্ত্র বিতরণ করিবেন। মিশনের সাক্ষাৎ অঙ্গভুক্ত শাখাসমূহ ব্যতীত বঙ্গদেশে এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি আছে যাহাদিগের সহিত মিশন অল্প বিস্তর পরিচিত। এই সকল সমিতির সাহায্য গ্রহণ করিতেও আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি। উপস্থিত আমরা এইরূপভাবে ১৭টী বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্র স্থির করিয়াছি। কিন্তু একবার কার্য্য আরম্ভ হইলে ঐ ১৭০ জোড়া কাপড় সমুদ্রে শিশিরপাতের ন্যায় হইবে। এই কারণে আমরা সহৃদয় ধনী মহোদয়গণের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আরও এই স্থান হইতে নিয়মিতভাবে এতগুলি স্থানে বস্ত্র পাঠাইতে গেলে তাহার প্রেরণব্যয়, অনেক। তাহার জন্য অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং আমরা নূতন ও পুরাতন বস্ত্র এবং অর্থ—এই উভয়ই সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আমরা এক্ষণে উক্ত ১৭টী কেন্দ্রের অধ্যক্ষগণের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছি—উহাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা এই বস্ত্র বিতরণের ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইবেন, পরে তাঁহাদের ঠিকানা প্রভৃতি প্রকাশ করিব—যাহাতে যাঁহার যেখানে সুবিধা সেইখানেই অর্থ বা বস্ত্র পাঠাইতে পারেন। বর্ত্তমানে কেবল নিম্নলিখিত দুইটী ঠিকানায় সাহায্য গৃহীত হইবে।

(১) উদ্বোধনকার্য্যালয়, ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।

(২) প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় পোঃ, হাওড়া।

সারদানন্দ
সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।

স্বামী প্রেমানন্দ

মহাসমাধি।

বিগত ১৪ই শ্রাবণ, সন ১৩২৫—মঙ্গলবার বেলা ৪টা ১৪মিনিটের সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম পরিচালক, সন্ন্যাসিকুলতিলক মহাপ্রাণ মহাত্যাগী আদর্শ-পুরুষপ্রবর স্বামী প্রেমানন্দ মহাসমাধিতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মৈকাদর্শ আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সঞ্জীবনীশক্তির মূর্ত্তিমান বিগ্রহ-স্বরূপ এতাদৃশ মহাপুরুষগণের কাহারও তিরোধানের সংবাদ শ্রবণ করা অতি দুঃখের—আরও দুঃখের সেই সংবাদ লিপিবদ্ধ করা।

কিন্তু এই শোক-বাসরে অশ্রুধারা ভক্তির ত্রিধারায় পরিণত হইয়া আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হউক, এখন ইহাই একমাত্র আমাদের প্রার্থনা, একমাত্র সান্ত্বনা।

যাঁহারা এই মহাপুরুষের সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার স্নেহ ভালবাসা এবং মঙ্গলাশীষ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অভাব কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।

তাঁহাদের এই অভাব, তাঁহাদের এই চিত্তের শূন্যতা স্মৃতির তীব্রতায় পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হউক, এবং তাঁহাদের জীবন পূর্ণস্বরূপের দিকে অগ্রসর হউক—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। অভাবের ভিতর দিয়া তাঁহারা তাঁহার অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠুন, এবং তাঁহাদের ভিতর তিনি উজ্জ্বলতর হইয়া বিরাজ করুন, আমরা তাঁহাদের দেখিয়াই যেন তাঁহাকে দেখিতে পাই, এই স্মৃতিবাসরে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

ক্ষুৎক্ষামপীড়িত বাসনা কলঙ্কিত আমাদের নিকট সত্য, সাধুত্ব, পবিত্রতা সাধনার বস্তু। কিন্তু এই মহাপুরুষে সত্য, সাধুত্ব এবং পবিত্রতা মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিত। ঠাকুর একসময়ে ইঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াই বলিয়াছিলেন, “এর (স্বামী প্রেমানন্দের) দেহ মনে কোনরূপ অপবিত্র ভাব পর্য্যন্ত উদয় হইতে পারে না।” যাঁহারা ইঁহার সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন—সত্যই, পবিত্রতা ইঁহার একটি গুণ নহে, ইনি নিজেই পবিত্রতা।

সে স্নেহ এবং ভালবাসা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই পবিত্র নির্ম্মল অতুলন মাতৃস্নেহের স্বাদ অনুভব করিয়াছেন। তিনি যেন রামকৃষ্ণ মঠের জননীস্বরূপ ছিলেন। একদিনও যিনি তাঁহার কোনরূপ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহার এই কথাই মনে জাগিয়াছে। তিনি সন্ন্যাসী, তিনি ত্যাগী, তিনি জ্ঞানী, সর্ব্বোপরি তিনি যেন মায়ের মত। এতাদৃশ মহাপুরুষের শিক্ষাদান কঠোরতার ভিতর দিয়া নয়—নিয়মের শৃঙ্খলের ভিতর দিয়া নয়, উহা যেন মাতার বিগলিতস্নেহ স্তন্যধারার আস্বাদনের ভিতর দিয়া। ভগবদ্‌স্নেহ মানুষবুদ্ধিতে ধারণা করা দুরূহ। মনে হয়, সে স্নেহ যেন বিচারের শাসনের দ্বারা নিয়মিত। শাস্ত্রে তিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছেন, কিন্তু খেদের বিষয়—উহা আমাদের নিকট কতকটা কথার কথা। প্রত্যক্ষ কতকটা না দেখিলে উহা বুদ্ধিগম্যই হয় না। ভগবদ্‌প্রাণ, ভগবল্লক্ষণ মহাপুরুষগণে ভগবানের এই স্নেহভাব দেখিলে উহার কতকটা উপলব্ধি হয়। এবং এই আস্বাদন-স্পৃহাই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া ভগবদ্ভাবোদ্দীপক হয়। এতাদৃশ মহাপুরুষসঙ্গ মানুষের চিত্তে ভগবৎ পিপাসা উদ্রিক্ত করিয়া দেয়, এই জন্যই ইঁহারা আমাদের এত আত্মীয়, আমাদের এত কল্যাণকারী।

বৎসর কাল অতীত হইল, স্বামী প্রেমানন্দ পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভ আগমনে দেশবাসীর মধ্যে সত্য সত্যই একটা স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে

যেখানেই গিয়াছেন, তাঁহার ভালবাসায়, তাঁহার সাধুত্বে তত্রস্থ অধিবাসিগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান্ সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপন-জন জ্ঞানে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। নিরক্ষর মুসলমান হিন্দু সন্ন্যাসীর ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াছে, ইহা একটা দেখিবার বিষয় বটে। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, স্বামী প্রেমানন্দ সত্য সত্যই প্রেমানন্দ ছিলেন। 'তস্য প্রীতি তৎ প্রিয় কার্য্য-সাধনঞ্চ'—এই কামনাহীন সন্ন্যাসীর জীবনের একমাত্র উপাসনা এবং একমাত্র কামনা ছিল।

এই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব এবং অলৌকিক জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন আলোচনার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার নিকট অতি পরিচিত। এবং এই পরিচয় কতটা, সে কথা মুখে বলিবার নয়, কেন না সে পরিচয় অন্তরের পরিচয়। আর যিনি সে পরিচয় লাভ করিতে চান, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন কথাই তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত পথ।

এই শোক-বাসরে আমরা এই মহাপুরুষের মহাসমাধির সম্মুখে দাড়াইয়া যে কথা সর্ব্বপ্রথমে সহজে স্বতঃই মনে উদয় হইতেছে, সে কথা পুনরায় আবৃত্তি করিতেছি—

হে মহাপ্রাণ, তুমি আমাদের, তুমি দেশের, তুমি জগতের! তুমি কল্যাণ, তুমি প্রেম, তুমি আনন্দ। তুমি ছিলে—আছ—থাকিবে!

পথের সম্বল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীহরিপ্রসাদ বসু এম এ, বি এল)

৩। আমার গন্তব্য স্থান কোথায় ?

হিন্দুশাস্ত্র এ সম্বন্ধে একবাক্যে বলিয়াছেন যে পরমপিতার পদারবিন্দই আমাদের একমাত্র গন্তব্যস্থান।

"কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥"
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥

জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় অর্থাৎ সর্ব্বোপদ্রবশূন্য পদ প্রাপ্ত হন।

পরে সেই পদ অন্বেষণ করিতে হইবে, যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না. যাঁহা হইতে এই পুরাণী প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে সেই আদ্যপুরুষেরই শরণ লইলাম।

আমি যেখান হইতে আসিয়াছি আমাকে সেইখানেই পৌঁছিতে হইবে. তাহাই আমার goal। অংশকে অংশীতে পৌঁছিতে হইবে, খণ্ডকে অখণ্ডে পৌঁছিতে হইবে, অপূর্ণকে পূর্ণে পৌঁছিতে হইবে, জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে হইবে ; প্রকৃতির সহিত পুরুষের রাসলীলা করিতে হইবে—তবেই জীবনের সার্থকতা হইবে। এই যে জন্মজন্মান্তর নটের বেশ ধরিয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া কত কি অভিনয় করিলাম, কখনও রাজচক্রবর্ত্তী সাজিয়া, কখনও বা পথের ভিখারী হইয়া, কখনও বা নরাকারী দেব হইয়া, কখনও বা মানবদেহধারী পশু হইয়া বিচরণ করিলাম, ইহার শেষ অঙ্ক অভিনয়

হইবে তখনই যখন আমার পরম কারুণিক পিতা আমার পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আমাকে স্থান দিবেন। তখন আর আমার ভয় থাকিবে না—

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥

মহাত্মাগণ আমাকে পাইয়া সকল দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্য জন্ম পান না। যেহেতু তাঁহারা সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঐ শুনুন ভগবানের অভয় বাণী—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

হে পার্থ, যাহারা পাপবংশসম্ভূত অথবা স্ত্রীলোক, বৈশ্য কিম্বা শূদ্র, তাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চয়ই পরমগতি প্রাপ্ত হন। সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণ যে পরম গতি লাভ করিবেন, ইহাতে আর কথা কি? তুমি মচ্চিত্ত মদ্ভক্ত এবং আমার উপাসক হও, আমাকেই নমস্কার কর, মৎপরায়ণ হইয়া এইরূপে মনকে আমাতে সমাহিত করিলেই আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

"মামেবৈষ্যসি" আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—ইহাই চরম পুরুষার্থ। ক্ষুদ্র শিশু পিতার অঙ্ক প্রাপ্ত হইলে, আর তাহার ভাবনা কিসের?

এই চরম অবস্থা সম্বন্ধেও মতভেদ নাই তাহা নহে। জ্ঞানমার্গীরা চান মুক্তি বা মোক্ষ। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপাসকগণের মতে মুক্তি পাঁচ প্রকারের হইতে পারে—সালোক্য—একলোকে বাস; সার্ষ্টি—তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া, সামীপ্য—নিকটে থাকা, সারূপ্য সমান রূপ পাওয়া; সাযুজ্য বা অভিন্ন হইয়া যুক্ত হওয়া।

সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন —

বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে। এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে ॥
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খেয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চজনে মিলে জুলে ॥
সে যে সময় হলে আপনা আপনি যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥

কেবল ভক্তিমার্গীরা মুক্তি বা মোক্ষ চাহেন না। এই মোক্ষ শব্দকে "কৈতবপ্রধান" বলিয়া চরিতামৃতকার বর্ণনা করিয়াছেন—

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতবপ্রধান
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।

এবং ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং—ইত্যাদি।

ভাগবতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ হিংসাদিরহিত সাধুদিগের পরম ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে। পরম ধর্ম্ম কেন? না "প্রোজ্ঝিত কৈতবঃ" অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্ম কেবল ঈশ্বর আরাধন-লক্ষণ ধর্ম্ম মোক্ষাভিসন্ধিশূন্য।

অন্যত্র ভাগবত হইতে তুলিয়াছেন—

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সরূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

অর্থাৎ পঞ্চবিধ মুক্তি আমার ভক্তদিগকে দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতীত কিছুই লইতে চাহেন না। এই আদর্শের বিভিন্নতা লইয়া আমাদের মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজন নাই। আমরা আদার ব্যাপারী—আমাদের জাহাজের খবরে কাজ কি? যদি নিজের আন্তরিক চেষ্টায় ও নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ে আদর্শের নিকট যাইবার

যোগ্য হই তখন যাঁহার উপর ব্রহ্মাণ্ডের ভার তিনিই ঐ আদর্শের গোল চুকাইয়া দিবেন ও যেরূপে আশ্রয় দিলে আমার জন্মজন্মান্তরীণ চেষ্টার সফলতা হইবে তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী ব্রজগোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া "আমিই কৃষ্ণ" এইরূপ বোধ করিয়াছিলেন। পথ বিভিন্ন হইলেও গতি এক। ফলতঃ, আমরা দেখিলাম যে পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদই আমার গন্তব্য স্থান, কিন্তু কথা এই যে মৃত্যুর পরেই কি আমরা সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইব? আমি পুণ্যাত্মাই হই অথবা পাপীই হই, চিরজীবন সৎপথে চলিয়া ভগবদাদিষ্ট কর্ম্ম করিয়া আসি অথবা কুপথে চলিয়া জগতের পীড়াদায়ক কর্ম্ম করিয়া আসি আমার কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ব্বিশেষে কি আমি আমার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই ব্রহ্মপদের অধিকারী হইব! যদি তাহা হয় তাহা হইলে ত সংসারনিয়মের বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়ে—নৈতিক রাজ্য লোপ পায়—কিন্তু তাহা নহে। এই সম্বন্ধে একজন চিন্তাশীল লেখক লিখিয়াছেন—"মৃত্যুর পূর্ব্বদিন ঐ ব্যক্তি যেরূপটি ছিল—মৃত্যুর পরবর্ত্তী দিনেও সে ঠিক সেইরূপটিই থাকে। একটুও হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। জীবিতকালে যদি ঐ ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ, ভক্তি-মান বা অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন থাকেন তবে মৃত্যুর পরেও উঁহার ঐ সকল গুণরাশি বিদ্যমান থাকিবে। অপরঞ্চ যদি উনি পার্থিব জীবনে নীচ ও সঙ্কীর্ণহৃদয়, কুচিন্তা ও ইন্দ্রিয়সেবাসংক্রান্ত বাসনায় বিব্রত থাকেন তবে মৃত্যুর তোরণ অতিক্রম করিয়া গেলেও ঐ সকল অসদ্‌গুণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। প্রকৃত কথা এই যে, মৃত্যু হওয়ায় প্রকৃত মানুষটির কোনরূপ পরিবর্ত্তনই ঘটে না। পরিচ্ছদাবৃত ব্যক্তির বহিরাবরণটি উন্মোচনের ন্যায় স্থূল দেহ পরিত্যাগে দেহীর প্রকৃতিগত কোন পরিবর্ত্তনই হয় না।" তবে কখন কি প্রকারে সেখানে যাওয়া যায়? জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া তথায় পৌঁছিতে হয়। নিজ কর্ম্মফলে কখনও উচ্চলোকে কখনও বা নিম্নলোকে বসতি করিতে হয়, কখনও বা সুখ কখনও বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥"

জীবগণ পুণ্যকাযরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উত্তম দেবভোগ সকল ভোগ [illegible] পরে পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন এবং বেদত্রযবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কামনাপরতন্ত্র হওয়ায় সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন। আমাদের কর্ম্মফলেই আমাদিগকে বারম্বার সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। মায়াধীন আমরা মায়ার বশে কত না কামনা করিয়া থাকি—এবং কামনার ফলে আমরা বদ্ধ হইয়া এই দশা প্রাপ্ত হই। জন্মজন্মান্তরের চেষ্টা দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্মফলে সৌভাগ্যবশতঃ যখন আমাদের কর্ম্মের ও ভোগের শেষ হয় তখনই আমরা সেই ব্রহ্মপদ বা বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হই—

প্রযত্ন [illegible] যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

প্রযত্ন সহকারে উত্তরোত্তর যোগী যোগে অধিক যত্নশীল হইয়া ও তদ্দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া অনেক জন্মে সম্যক জ্ঞানী হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

বহু জন্মের পর বাসুদেবই সব এই ধারণ হয়। তবেই ত আমার গন্তব্য স্থান বহুদূর!

৪। সেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার জন্য সম্বল সংগ্রহ চলে কিনা—যদি চলে তাহা কি?

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এ প্রশ্নের ত অতি সহজ উত্তর পড়িয়া রহিয়াছে। কিছুই ত লইয়া যাওয়া চলে না। আমি ধনকুবের আমার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই; সুধাধবলিত অট্টালিকা, দুগ্ধফেননিভশয্যা, অসংখ্য দাসদাসী, দেবদুর্লভ আহারীয় ও পানীয়, প্রিয়তমা অশেষগুণের আধারভূতা পত্নী, আদর্শ-স্থানীয় সন্তানগণ আমার হৃদয়ে অতুল আনন্দের প্রবাহ ছুটাইতেছে আমার কোন দুঃখ নাই ভগবানের অনুগ্রহে আমি এই সংসারে থাকিয়াই স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছি কিন্তু বিধির বিধানে সংসারের নশ্বরতাপ্রযুক্ত একদিন আমার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল আমি মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত হইলাম। আমার অবস্থা কি হইল? এই যে অতুল ঐশ্বর্য্য ইহার অণুমাত্র কি আমি সঙ্গে লইতে পারিলাম। আমার আত্মীয় স্বজন কি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আমার সুখ বধানের জন্য আমার সঙ্গে এক কপর্দ্দকও দিতে পারিলেন? সকলের যে অবস্থা আমারও সেই অবস্থা হইল। ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সমান আশ্রয়দাতা শ্মশানভূমির মৃত্তিকাই আমার শয্যা হইল ও স্নেহের পুত্র-প্রদত্ত অগ্নিশিখা আমার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিল। আমার সযত্নরক্ষিত দেহ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত হইল—সব ফুরাইল কিছুই আমার সঙ্গে গেল না। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহাই? সাধারণ দৃষ্টি ছাড়া আমাদের শাস্ত্রদৃষ্টি আছে। শাস্ত্র বলেন—তাহা নহে, আমাদের স্থূলদেহ ভস্মীভূত হইল বটে কিন্তু আমাদের সূক্ষ্মদেহ আমাদের আত্মার অনুগমন করিয়া থাকে।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে।
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥

আমারই অংশ এই সনাতন অর্থাৎ মায়াবশতঃ সদাসংসারিরূপে

প্রসিদ্ধ জীব প্রভৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে জীবলোকে সংসারে উপভোগার্থ আকর্ষণ করে।

দেহী কর্ম্মবশে যে শরীর প্রাপ্ত হন এবং যে শরীর পরিত্যাগ করেন, প্রাপ্ত শরীর পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত শরীর হইতে এই সকল ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া যান; যেমন বায়ু আশয় অর্থাৎ কুসুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্মাংশ সকল প্রচার করিয়া গমন করে সেইরূপ।

এই দেহী কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, রসনা, নাসিকা এই সকল বাহ্যেন্দ্রিয়ে এবং অন্তঃকরণে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয় সকল উপভোগ করেন।

দেহান্তর-গমনকারী অথবা সেই দেহেই অবস্থিত অথবা বিষয়-ভোগকারী অথবা ইন্দ্রিয়াদি গুণবিশিষ্ট দেহীকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না; কিন্তু আত্মজ্ঞানীরা দেখিতে পান।

জীবাত্মা নিজ কর্ম্মানুসারে কর্ম্মফল ভোগ জন্য দেহান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় ও সেই দেহ গ্রহণকালে পূর্ব্বদেহের মন ও প্রকৃতিকে সঙ্গে লইয়া যায় ও পূর্ব্বজন্মের প্রকৃতি ও সংস্কারানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। মৃত্যুর পরও তাহা হইলে আমরা আমাদের সঙ্গে কিছু লইয়া যাই, আমরা একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় আমাদের গন্তব্য স্থানে যাত্রা করি না। এখন যাহার যেমন সম্বল তাহার তেমনই ভোগ। ভাল জিনিষ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে পার—সুখভোগ করিবে, মন্দ জিনিষ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাও—দুঃখভোগ করিবে। সেইজন্য এমন জিনিষ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে হইবে যাহার ফলে এই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত নিবারণ হয় যাহার ফলে দুঃখের আত্যন্তিক নাশ হয়। কি উপায়ে এই কল্যাণকর পদার্থ সংগ্রহ হইতে পারে? গীতা বলিতেছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে লোকে দেহত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সর্ব্বদা সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় তাহারা সেই সেই ভাবই পায়।

মৃত্যুকালে যিনি যেরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিবেন তিনি সেই চিন্তানুরূপ দেহ পাইবেন; সূক্ষ্মশরীর সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই ভাবোপযোগী দেহ অবলম্বন করিবেন। শুনা যায় ভরতরাজা মৃগশিশুর চিন্তাপরায়ণ হইয়া দেহত্যাগ করায় মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুষ্য মৃত্যুকালে যদি বিষয়সম্বন্ধে ধ্যানপর হইয়া শরীর হইতে বহির্গত হয় দেহান্তরে সে বিষয় ভোগের সুবিধা পাইতে পারে কিন্তু মুক্তি তাহা হইতে বহুদূরে পড়িয়া থাকিবে, কারণ বন্ধন মোচনের নামই ত মুক্তি। যদি মরণ সময়ে সে বাসনার বন্ধন লইয়াই চলিল তবে আর তাহার বাধন খুলিবে কি করিয়া। হিন্দু এই জন্য "মহাপ্রস্থানের মহামন্ত্র" উদ্ভাবন করিয়া রাখিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রের হিন্দু-আচার-ব্যবহারের বিশিষ্টতা এই যে নিত্য নৈমিত্তিক প্রত্যেক অনুষ্ঠানই তাহার ধর্ম্ম-প্রবণতাকে সরস করিয়া দেয়, ধর্ম্ম-প্রাণকে সজীব করিয়া থাকে। ধন্য আমরা যে হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাই "মহাপ্রস্থানের মহামন্ত্র" —"অন্তে গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম"। অন্তকালে পথিককে পতিতপাবনী কলুষনাশিনী গঙ্গামাতাকে স্মরণ করিতে হইবে; যদি তাঁহার ধারণায় কুলায় তাহা হইলে যাঁহার পাদপদ্ম হইতে সেই কলুষনাশিনী গঙ্গাদেবীর উদ্ভব হইয়াছে ও যাঁহা হইতে তিনি কলুষনাশকারী শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ভবভয়হারী নারায়ণ হরির চিন্তা করিতে হইবে. তাঁহার চিন্তাশক্তি, ধারণাশক্তি যদি আরও অগ্রসর হইতে পারে, যদি তিনি সাকার ছাড়িয়া নিরাকারে পৌঁছিতে পারেন তবে তাঁহাকে অন্তিমকালে একবার বিষয়বাসনা ছাড়িয়া দিয়া সংসারের জন্য অজস্র অশ্রুবর্ষণ না করিয়া সেই আদি পুরুষ পরব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে; যদি প্রকৃতই সেই চিন্তা করিতে পারেন তবে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সূক্ষ্মদেহ সেই চিন্তা ও ধারণার অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাঁহার কলুষ নাশ হইবে, ভবভয় দূর হইবে, তিনি ব্রহ্মপদ বা বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবেন। যিনি যে পদবীর বা অধিকারের লোক হউন না কেন সকলের অভ্যাসাদ্বিব উপায় বাবাব

একমাত্র—"অন্তে গঙ্গা নারায়ণব্রহ্ম"।* তাই অন্তিম শয্যাশায়ী পুরুষ যদি ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত নিজমুখে নাম উচ্চারণ করিতে না পারেন তবে তাঁহার আত্মীয়স্বজন তাঁহার কর্ণকুহরে নামমন্ত্র শুনাইয়া যেন তাঁহার বিষয়-জ্বালা দূর করিবার পথ করিয়া দেন—তাঁহার পথের সম্বল করিয়া দেয়—তিনি এই সম্বল লইয়া মহাযাত্রায় বহির্গত হন। এখন মনে করিতে পারেন যে, উপায় বড় সহজ দেখা যাইতেছে, মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া শিশুকাল হইতে মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কাজই করি না কেন একবার মরণের পূর্ব্বে হরিচিন্তা করিলেই ত খালাস—তবে আর ভয় কি? ভাবনা কিসের? সত্য বটে মরণের পূর্ব্বে জীব যদি একবার হরিচিন্তা করিতে পারে, সেই পরব্রহ্মের ধারণা করিতে পারে তবে দেবদূতগণ তাহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়—তাহার ভববন্ধন ঘুচিয়া যায়, তাহার গতাগতি শেষ হয়—কিন্তু জীব প্রকৃতই কি তাহা পারে? না, তাহা পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মন জড়ধর্ম্মী—অভ্যাসের দাস। আমি নিত্য যাহা করিতেছি—মন তাহাই করিতে চাহিবে। চির জীবন আগ্রহসহকারে "কামিনীকাঞ্চনের" সেবা করিয়া মৃত্যুর অব্যবহিত-পূর্ব্বেই সেই চিরাভ্যস্ত, চিরসঙ্গী, চিরপ্রিয় "কামিনীকাঞ্চনের" আসক্তি ভুলিয়া নূতন প্রেমাস্পদের সন্ধান ও তাঁহার প্রেমে ভাবিত হওয়া অসম্ভব; তাই সময় থাকিতে অভ্যাস করিতে হইবে।

তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মরযুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥
"অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥"

অতএব সর্ব্বদা আমার স্মরণ কর (এবং যুদ্ধ কর) আমাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে।

* শ্রীমান হেমচন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ স্মরণে।

হে পার্থ অভ্যাসযোগ দ্বারা একাগ্র এবং অনন্যগামী চিত্ত দ্বারা দিব্যপুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সকল সময়ে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে হইবে, তাঁহাতেই মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিতে হইবে; অনন্যগামী চিত্ত দ্বারা পরমপুরুষের চিন্তা অভ্যাস করিতে হইবে, তবে মৃত্যুকালে পূর্ব্ব-অভ্যাসবশতঃ জিহ্বাগ্রে আপনা হইতে হরিনাম স্ফুরিত হইবে; মন পরব্রহ্মের চিন্তা করিতে, শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহার নাম শুনিতে, গুণগ্রাম শুনিতে ব্যস্ত হইবে এবং উৎক্রমণোন্মুখ সূক্ষ্মদেহ এই সংস্কার সঙ্গে লইয়া যাইবে ও জন্মান্তরে ভগবৎচিন্তার অনুকূল দেহ প্রাপ্ত হইয়া ভগবচ্চিন্তায় পরমানন্দ লাভ করিবে ও শেষে বিষ্ণুপদাখ্য পরমধাম প্রাপ্ত হইবে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়াছে—আর একটি কথা বলিয়াই ইহার উপসংহার করিব।

এই পরব্রহ্মের চিন্তা দুই উপায়ে হইতে পারে। শাস্ত্রে প্রধানতঃ দুই মার্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। জ্ঞানমার্গের পথিকেরা "নেতি নেতি" বিচার করিয়া অসত্য ও অবস্তু পরিহারপূর্ব্বক নিত্য সত্য সর্ব্বজ্ঞকে প্রাপ্ত হন। ভক্তিমার্গের পথিকেরা ভগবানের নাম করিয়া, সেবা করিয়া সেই 'অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ' পরমেশ্বর কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। জ্ঞানমার্গ বড় কঠিন কলিযুগে স্বল্পায়ু মানবের জ্ঞানমার্গে গন্তব্য স্থানে যাওয়া বড়ই দুরূহ; তাই করুণার অনন্ত সাগর প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু আচণ্ডালে ভক্তি বিতরণ করিয়া ভক্তিরস প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন—

"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা – এই বোধ ঠিক হ'লে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ—'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' কেমন ক'রে বোধ হবে? সে বোধ দেহ বুদ্ধি না গেলে হয় না। আমি দেহ নই, আমি মন নই, আমি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখদুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কৈ?—এসব বোধ

কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার কর, কোনখান থেকে দেহ-বুদ্ধি এসে দেখা দেয়। অশ্বত্থ গাছ এই কেটে দাও, মনে করিলে মূল শুদ্ধ উঠে গেল, কিন্তু তার পর দিন সকালে দেখ—গাছের একটী ফেকড়ী দেখা দিয়েছে! দেহাভিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে সহজ।"

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন--

"আমি মার কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাত যোড় ক'রে বলেছিলাম—মা এই লও তোমার অজ্ঞান, এই লও তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা-ভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা-ভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, এই লও তোমার ধর্ম্ম, এই লও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।''

এই শুদ্ধা-ভক্তির লক্ষণ মহাপ্রভু শ্রীরূপশিক্ষায় বলিয়াছেন -"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥"

এই শুদ্ধা-ভক্তির গুণে বৃন্দাবনে গোপীরা কৃষ্ণধন লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তহৃদয়বিহারী ভক্তমনোবাঞ্ছা-পূর্ণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগেরভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য কাত্যায়নীব্রতকালে রমণী-হৃদয়-সর্ব্বস্ব লজ্জা পর্য্যন্ত ত্যাগরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভেদজ্ঞানরহিতা গোপীগণ সেই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছিলেন। ভগবানকে ভক্তের অদেয় কিছুই নাই—শুদ্ধসত্ত্বময়ী গোপীগণ তাঁহাদের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। মায়াময় জগতে যে আবরণ জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক করিয়া রাখে—গোপীদের শুদ্ধা-ভক্তির বলে সেই আবরণ উন্মোচন হইয়াছিল; তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণপরায়ণ হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ও তাহারই পরস্কার স্বরূপ "শারদোৎফুল্লমল্লিকা" রজনীতে ভগবান্ তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ

'যোগেশ্বরেশ্বর' 'আত্মারাম' পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধাভক্তিময়ী গোপীদিগের সহিত রাসলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন হইয়াছিল—জগৎ ধন্য হইয়াছিল।

এখন, এই ভক্তির সাধন কি? কি উপায়ে আমরা ভক্তি লাভ করিতে পারি? একমাত্র হরিনামই ভক্তির সাধন। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।" নামজপ করিলেই হৃদয়ে ভক্তির স্ফূর্ত্তি হইবে। নামরূপ মহামন্ত্রে পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের সমস্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে। জীবের উদ্ধার জন্য প্রেমের পাগল শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই নামামৃত বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। এই নামের অপূর্ব্ব মহিমা, তুমি অন্ধ হও, খঞ্জ হও, একবার বিশ্বাস করিয়া নামরূপ যষ্টি গ্রহণ কর। ঐ একমাত্র যষ্টির সাহায্যে তুমি তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে। এই নামের এমনই আশ্চর্য্য গুণ যে ইহারই প্রভাবে নামে অরুচিরূপ বিকার পর্য্যন্ত দূর হইয়া যায়। তাই বলি বন্ধুগণ, একবার সময় থাকিতে, প্রাণ ভরিয়া হরিনামামৃত পান করিতে থাকুন। বহুপুণ্য-ফলে—ভারতবর্ষে হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনাদের কল্যাণার্থে মহাজনগণ ভবপারের তরণীস্বরূপ এই নাম রাখিয়া গিয়াছেন—একবার সেই তরণীর আশ্রয় গ্রহণ করুন—সেই শ্রবণমঙ্গল নামের গুণে কলুষ দূরে যাইবে, তাপিত প্রাণ শীতল হইবে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব সুখ মন্দাকিনীর প্রবাহ বহিতে থাকিবে, প্রেমাস্পদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। * অতএব প্রাণ ভরিয়া একবার বলুন—হরিবোল। উহাই একমাত্র পথের সম্বল।

—

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর। নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥"

সৃষ্টি বা সামান্য অধ্যারোপ।

(স্বামী অমৃতানন্দ)

এই বিশ্বের বিচিত্র রচনা, অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা, তদুপরি এক অজ্ঞাত-শক্তির অদ্ভুত বিকাশ—এই পরিদৃশ্যমান জগতের কোথাও তুষারাবৃত অসংখ্য পর্ব্বতমালা কোথাও উত্তাল তরঙ্গ সমাযুক্ত বিশাল সমুদ্র, কোথাও বৃক্ষহীন তৃণহীন, জলহীন শত শত ক্রোশব্যাপী শুষ্ক মরু-ভূমি কোথাও বা নানা ফল ফুল ভারে অবনত নিবিড় বিটপীশ্রেণী সমাচ্ছন্ন বহু শস্যে পরিপূর্ণ সুজলা গ্রাম্যদেশ—তন্মধ্যে আবার কীটাণু-কীট হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র প্রকার জীবের বসবাস অবলোকনে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনে, এই সৃষ্টি কেমন করিয়া হইল, কে ইহার সৃজন করিল, ইত্যাদি প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে এবং ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দানের চেষ্টা করিতে যাইয়া বিভিন্ন ভাবের ভাবুকগণ বিভিন্ন প্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছেন; এস্থলে তাঁহাদের মতামতের আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র ভারতের অরণ্য নিবাসী ভিক্ষোপজীবী, যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যালব্ধ জ্ঞানরত্নের অধিকারী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের সম্বন্ধে যেরূপ মত তাহাই পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া আমি ক্ষান্ত হইব।

শ্রুতি বলিতেছেন:—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি"—যাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, যাঁহার দ্বারা এই উৎপন্ন ভূত সকল জীবিত থাকে।

"সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীৎ" হে সৌম্য ইহার অগ্রে সৎ ছিলেন—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়।

গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন:—"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে"

—আমিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়।

"বীজং মাং সর্ব্বভূতানাম্ বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্" হে পার্থ! আমাকে সকল ভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে।

এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য হইতে দেখা যাইতেছে যে পরমেশ্বরই এই স্মৃষ্টির কর্ত্তা। এবং পূর্ব্বে একমাত্র ঈশ্বর-চৈতন্যই যে এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ তাহা "ঈশ্বর ও জগৎ" প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে।

পরমেশ্বর কিরূপভাবে স্মৃষ্টি করিলেন?

পরমেশ্বর স্মৃষ্টি-কল্পের আদিতে প্রাণী সকলের বৈচিত্র্য ও অনাদি কর্ম্মসংস্কাররূপ বীজ এবং অনির্ব্বচনীয় মায়ার বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে নামরূপাত্মক সমস্ত জগৎ বুদ্ধিতে প্রতিভাত করিয়া 'ইদং করিষ্যামি' —"এই প্রকার করিব"— এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। শ্রুতিতে আছে:— 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়'—তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব।

স্বামিজী গাহিয়াছেন:—"তথা হতে বহে কারণ-ধারা,
ধরিয়া বাসনা বেশ উজালা।
গরজী গরজী উঠে তার বারি—
অহমহমিতি সর্ব্বক্ষণ॥

পরমেশ্বরের ঐরূপ ইচ্ছা হওয়া মাত্রেই সত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই অপঞ্চীকৃত তম প্রধান ত্রিগুণাত্মক সূক্ষ্ম পঞ্চভূত উৎপন্ন হইল। এই পঞ্চভূত পরস্পর মিশ্রিত নহে বলিয়া ইহাদিগকে 'অপঞ্চীকৃত' বলা হইয়াছে; এই অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম 'ভূত'কেই 'তন্মাত্রা' বলে। এই পঞ্চভূতের কারণ যখন ত্রিগুণাত্মিকা মায়া তখন তাহার কার্য্য আকাশাদি তন্মাত্রা যে ত্রিগুণাত্মক ইহাতে কোনও সংশয় নাই, যেহেতু কারণের গুণ কর্য্যে থাকেই থাকে। কিন্তু এই আকাশাদি ত্রিগুণাত্মক হইলেও উহা তম প্রধান, কারণ সত্বগুণের কার্য্য প্রকাশাদি ধর্ম্ম আকাশাদিতে দেখা যায় না বরং তমগুণের ধর্ম্ম জড়ত্বাদিই দেখা যায়।

অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথমে আকাশ স্মৃষ্টি হইল, এই আকা-

শের গুণ শব্দ। বায়ুর সৃষ্টি তৎপরে হইল, এই বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। স্পর্শটি বায়ুর নিজের গুণ এবং শব্দ উহার কারণ যে আকাশ তাহার গুণ ক্রমে বায়ুতে আসিয়াছে।

তৎপরে তেজের সৃষ্টি হইল, এই তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। রূপ তেজের নিজ গুণ এবং শব্দ ও স্পর্শ উহার কারণের গুণ ক্রমে তেজে আসিয়াছে।

তাহার পর জলের সৃষ্টি হইল। এই জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। রস জলের নিজ গুণ এবং শব্দ, স্পর্শ, ও রূপ উহার কারণের গুণ ক্রমে জলে আসিয়াছে।

সর্ব্বশেষে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। গন্ধ পৃথিবীর নিজ গুণ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস উহার কারণের গুণ ক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছে এই অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূত হইতে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। পঞ্চপ্রাণ মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় লইয়া সূক্ষ্ম শরীর হইয়াছে। দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়।

কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। আকাশের সাত্ত্বিকাংশ হইতে কর্ণ, বায়ুর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ত্বক্, তেজের সাত্ত্বিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্ত্বিকাংশ হইতে রসনা এবং পৃথিবীর সাত্ত্বিকাংশ হইতে নাসিকা ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি। প্রকাশাত্মক বলিয়া ইহারা আকাশাদির সাত্ত্বিকাংশের কার্য্য, কারণ প্রকাশাদি সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম (এই সকল ইন্দ্রিয়ের আবার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছে)।

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন আকাশাদির সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ আকাশাদির পৃথক্ পৃথক্ রজাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ আকাশের রজাংশ হইতে বাক্, বায়ুর রজাংশ হইতে পাণি, তেজের রজাংশ হইতে পাদ, জলের রজাংশ হইতে পায়ু ও পৃথিবীর রজাংশ হইতে উপস্থ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে।

(পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছে) কর্ম্মেন্দ্রিয় ক্রিয়াত্মক বলিয়া রজাংশের কার্য্য। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি যেমন পঞ্চ তন্মাত্রার যথা-ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ রজাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে পঞ্চ প্রাণ কিন্তু পঞ্চ তন্মাত্রার মিলিত রজাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পঞ্চ প্রাণ বায়ুর নাম—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। ইহারাও ক্রিয়াত্মক বলিযা রজাংশ হইতে উৎপন্ন বলা হইল।

এই পঞ্চ প্রাণের কার্য্য ও স্থান বলা হইতেছে—

প্রাণবায়ু	ঊর্দ্ধগমনশীল	নাসিকাগ্র স্থানবর্ত্তী
অপান	অধোগমনশীল	পায়ুস্থানবর্ত্তী
ব্যান	সর্ব্বতোগমনশীল	সমগ্রদেহবর্ত্তী
উদান	উৎক্রমণশীল	কণ্ঠস্থানবর্ত্তী
সমান	পরিপাকসম্পাদনশীল বা সমীকরণশীল	নাভিস্থানবর্ত্তী

সমান বায়ু সাহায্যে ভুক্ত অন্ন, পীত জল দুইটি বিভিন্ন হইলেও এক বস্তু রক্তে পরিণত হয়, এইরূপ করাকেই সমীকরণ বলে। প্রাণাদি বায়ুরূপে এক হইলেও ক্রিয়াভেদে বিভিন্ন।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন পঞ্চ তন্মাত্রার পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু অন্তঃকরণ সেরূপ নহে, উহা ঐ পঞ্চ তন্মাত্রার মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—ইহারা প্রকাশাত্মক বলিয়া সত্ত্বাংশ।

অন্তঃকরণ বলিতে কেবল মন ও বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে কিন্তু চিত্ত ও অহঙ্কারের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। উহার কারণ এই যে ঐ দুইটি মন ও বুদ্ধির অন্তর্গত বলিয়া আর পৃথক্ উল্লেখ করা হইল না। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটিকে অন্তঃকরণ বলে। ইহারা অন্তর্বিষয়ের প্রকাশ করে বলিয়া ইহাদিগকে অন্ত-রিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ বলা হয়। এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বহির্বিষয়ের প্রকাশ করে বা ভোগ সম্পাদন করে বলিযা বহিরিন্দ্রিয় বা বহিঃকরণ বলে।

অন্তঃকরণ যদিও এক কিন্তু বৃত্তিভেদে ইহার চারিটি ভাগ করা হইয়াছে—যেমন একই পুরুষকে পাচক ও পাঠক উভয়ই বলা হয়। এক্ষণে অন্তঃকরণের বৃত্তিভেদ অনুসারে তাহার চারিটি ভাগ দেখান হইতেছে :—

"আমি ব্রহ্ম" এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে।

"আমি চিদ্রূপ কি দেহ" এইরূপ সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তিকে মন বলে।

স্মরণাত্মিকা ও অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তিকে চিত্ত বলে।

অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তিকে অহঙ্কার বলে।

এইরূপে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত হইতে ভোগ সাধনের উপযোগী সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। আচার্য্য বলিয়াছেন :—"পঞ্চ প্রাণ মনো বুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃত ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥"

এই সূক্ষ্ম শরীরের তিনটি কোষ আছে, যথা, বিজ্ঞানময় কোষ, মনোময় কোষ ও প্রাণময় কোষ।

সত্ত্বাংশের কার্য্য বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইলে প্রকাশের আধিক্য হয় বলিয়া উহাকে বিজ্ঞানময় বলা হইল ও আত্মার আচ্ছাদক বলিয়া কোষ বলা হইল। চৈতন্য বস্তুতঃ অকর্ত্তা, অভোক্তা, নিত্যানন্দময়, অপরিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয় হইলেও বিজ্ঞানময় কোষ দ্বারা অধ্যারোপিত হইয়া আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী, পরিচ্ছিন্ন এবং ক্রিয়ামান এই সকল অভিমানবশতঃ ইহলোক পরলোক-গামী ব্যবহারিক জীবত্ব লাভ করে।

সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন ও রজগুণ হইতে উৎপন্ন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মনময় কোষ হইয়াছে। বুদ্ধি অপেক্ষা জাড্যাধিক্য-বশতঃ ইহাকে মনময় কোষ বলা হইল। পুনরায় ইহা সত্ত্ব ও রজ মিলিত বলিয়া সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক বা ইচ্ছাশীল।

পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ হইয়াছে। ইহারা উভয়েই রজ প্রধান সুতরাং ক্রিয়াশীল।

এই বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় কোষ তিনটির মধ্যে

বিজ্ঞানময় কোষের শক্তি জ্ঞান, মনোময় কোষের শক্তি ইচ্ছা ও প্রাণময় কোষের শক্তি ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে। তিনটি কোষের শক্তিভেদে ও যোগ্যতা হিসাবে বিজ্ঞানময় কোষকে কর্ত্তা বলা হইল—কারণ কর্ত্তারই কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে। প্রথমে জ্ঞান ও তৎপরে কার্য্যের ইচ্ছা হইয়া থাকে এবং ইচ্ছাই কার্য্য করায় এই ইচ্ছাশক্তি মনোময় কোষের সুতরাং উহা করণরূপ। কিন্তু কেবল জ্ঞান ও ইচ্ছা দ্বারা কার্য্য হয় না, কার্য্য করিবার শক্তির আবশ্যক এই ক্রিয়াশক্তি প্রাণময় কোষের সুতরাং উহা ক্রিয়ারূপ কার্য্য।

এই বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় কোষত্রয় মিলিত সেই সমষ্টিকে সূক্ষ্ম শরীর বলা হয়।

যেমন বন বৃক্ষের সমষ্টি, জলাশয় জলের সমষ্টি, ঐরূপ এক বুদ্ধিতে সমস্ত সূক্ষ্ম শরীর-সমষ্টি সম্ভব এবং যেমন বৃক্ষ বনের ব্যষ্টি ও জল জলাশয়ের ব্যষ্টি সেই প্রকার বহু বুদ্ধিতে সমষ্টি-সূক্ষ্ম-শরীর ব্যষ্টি হয়। এই সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর রূপ উপাধি দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে সূত্রাত্মা, হিরণ্যগভ বা মহাপ্রাণ বলে। যেমন একখানি পটের সূত্র সেই পটের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকে ঐরূপ হিরণ্যগভ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত বলিয়া তাঁহাকে সূত্রাত্মা বলা হইল অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ সকল প্রাণিগণের লিঙ্গশরীরে অনুস্যূত আছেন বলিয়া সূত্রাত্মা। এবং তিনি সূক্ষ্ম শরীর বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয় দ্বারা অবিচ্ছিন্ন বলিয়া তিনি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তিবিশিষ্ট ও অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের অভিমানী। হিরণ্যগর্ভের শরীর বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয় এবং উহা স্থূলপ্রপঞ্চ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহার শরীর সূক্ষ্ম স্বপ্নের ন্যায় বাসনাময় বলিয়া স্বপ্নস্থান, কারণ স্বপ্নটি জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত বিরাট্‌রূপ স্থূল প্রপঞ্চের বাসনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে এবং যেহেতু স্বপ্নাবস্থাটি সূক্ষ্ম এবং স্থূল প্রপঞ্চের লয় স্থান অতএব হিরণ্যগর্ভও স্থূল প্রপঞ্চের লয় স্থান।

ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীর উপহিত চৈতন্যকে তৈজস বলে এবং তেজোময়

অন্তঃকরণ উহার উপাধি বলিয়া তৈজস বলা হইল। এই তৈজসেরও স্বপ্নস্থান বা স্থুল প্রপঞ্চ লয় স্থান স্থুল অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া সূক্ষ্ম শরীর। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে ঈশ্বরও প্রাজ্ঞ অজ্ঞানবৃত্তি দ্বারা সুষুপ্তি অবস্থায় কেবল মাত্র আনন্দ অনুভব করেন সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ তৈজস স্বপ্নাবস্থায় বাসনাময় শব্দাদি বিষয় অনুভব করেন শ্রুতিতেও আছে ঃ—'প্রবিবিক্তভুক্ তৈজস' তৈজস সূক্ষ্ম বস্তুর উপভোগকর্ত্তা।

স্বরূপতঃ সমষ্টি বন ও ব্যষ্টি বৃক্ষ যেমন এক, সমষ্টি জলাশয় ও ব্যষ্টি জল যেমন এক বস্তু সেইরূপ সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর ও ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীরও এক এবং ব্যষ্টি বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশ ও সমষ্টি বনাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন এক, সমষ্টি জলাশয় প্রতিবিম্বিত আকাশ ও ব্যষ্টি জল প্রতিবিম্বিত আকাশ যেমন এক ঐরূপ সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর অবচ্ছিন্ন চৈতন্য হিরণ্যগর্ভ ও ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর অবচ্ছিন্ন চৈতন্য তৈজস এক।

সূক্ষ্ম শরীরের যে প্রকারে উৎপত্তি হয় তাহার কথা বলা হইল। এক্ষণে স্থুল প্রপঞ্চ ও স্থুল শরীর কি প্রকারে সৃষ্টি হইল তাহা বলা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত পঞ্চীকৃত হইলে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত উৎপন্ন হয়। পঞ্চীকরণের নিয়ম এইরূপ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের প্রত্যেককে প্রথমে দুইটি সমান অংশে ভাগ করিয়া পরে আকাশাদি এক একটির অর্দ্ধভাগ অপর কয়টি ভূতের প্রত্যেকটির অষ্টমাংশ যোগ করিয়া এক একটি স্থুলভূত উৎপন্ন হইয়াছে। যে ভূতে যে ভূতটি অর্দ্ধ পরিমাণ আছে উহাই সেই স্থুল ভূত হইয়াছে। ঐ পঞ্চীকরণ প্রথাটি আরও পরিষ্কাররূপ দেখান হইতেছে ঃ—

পঞ্চীকৃত বা স্থুল আকাশ = $\frac{1}{2}$আ + $\frac{1}{8}$বা + $\frac{1}{8}$ম + $\frac{1}{8}$তে + $\frac{1}{8}$পৃ

ঐ ঐ বায়ু = $\frac{1}{2}$বা + $\frac{1}{8}$আ + $\frac{1}{8}$তে + $\frac{1}{8}$জ + $\frac{1}{8}$ পৃ

ঐ ঐ তেজ = $\frac{1}{2}$তে + $\frac{1}{8}$আ + $\frac{1}{8}$বা + $\frac{1}{8}$ম + $\frac{1}{8}$ পৃ

ঐ ঐ জল = $\frac{1}{2}$জ + $\frac{1}{8}$আ + $\frac{1}{8}$বা + $\frac{1}{8}$তে + $\frac{1}{8}$ পৃ

ঐ ঐ পৃথিবী = $\frac{1}{2}$পৃ + $\frac{1}{8}$আ + $\frac{1}{8}$বা + $\frac{1}{8}$তে + $\frac{1}{8}$ জ

এই পঞ্চীকরণটি শ্রুতি বিরুদ্ধ বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন।

কারণ শ্রুতিতে আছে—"তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকং করবাণি" তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ বা তিন বিশিষ্ট করিব। এখানে এই ত্রিবৎকরণ কথাটির দ্বারা পঞ্চীকরণ বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে অগ্নি, জল, পৃথিবী এই তিনটি ভূতের কথা আছে বলিয়া এইরূপ নহে যে ঐ তিনটি মাত্র ভূত কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে অগ্নি জল ও পৃথিবী ছাড়া বায়ু ও আকাশের উল্লেখও আছে। ছান্দোগ্যে তিনটি মাত্র ভূতের উল্লেখবশতঃ ত্রিবৃৎকরণ বলা হইয়াছে সুতরাং সেই ত্রিবৃৎকরণ অর্থে পঞ্চীকরণ বুঝিতে হইবে, তাহা হইলে শ্রুতির সহিত আর বিরোধ থাকিবে না। স্থূল আকাশাদিতে বায়ু জল ইত্যাদিরও অংশ যখন আছে তখন উহাকে আকাশ বলিব কেন? আকাশের অংশ বেশী আছে বলিয়া উহার নাম আকাশ হইল অন্যান্য ভূতগুলিরও ঐ হেতু অনুসারে নাম হইয়াছে।

এইরূপে পঞ্চসূক্ষ্ম ভূতের পঞ্চীকরণ হইলে আকাশাদি স্থূলরূপ ধারণ করে, স্ব স্ব কার্য্য উৎপাদন করিবার শক্তি হয় এবং অব্যক্তরূপে আকাশস্থিত শব্দগুণ ব্যক্ত হইয়া পড়ে, ঐরূপ স্থূলবায়ুতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ব্যক্ত হয় অর্থাৎ এই সকল গুণ ঐ সকল ভূতের স্থূলত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা অনুভব করিতে সমর্থ হই।

পঞ্চীকৃত ভূত হইতে উপর্য্যুপরি সাতটি ঊর্দ্ধলোক সমুৎপন্ন হয় যথাঃ—

ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক।

অধোদিকেও যথাক্রমে নিম্নে নিম্নেস্থিত সাতটি অধোলোক উৎপন্ন হয়। যথা—

অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল।

এই পঞ্চীকৃত স্থূলভূত হইতেই ব্রহ্মাণ্ড ও চারপ্রকার স্থূলশরীর ও তাহাদের ভোগের উপযুক্ত অন্নপানাদি উৎপন্ন হইয়াছে।

স্থূলশরীর চারপ্রকার, কি কি তাহাই বলা হইতেছে যথাঃ—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। মনুষ্য পশু প্রভৃতির শরীর

জরায়ু হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে জরায়ুজ বলে। পক্ষী পন্নগ ইত্যাদির শরীর অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া অণ্ডজ বলে। উকুণ মশক ইত্যাদির শরীর স্বেদ বা ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদের স্বেদজ বলে এবং বৃক্ষাদির শরীর ভূমি ভেদ করিয়া উঠে বলিয়া উহাদিগকে উদ্ভিজ্জ বলে।

জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ এই তিনপ্রকার স্থূলশরীর সম্ভবপর—কিন্তু বৃক্ষত জড়ের ন্যায়, উহাকে এক প্রকার শরীর বলা হইল কেন? উহাতে শারীর ধর্ম্মের ত কোনও লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না?

মনুসংহিতায় আছে "শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ" অর্থাৎ পাপফল ভোগের নিমিত্ত বৃক্ষাদি দেহ উৎপন্ন হয়। অতএব বৃক্ষাদিরও শরীর আছে বিশ্বাস করিতে হইবে; কারণ শরীরের অভাবে ভোগ সম্ভবপর নহে। ইহাত শাস্ত্রের কথা বলা হইল, কিন্তু আজকাল আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ও আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে বৃক্ষাদির সহিত অন্যান্য জীবশরীরের ধর্ম্মাদির অতি নিকট সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন এবং জীবদেহে যেরূপ কোনও আঘাত লাগিলে স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা হয় বৃক্ষ শরীরেও তদ্রূপ হয়, ইহা তিনি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব বৃক্ষও যে একপ্রকার শরীর ইহাতে আর সন্দেহের কিছু নাই।

স্থূলশরীর চারিপ্রকার হইলেও "শরীর" এইরূপ এক বুদ্ধিতে বনের ন্যায় শরীরের সমষ্টিত্ব হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক শরীর বিষয়ে পৃথক পৃথক বুদ্ধিতে বৃক্ষের ন্যায় শরীরের ব্যষ্টিত্ব হয়। এক্ষণে ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত চারপ্রকার স্থূল শরীরের সমষ্টি উপহিত চৈতন্যকে বৈশ্বানর এবং বিরাট্ বলা হয়। তিনি সকল প্রাণির দেহেই 'অহম্' এইরূপ অভিমান করেন বলিয়া তাঁহাকে বৈশ্বানর বলা হয় এবং নানাপ্রকারে প্রকাশমান হয়েন বলিয়া বিরাট্ বলা হয়। স্থূল শরীর অন্নের বিকার বলিয়া ও আত্মার আচ্ছাদক বলিয়া অন্নময় কোষ, স্থূল বিষয় দ্বারা সুখ দুঃখাদি অনুভব করে বলিয়া স্থূল এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল উপলব্ধি করে বলিয়া বা বাহ্য

জগতের সহিত ব্যবহার করিতে পারে বলিয়া জাগ্রৎস্থান বলা হইল কারণ জাগ্রৎ অবস্থায়ই কেবল ঐ প্রকার সম্ভব।

ব্যষ্টি-শরীর-উপহিত-চৈতন্যকে বিশ্ব বলে। তিনি সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান পরিত্যাগ না করিয়া স্থূল শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই প্রত্যেক স্থূল শরীরেই "অহম্" এই প্রকার অভিমান করেন বলিয়া তাহাকে বিশ্ব বলা হইয়াছে। ইহাও ইঁহার স্থূল শরীর। অন্নের বিকার ঐ স্থূলদেহ এবং আত্মার আচ্ছাদক এই হেতু অন্নময় কোষ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় উপলব্ধি করে বলিয়া জাগ্রৎ-স্থান।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটির সাহায্যে বাহ্য বিষয় অনুভব হয় বলিয়া ইহারা বহিরিন্দ্রিয় বা বহিঃকরণ এবং বৃত্তিভেদে মন, বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই চারিটির সাহায্যে অন্তর্বিষয় অনুভব হয় বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃকরণ বলে ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই দশটি বহিঃকরণ ও চারিটি অন্তঃকরণ সহিত সর্ব্বশুদ্ধ মোট চতুর্দ্দশ-ইন্দ্রিয় আছে। এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতৃদেবতা দ্বারা নিয়োজিত হইয়া চতুর্দ্দশ প্রকার স্থূলবিষয় অনুভব করে। এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চতুর্দ্দশটি অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং সেই সেই ইন্দ্রিয় ও তাহাদের অনুভবসমূহ একটি তালিকা দ্বারা দেখান হইতেছে :—

অধিষ্ঠাতৃদেবগণ	ইন্দ্রিয়সকল	উহাদের অনুভব
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—দিক্	কর্ণ	শব্দ
বায়ু	ত্বক্	স্পর্শ
সূর্য্য	চক্ষু	রূপ
বরুণ	জিহ্বা	রস
অশ্বিনীকুমার	ঘ্রাণ	গন্ধ
পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়—অগ্নি	বাক্	বাক্য
ইন্দ্র	পাণি	গ্রহণ
উপেন্দ্র	পাদ	গমন
যম	পায়ু	ত্যাগ
প্রজাপতি	উপস্থ	আনন্দ

চার অন্তঃকরণ—চন্দ্র	মন	সংশয়
ব্রহ্মা	বুদ্ধি	নিশ্চয়
শঙ্কর	অহঙ্কার	অভিমান
বিষ্ণু	চিত্ত	অনুসন্ধান বা স্মরণ

বৈশ্বানর ও বিশ্ব জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল বিষয় অনুভব করেন। ইহা শ্রুতিতে আছে যথাঃ—"জাগরিত স্থানো বহিঃপ্রজ্ঞ"।

যেমন সমষ্টি বন ও ব্যষ্টি বৃক্ষ বাস্তবিক এক, যেমন সমষ্টি জলাশয় ও ব্যষ্টি জল এক সেইরূপ সমষ্টি স্থূল শরীর ও ব্যষ্টি স্থূলশরীর বস্তুতঃ এক এবং যেমন বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশ এক যেমন জলাশয় প্রতিবিম্বিত আকাশ ও জল প্রতিবিম্বিত আকাশ বাস্তবিক একই বস্তু সেইরূপ সমষ্টি স্থূল-শরীর উপহিত চৈতন্য বৈশ্বানর ও ব্যষ্টি স্থূল-শরীর-উপহিত-চৈতন্য বিশ্ব এক।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন প্রকার শরীরের কথা বলা হইয়াছে এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে, বৈশ্বানর বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস এবং ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞের চৈতন্যের কথাও বলা হইয়াছে এবং ইহাও দেখান হইয়াছে যে বৈশ্বানর ও বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস এবং ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ চৈতন্য এক। এক্ষণে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ইত্যাদি নানা প্রপঞ্চ উপহিত সমষ্টি ও উপহিত ব্যষ্টিভেদে বৈশ্বানর, বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ, তৈজস, ঈশ্বর, প্রাজ্ঞ ইত্যাদি নানা চৈতন্যও যে এক তাহাই দেখান হইতেছে। যেমন খদির, পলাসাদি উপহিত বিভিন্ন বনকে সমষ্টিভাবে এক মহাবন বলা হয়, যেমন বাপী কূপ তড়াগাদি বিভিন্ন জলাশয়কে এক করিয়া এক মহাজলাশয় বলা হয় সেইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন বিভিন্ন প্রপঞ্চকে এক করিয়া মহাপ্রপঞ্চ বলা হয়, খদির ও পলাস ইত্যাদি বিভিন্ন বন ও মহাবন যেমন এক, বাপী কূপ তড়াগাদি বিভিন্ন জলাশয় ও মহাজলাশয় যেমন এক সেইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ প্রপঞ্চ ও মহা প্রপঞ্চ এক এবং খদির ও পলাস বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও মহাবনা-বচ্ছিন্ন আকাশ যেমন এক, বাপী, কূপ তড়াগাদি প্রতিবিম্বিত আকাশ

ও মহাজলাশয় প্রতিবিম্বিত আকাশ যেমন এক সেইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর উপহিত চৈতন্য বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর, বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং ঐ মহাপ্রপঞ্চ উপহিত চৈতন্য এক।

কিন্তু শ্রুতিতে মহাবাক্য আছে যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থাৎ 'এ সমস্তই ব্রহ্ম' সুতরাং মহাপ্রপঞ্চ উপহিত চৈতন্য ও বিভিন্ন প্রপঞ্চ উপহিত চৈতন্য এক হইলেও মহাপ্রপঞ্চ যখন চৈতন্য নহে তখন উহা 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতি বাক্যের বিরোধী হইয়া পড়িতেছে। অতএব শ্রুতি বিরুদ্ধ বাক্য কিরূপে গ্রহণ করিব ?

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের বাচ্য ও লক্ষ্য বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে উহাতে ঐ শ্রুতি বাক্যের বিরোধ হয় নাই। যেমন অগ্নি ও লৌহপিণ্ড। এক করিয়া যদিও উভয়টি এক বস্তু নহে অর্থাৎ অন্যোন্য অধ্যাস বা তাদাত্ম্য অধ্যাস করিয়া আমরা বলি "অগ্নিময় লৌহপিণ্ড", তেমনি মহাপ্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম এক করিয়া অর্থাৎ তাদাত্ম্য অধ্যাস দ্বারা আমরা বলি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" ইহাই এই মহাবাক্যের বাচ্য। এবং যেমন লৌহপিণ্ড হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অগ্নি হইলেও সেই অগ্নিই 'ঐ লৌহপিণ্ড জ্বলিতেছে' এই বাক্যের দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন সেইরূপ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যেরও লক্ষ্য হইতেছে অনবচ্ছিন্ন তুরীয় ব্রহ্ম।

ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ব পর্য্যন্ত সমস্তই এক অদ্বৈত অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে অধ্যারোপমাত্র। বস্তুতঃ এই সমস্তে অধ্যারোপের অধিষ্ঠান একমাত্র ব্রহ্ম—তিনিই সৎবস্তু। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ একমাত্র ঈশ্বর, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং ঈশ্বরচৈতন্য ও ব্রহ্ম যখন এক তখন সমস্তই ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। এইরূপে সামান্য অধ্যারোপের কথা বলা হইল।

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার)

(১)

উদ্ধবকে সন্ন্যাসের অনুমতি।

যদুকুল ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত হইলে শাপবিমোচনের জন্য যদুগণ প্রভাস-তীর্থ-যাত্রা সঙ্কল্প করেন। ভগবানের প্রভাস যাত্রার উদ্‌যোগ দেখিয়া উদ্ধব বুঝিলেন, ভগবান্ এইবার অন্তর্দ্ধান হইবেন।

উদ্ধব ভগবানকে একান্তে পাইয়া বলিলেন, বিপ্রশাপের প্রতি-বিধান করিতে সমর্থ হইয়াও যখন আপনি প্রতিবিধান করিলেন না, তখন আমার বোধ হইতেছে আপনি যদুকুল সংহার করিয়া এইবার অন্তর্দ্ধান হইবেন।

নাহং তবাঙ্ঘ্রি কমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধামনয়মামপি॥

হে কেশব! আমি তোমার পাদপদ্ম ক্ষণার্দ্ধও ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। আমি তোমার ভক্ত, আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। ভাবিও না, মায়ার ভয়ে আমি এ কথা বলিতেছি—

উচ্ছিষ্টভোজিনঃ দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি—আমি তোমার উচ্ছিষ্ট-ভোজী দাস আমি মায়াকে নিশ্চয় জয় করিয়াছি।

ভগবান্ বলিলেন,—হাঁ আমি এইবার অন্তর্দ্ধান হইব। আমি চলিয়া যাইবা মাত্র কলির অধিকার হইবে।

ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্বিচরস্ব গাম্॥

তুমি স্বজন বন্ধুতে স্নেহ ত্যাগ করিয়া আমাতে সম্পূর্ণরূপে মন আবিষ্ট করিয়া সমদৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ কর।

উদ্ধব বুঝিলেন ভগবান্ সন্ন্যাস লইতে অনুমতি করিতেছেন। উদ্ধব বলিলেন,—

ত্যাগোঽয়ং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ।

বিষয়-চিত্ত লোকের কাম ত্যাগ করা বড়ই দুষ্কর। তবে তুমি "যোগেশ" অর্থাৎ অচিন্ত্য শক্তির আধার তুমি যদি শক্তি দাও তবেই সন্ন্যাস লইতে পারগ হইব। তৎপরে উদ্ধব ভগবানকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিলেন। এবং বলিলেন "অনুশাধি ভৃত্যম্"—এই ভৃত্যকে শিক্ষা দিন।

(২)

অবধূতের ২৪টি গুরু।

ভগবান্ বলিলেন হাঁ জ্ঞানদ গুরু এক বটে এবং গুরুকরণ আবশ্যক কিন্তু ইহা জানা উচিত প্রধান গুরু নিজ বুদ্ধি বা মন। "আত্মনো গুরুরাত্মৈব" আত্মা আত্মার গুরু—অর্থাৎ নিজেই নিজের গুরু হইতে হয়। তাহার পর ভগবান্ এই প্রসঙ্গে অবধূত শ্রীশ্রীদত্তাত্রেয়ের ইতিহাস বলিলেন। দত্তাত্রেয়ের ২৪টী গুরু ছিল। উপদেশ মত সব গুরু তিনি অবলম্বন করেন নাই কিন্তু নিজ বুদ্ধিমত গুরু অবলম্বন করিয়াছিলেন।

২৪টী গুরু—(১) পৃথিবী (২) বায়ু (৩) আকাশ (৪) জল (৫) অগ্নি (৬) চন্দ্র (৭) রবি (৮) কপোত (৯) অজগর (১০) অর্ণব (১১) পতঙ্গ (১২) মধুকর (১৩) করী (১৪) মধুহা (১৫) হরিণ (১৬) মীন (১৭) পিঙ্গলা (১৮) কুরর (চিল) (১৯) বালক (২০) কুমারী (২১) শরনির্ম্মাতা (২২) সর্প (২৩) ঊর্ণনাভ (২৪) সুপেশকৃৎ (কুমুরে পোকা)।

(১) পৃথিবী গুরু। পৃথিবীর নিকট ক্ষমা শিখিবে। কেহ আক্রমণ করিলেও ক্ষমা হইতে বিচলিত হইবে না।

(২) বায়ু গুরু। বায়ু যেরূপ গন্ধ দ্বারা লিপ্ত হয় না সেইরূপ মুনি দেহের ভাল মন্দে লিপ্ত হইবে না।

(৩) আকাশ গুরু। আকাশ মেঘাদি পদার্থের সহিত সংস্পৃষ্ট

হইলেও কিছুতেই যেরূপ লিপ্ত হয় না, মুনিও আকাশের ন্যায় অসঙ্গ হইবে।

(৪) জল গুরু। জল যেরূপ মধুর, স্বচ্ছ ও পবিত্রকারী মুনি সেইরূপ সকলের তীর্থ স্বরূপ হইবে।

(৫) অগ্নি গুরু। অগ্নি যেরূপ জলদাহক মুনি সেইরূপ শ্রেয়াভিলাষী মানুষের মন-দাহক হইবে।

(৬) চন্দ্র গুরু। চন্দ্রের কলায় হ্রাস বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বস্তুতঃ চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ দেহের জন্ম ও নাশ হয়, আত্মার জন্মও নাশ হয় না।

(৭) রবি গুরু। সূর্য্য যেরূপ জল আকর্ষণ করিয়া পুনরায় পৃথিবীকেই দান করেন, মুনিও সেইরূপ হইবে।

(৮) কপোত গুরু। কপোত-শাবক ব্যাধ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে কপোত কপোতী স্নেহাতিশয্য হেতু স্বয়ং জালে গিয়া পড়ে এবং ব্যাধ কর্ত্তৃক ধৃত হয়! সেই জন্য,—

নাতি স্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ।

কোথায় কাহাকেও অতিস্নেহ বা উপলালনাদি করিবে না।

(৯) অর্ণব গুরু। মুনি অর্ণবের ন্যায় প্রসন্ন, গম্ভীর, দুর্বিগ্রাহ্য ও দুরত্যয় হইবে।

(১০) অজগর গুরু। অজগর যেরূপ আহারের চেষ্টা করে না—মুনি সেইরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

(১১) পতঙ্গ গুরু। পতঙ্গ যেরূপ অগ্নিতে মুগ্ধ হইয়া পুড়িয়া মরে সেইরূপ মানব যোষিৎ ও হিরণ্যাভরণে মুগ্ধ হইলে নষ্ট হইবে।

(১২) মধুকর গুরু। মধুকর যেরূপ নানা ফুল হইতে মধু গ্রহণ করে, সেইরূপ মুনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিবে। মক্ষিকারা সঞ্চয় করিলে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সঞ্চয় মুনির নাশের হেতু।

(১৩) করী গুরু। করীকে করিণী দেখাইয়া গর্ত্তে ফেলা হয়। সেইরূপ যুবতী স্পর্শে মৃত্যু হইবেই হইবে। এমন কি দারুময়ী যুবতীকে পদের দ্বারাও স্পর্শ করিবে না।

(১৪) মধুহা গুরু। মধুহা যেরূপ সঞ্চিত মধু হরণ করে, যতি সেইরূপ কল্যাণেচ্ছু হইয়া গৃহস্থের দুঃখোপার্জ্জিত অন্ন গ্রহণ করিবে।

(১৫) হরিণ গুরু। গ্রাম্য নৃত্যবাদিত্রগীত সেবা করিবে না। করিলে হরিণের ন্যায বদ্ধ হইবে—ব্যাধ বাঁশী বাজাইয়া হরিণ ধরে।

(১৬) মীন গুরু। রসজয় না করিলে জিতেন্দ্রিয হওয়া যায় না। আমিষযুক্ত বড়িশ দ্বারা মৎস্য ধৃত হয়। রস জয় না করিলে মৃত্যু ঘটে।

জিতং সর্ব্বং জিতে রসে।

রসনেন্দ্রিয জয় করিলে সব ইন্দ্রিয জয় করা হয।

(১৭) পিঙ্গলা গুরু। এক দিন পিঙ্গলা বেশ্যা নাগরের আশায় বেশভূষা করিযা ঘরের দ্বারে দাঁড়াইল। পথে মানুষ দেখিলেই ভাবে যে অর্থপ্রদ নাগর আসিতেছে, কিন্তু সে রাত্রে কেহ আসিল না। সে একবার ঘরে ঢোকে একবার বাহিরে আসে। এইরূপ দুরাশায অর্দ্ধরাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পর বিরক্ত হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল ও নিদ্রা যাইল।

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।

আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্যই পরম সুখ।

(১৮) কুরর গুরু। কুরর (চিল) একটু মাংস মুখে করিলে অপর পক্ষীরা তাহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে—সে মাংস ফেলিয়া দিলে তবে নিশ্চন্ত হয়। পরিগ্রহ দুঃখের কারণ।

(১৯) বালক গুরু। বালক যেরূপ চিন্তামুক্ত সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞ মুনি চিন্তামুক্ত হইবে।

(২০) কুমারী গুরু। এক কুমারীর হাতে কয়েকগাছি কঙ্কণ ছিল। কুমারী ধান্য কুটিতে ছিল। হাতে কঙ্কণ থাকা হেতু শব্দ হইতেছিল। তাহাতে বাহিরের লোকে বুঝিতে পারিতেছিল যে কুমারী ধান্য কুটিতেছে। কুমারী দুগাছি রাখিয়া অবশিষ্ট চুড়ি খুলিল।

তাহাতেও শব্দ হইতে লাগিল; পরে একগাছি রাখিয়া সব খুলিয়া ফেলিল। আর শব্দ হইল না।

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি এক এব বসেত্তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণঃ।

বহুজন একত্র বাস করিলে কলহ হয়, দুইজন একত্র থাকিলেও কথাবার্ত্তা হয়। অতএব মুনি একাকী ভ্রমণ করিবে, যেরূপ কুমারীর কঙ্কণ।

(২১) শরনির্ম্মাতা। শরনির্ম্মাতা যখন এক মনে শর সরল করে তখন সম্মুখ দিয়া ভেরীঘোষ সহিত রাজা যাইলেও টের পায় না।

(২২) সর্প গুরু। সর্প যেরূপ পরের গৃহে বাস করে, মুনি সেই-রূপ পরনির্ম্মিত গৃহে বাস করিবে।

(২৩) ঊর্ণনাভি গুরু। ঊর্ণনাভি (মাকড়সা) যেরূপে নিজের মুখ হইতে জাল নির্ম্মাণ করে ও সেই জালে বিহার করে, আবার জাল গ্রাস করে, পরমেশ্বরও সেইরূপ নিজ হইতে জগৎ সৃজন করেন, পালন করেন, সংহার করেন।

(২৪) কুমুরে পোকা গুরু। আরসোলা যেরূপ ভযে কুমুরে পোকার আকার প্রাপ্ত হয় সেইরূপ স্নেহ, দ্বেষ ও ভয় হেতু যাহার চিন্তা করা যায়, তাহারই আকাব প্রাপ্ত হইতে হয়।

অবধূতের এই চব্বিশটি গুরু ছাড়া আর একটি গুরু ছিলেন—নিজ দেহ। এই গুরুটি বড় বিচিত্র চরিত্র। এই গুরুকে ভাল রকম সেবা করলে ইনি অধঃপাতিত করেন কিন্তু ইহাকে মাত্র প্রাণ ধারণের উপযোগী ভোগ দিলে ইনি জ্ঞান বৈরাগ্য দেন।

(৩)

গুরুকরণ।

তাহার পর ভগবান্ বুঝাইলেন,

মদভিজ্ঞং গুরু শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্।

আত্মতত্ত্ব লাভের জন্য গুরুকরণ প্রয়োজন কিন্তু গুরু যেন ব্রহ্মজ্ঞ ও সমতাগুণ প্রাপ্ত হন। গুরুকে মৎস্বরূপ জ্ঞানে উপাসনা করিবে।

(৪)

আত্মার স্বরূপ।

বিলক্ষণঃ স্থূল সূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ॥

স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে আত্মা বিলক্ষণ। আত্মা দ্রষ্টা—স্বপ্রকাশ। যেরূপ দারু দাহ্য ও অগ্নি দাহক সেইরূপ দেহ প্রকাশ্য, আত্মা প্রকাশক। দেহ জড়, আত্মা চৈতন্য।

কেহ কেহ বলেন, আত্মা কর্ম্ম করেন ও সুখ দুঃখ ভোগ করেন। ভগবানের মতে আত্মা কর্ম্ম ভোগ করেন না, সুখদুঃখও ভোগ করেন না।

গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ॥

ইন্দ্রিয় কর্ম্ম করে। সত্ত্ব রজ তম গুণ ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে। জীব ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলে কর্ম্মফল ভোগ করে। ইন্দ্রিয়াদিতে অভিমান হইলে জীবের ইন্দ্রিয়সংযোগ বলা যায়। ভগবানের মতে আত্মা কর্ত্তা নহেন বা ভোক্তা নহেন কিন্তু আত্মা দ্রষ্টা সাক্ষী।

(৫)

আত্মার বন্ধ নাই—মোক্ষ নাই।

উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, আত্মা একস্বভাব, বদ্ধ ও মুক্ত হইলেন কিরূপে?

ভগবান্ বলিলেন—

বদ্ধমুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়া মূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥

[ঠাকুর বলিতেন, মনেই বদ্ধ—মনেই মুক্ত]

"বদ্ধ" ও "মুক্ত" (মনের) উপাধিহেতু বলা যায়, বস্তুতঃ নহে। (মনের) উপাধি মায়িক, অতএব আত্মার মোক্ষও নাই বন্ধও নাই। ইহাই আমার সিদ্ধান্ত।

(৬)

বদ্ধ ও মুক্তের লক্ষণ।

তৎপরে ভগবান্ বদ্ধ ও মুক্তের লক্ষণ বলিলেন—

যে নিজেকে সুখদুঃখের ভোক্তা মনে করে, সে বদ্ধ। যে নিজেকে কেবল দ্রষ্টা দেখে সে মুক্ত। মুক্ত দেহস্থ হইয়াও জানেন, তিনি দেহস্থ নন। বদ্ধ দেহস্থ না হইয়াই ভাবে, সে দেহস্থ। মুক্ত শরীরে থাকিয়াও ভাবেন তিনি কর্ত্তা নন—বদ্ধ জানে আমি কর্ত্তা।

ভারতীয় শিক্ষা।

হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ

Buddhism must be right! Re-incarnation is only a mirage! But this vision is to be reached, by the path of Advaita alone!

—Vivekananda.

পূর্ব্ব প্রবন্ধে ও 'বৈদিক ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম' নামক প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মেরই একটি শাখামাত্র এবং বুদ্ধদেব হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য কিছুই ছিলেন না। তবে বিষয়টি যেরূপ গূঢ় তাহাতে উহা আর একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা নামক বৌদ্ধগ্রন্থান্তর্গত জীমূতবাহনাবদানাদি পাঠে বেশ বুঝা যায় যে ভগবান্ বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত "ধর্ম্ম" সনাতন আর্য্য ধর্ম্মেরই একটি সুপ্রশস্ত নির্ব্বাণ-লাভোপযোগী ধর্ম্মমার্গ মাত্র। ভগবান্ বুদ্ধই পূর্ব্ব জন্মে জীমূতবাহন রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি

যে পৌরাণিক দেবদেবীর উপাসনার বিরোধী ছিলেন না তাহা ঐ গল্পপাঠে বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। মলয়বতীর গৌরীপূজা এবং শঙ্কর কৃপায় সুধাসেকের দ্বারা জীমূতবাহনের পুনর্জ্জীবন লাভ, তাঁহার পরম সাত্ত্বিকভাব দর্শনে তুষ্ট হইয়া স্বহস্তে দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক তাঁহার অভিষেক এবং প্রচুর ধনরত্ন দান প্রভৃতি কথা প্রস্তাবিত বিষয়েরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

গ্রন্থান্তরে 'বিশাখা' চরিত্র পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বৌদ্ধ বলিতে ইদানীং আমাদের হৃদয়ে যে এক বিজাতীয় ভাবের উদয় হয় তখন তাহার কিছুমাত্র ছিল না, উপরন্তু কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ সকলেই তথাগতের বাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধে বিবাহাদি কার্য্য চলিত এবং সকলে পুরাতন প্রথারই অনুসরণ করিতেন। আমরা দেখিতে পাই বিশাখার পিতা বৌদ্ধমাতাবলম্বী ছিলেন বটে কিন্তু তাহা বলিয়া যে তিনি কোনও নূতন আচার-পদ্ধতি মানিয়া চলিতেন তাহা নহে উপরন্তু তিনি নিজ কন্যাকে হিন্দুর ঘরেই সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীবুদ্ধ নির্ব্বাণকেই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেন এবং জ্ঞান-লাভের পূর্ব্বে সকলকে চিত্তশুদ্ধির জন্য দান, প্রজ্ঞা, ক্ষমা, শীল, বীর্য্য ও সমাধি প্রভৃতি পারমিতা বিষয়ে উপদেশ করিতেন। তাঁহার দর্শন যে শুধু সাংখ্য দর্শনের 'ত্রিতাপ' এবং 'প্রমাণাভাব বলিয়া ঈশ্বর-বস্তু সিদ্ধ হয় না' প্রভৃতি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন নহে, উহার অন্তস্থলে পূর্ব্ব মীমাংসা, বৈশেষিক এবং ন্যায়-দর্শনের গুপ্ত নিরীশ্বর-বাদ যে ক্রীড়া করে তাহা স্পষ্ট অনুমিত হয়। আমরা ঈশ্বর বলিতে যাহা বুঝি তাহা ঐ দর্শনত্রয়ের মধ্যে কোথায় আছে? কেবলমাত্র শব্দই যদি ব্রহ্ম হয় বা মন্ত্রই যদি দেবতা হয় তাহা হইলে ইদানীং আমরা ভগবান্ বলিতে যাহা বুঝি তাহার স্থান মীমাংসা-দর্শনে কোথায়? হস্তী চড়িয়া ইন্দ্রদেবতা ঘটের উপর অধিষ্ঠিত হইলে ঘট ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা ইত্যাদি যাহাদের প্রমাণ তাহাদের তুলনায় বৌদ্ধেরা ত যথেষ্ট আস্তিক। টীকাকারেরা যদি আত্মা বলিতে

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এই দুই অর্থ টানিয়া বাহির না করিতেন তাহা হইলে জড়াত্মার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না। কিম্বা বৈশেষিক বা ন্যায় দর্শনের মধ্য দিয়া জীব জগৎ বুঝিতে, অন্ততঃ কনাদ ও গৌতমের কোনও বিপর্য্যয় উপস্থিত হইত না। বৈশেষিক এবং ন্যায় দর্শনের পদার্থগুলি যদি মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে জীব জগৎ বুঝিতে ঈশ্বর নিষ্প্রয়োজন। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন বৌদ্ধ দর্শনের মধ্য দিয়া বেদান্ত দর্শনের চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হয়। কিন্তু যদি কেহ বলেন যে ব্রহ্মসূত্র বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছে কারণ উহা বেদব্যাস প্রণীত এবং গীতাতেও উহার উল্লেখ আছে—তাহা হইলে আমাদিগকে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে ঐ দর্শন-সূত্র কখনই সকলের পরিচিত ছিল না, উপনিষদের ন্যায উহা অরণ্যেই লুক্কাইত ছিল। আচার্য্য শঙ্করই উহার প্রথম ভাষ্য করেন এবং শ্রীবুদ্ধকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার শিষ্যেরা যে অবৈদিক মতসমূহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা খণ্ডন করিযা ভগবান্ দত্তাত্রেয় এবং শ্রীবুদ্ধের "শূন্যম" এবং "গম্ভীর" কেই "পূর্ণম্" বা "সৎ" ব লয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লোকসমাজে বেদান্তসূত্র, ন্যায় ও সাংখ্যের ন্যায় প্রচলিত ছিল না। ভারতীয় দার্শনধারা ন্যায় ও সাংখ্যের মধ্য দিয়া বৌদ্ধ দর্শনে পর্য্যবেসিত হইয়াছিল। ব্রহ্মসূত্র বৌদ্ধদর্শনের পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইলেও ভারতীয় ধারাবাহিক দর্শনের সহিত ইহার প্রথম মিলন শারীরক ভাষ্যের সময় অর্থাৎ ন্যায় ও সাংখ্য দর্শন যেমন বৌদ্ধধর্ম্মে পর্য্যবেসিত হয়, সেইরূপ আবার বৌদ্ধ দর্শনও শঙ্করের অদ্বৈতবাদে পরিসমাপ্ত হইয়া পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু কাহারও কাহারও মতে বেদান্ত দর্শনের কোন কোন সূত্রে (বেদান্তসূত্র ২ অ, ২ পা, ২৮, ২৯ ও ৩০ সূ ইত্যাদি) বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাষ্যকারেরা ও টীকাকারেরাও তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনেরও কোন কোন স্থলে (ন্যায় সূত্র—৪অ, ১৪ সূ ইত্যাদি) শূন্যবাদ দেখা যায়। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ বা পঞ্চম

শতাব্দীতে প্রবর্ত্তিত হয়। নাগার্জ্জুন প্রবর্ত্তিত মাধ্যমিক নামক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়েই শূন্যবাদটি পরিস্ফুট দেখা যায়। নাগার্জ্জুন, মহাযান বৌদ্ধদিগের মতে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর চারিশত বৎসর পরে এবং হীনযান বৌদ্ধদিগের মতে ঐ ঘটনার পাঁচ শত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। পালি গ্রন্থানুসারে শাক্যমুনি খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করেন। সেই অনুযায়ী নাগার্জ্জুন খ্রীষ্টাব্দের ১৪৪ অথবা কেবল ৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ম্যাক্সমূলারের মতে বুদ্ধদেব খৃষ্টাব্দের ৪৭৭ বৎসর পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করেন। তাহা হইলে নাগার্জ্জুন ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত শূন্যবাদ এবং ন্যায় ও বেদান্তসূত্রের উল্লিখিত স্থল-সমুদয়কে খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত মত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অশ্বঘোষ হইতে মহাযান সম্প্রদায় আরম্ভ হয়। এই সময়ে "অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় বৌদ্ধদিগেরও মতান্তর ঘটিয়া ক্রমে ক্রমে চারিটি দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে; মাধ্যমিক যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিক মতে (নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রচারিত) কোন পদার্থই বাস্তবিক বিদ্যমান নাই; সকলই শূন্যময়। যোগাচার (অসঙ্গ কর্ত্তৃক প্রচারিত) মতও ইহার অনুরূপ; এই মতস্থ ব্যক্তিরা অভ্যন্তরস্থ বিজ্ঞান ব্যতিরেকে অপরাপর সমুদয় পদার্থেরই অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে কেবল বিজ্ঞানই আছে; জল, বায়ু, পৃথিব্যাদি বাহ্য বস্তু কিছুই নাই। ইঁহারা ঐ বিজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন; প্রকৃতি বিজ্ঞান ও আলয় বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান জন্মায় তাহাকে প্রকৃতি বিজ্ঞান বলে ও সুষুপ্তি দশায় যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম আলয় বিজ্ঞান। অপর দুই সম্প্রদায়ীরা বাহ্য পদার্থ ও অভ্যন্তরস্থ পদার্থ উভয়েরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। বাহ্য পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত; ভূত ও ভৌতিক। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু এই চারিটির নাম ভূত এবং চক্ষু শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নদী, পর্ব্বতাদি বিষয় সমুদয়ের নাম ভৌতিক। সমুদয়ই সেই পরমাণু সমষ্টি। এই জগৎ ও জগতের সমুদয় পদার্থই পরমাণুপুঞ্জ বই আর কিছুই নয়।

শেষোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মতে পরস্পর কিছু বিশেষ আছে। এক সম্প্রদায়ীরা বলেন, বাহ্যবস্তু সমুদয় কেবল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাঁহাদের নামে বৈভাষিক। অপর সম্প্রদায়ীরা বলেন বাহ্য বস্তু সত্য বটে, কিন্তু অনুমান সিদ্ধ; একেবারেই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না। চিত্ত-মধ্যে বাহ্য বস্তু সমুদয়ের প্রতিরূপ উৎপন্ন হয়, এবং সেই প্রতিরূপ-জ্ঞান দ্বারাই তাহাদের জ্ঞান জন্মে। এই সম্প্রদায়ের নাম সৌত্রান্তিক। উভয় মতেই যে সময়ে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, সেই সময়েই তাহার অস্তিত্ব থাকে। প্রত্যক্ষ না হইলেই বিদ্যুল্লতার ন্যায় ধ্বংস হইয়া যায়। এই নিমিত্ত হিন্দু পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে পূর্ণ-বৈনাশিক অথবা সর্ব্ব-বৈনাশিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা হিন্দু বৈদান্তিকের ন্যায় আকাশকে একটি ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং চিত্ত ও জীবাত্মা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করেন না।"* শ্রীশঙ্কর এই সকল মত খণ্ডন করিয়াছেন।

যাহা হউক বেদান্ত ও ন্যায়-সূত্রের কিয়দংশ আধুনিক বলিয়া স্বীকার করিলেও আমাদের অভিলষিত নিগমনের কোন প্রকার অন্তরায় উপস্থিত হয় না। এইবার বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিয়া আলোচনা করিব। জগতের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে কনাদ তাঁহার নিজ দর্শন সূত্রে পরম পদার্থ পরমেশ্বরের নাম মাত্র করেন নাই। আস্তিক মাত্রেরই স্বীকৃত যে পরমেশ্বরের নাম, তাহা স্পষ্ট করিয়া কোথায়ও ব্যক্ত করেন নাই। বৈশেষিকের ভাষ্য ও টীকাকারেরা দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত 'আত্মা' শব্দের দুই প্রকার অর্থ করেন; 'জীবাত্মা' ও 'পরমাত্মা'। একটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে—শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় সূত্রান্তর্গত 'তৎ' শব্দের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখুন,—

তদিত্যনুপক্রান্তমপি প্রসিদ্ধি সিদ্ধতয়েশ্বরং পরামৃশতি ॥

"'তৎ' শব্দের অর্থ 'ঈশ্বর' ইহা প্রসিদ্ধিই আছে, অতএব পূর্ব্বে সূচনা না থাকিলেও, এস্থলে উহা ঈশ্বর-বাচক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।"

* Colebrooke's Miscellaneous Essays Vol. I 1873, pp. 413—425

কিন্তু পূর্ব্ব সূত্রে যখন ধর্ম্মের প্রসঙ্গ আছে, তখন ঐ "তৎ" শব্দের অর্থ ধর্ম্মই বলিতে হইবে। এখন উভয় সূত্র উদ্ধৃত করিয়া তুলনা করিয়া দেখিলেই পাঠক সূত্রকারের কি অভিপ্রায় তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ॥

১অ, ১ আ, ২ সূ॥

"যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম ধর্ম্ম।"

তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"। ১অ, ১ আ, ৩সূ॥

"বেদে তদ্বচন অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষয়ক বচন আছে বলিয়া, বেদ প্রামাণিক।"

কিন্তু জগতের কারণ নির্দ্ধারণ করা দর্শন-শাস্ত্রের যখন একটি প্রধান প্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশ্ব-কারণ বলিয়া তিনি স্থির জানিতেন, তাহা হইলে সে বিষয়ের বিশেষ ভাবে বিবৃতি তিনি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিম্বা সমালোচকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় "যাঁহার যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচলিত ভক্তি থাকে, সুযোগ ও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তিনি তাহা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেবল ঈশ্বরের নাম ত অল্প কথা; তাঁহারা 'গোপবধূটীদুকূল চৌরায়' ও অন্য অন্য বিশেষণে বিশেষিত কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ষষ্ঠী, পঞ্চানন প্রভৃতি কত কত দেবতার পদ-যুগলে প্রণিপাত করিয়া গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সম্পাদন করিতে পারিতেন।"

আবার দেখিতে পাওয়া যায় ন্যায় দর্শনে দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর পদার্থটির উল্লেখ নাই। ঠিক বৈশেষিকের ন্যায় ন্যায়ের টীকা এবং ভাষ্যকারেরা উহার অন্তর্গত আত্মা শব্দটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ার্থ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি বিশ্ব কারণ নিরূপণ করিতে যাইয়া একটি প্রধান প্রয়োজন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমেয় পদার্থের বিশেষ ভাবে উল্লেখ না দেখিলে লোকের মনে কিরূপ সন্দেহ আসিয়া অধিকার করে।

কেবল একটি সূত্রে ঈশ্বরকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াই তৎক্ষণাৎ পরসূত্রেই আবার মনুষ্যকৃত কর্ম্মকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখন ঐ উভয় সূত্র পাশাপাশি সন্নিবেশিত করিলেই বিষয়টি পাঠকের বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রথম সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ এবং পর সূত্রটি সিদ্ধান্ত। পূর্ব্বপক্ষ,—

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ

ন্যায় সূত্রে। ৪অ, ১৯ সূ ॥

"ঈশ্বর কারণ ; কেন না মনুষ্যকৃত কর্ম্ম সর্ব্বদা সফল হয় না।"

সিদ্ধান্তপক্ষ,—

ন, পুরুষ কর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ।

ন্যায়সূত্রে। ৪অ, ২০ সূ ॥

"না, তাহা নয়। মনুষ্যকৃত কর্ম্ম ব্যতিরেকে ফলোৎপত্তি হয় না।"

গোতম অন্য সূত্রে লিখিয়াছেন,—

পূর্ব্বকৃত ফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ। ৩।১৩২ ॥

"পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফলে জীবের শরীরোৎপত্তি হয়।" বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপরোক্ত দুই সূত্রের টীকায় ঈশ্বর ও পুরুষ উভয়কেই জগত কারণ বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু এ ঈশ্বরের কতটুকু মূল্য ?—যিনি পরমাণু প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের স্রষ্টা নন, জীবের পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মের সাহায্য ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন না ? ফলতঃ উভয় সূত্রের কেবল সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে, গোতমকে নিরীশ্বর বলিয়াই বোধ হয়। শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্ত বাগীশ মহাশয় তাঁহার ন্যায় দর্শনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"গোতমের গ্রন্থে ঈশ্বর প্রতিপাদক কোন সূত্র নাই। ঈশ্বর উপাস্য কি বিজ্ঞেয়, তাহা গোতমের দর্শনে বিচারিত হয় নাই। এতদীয় দর্শনের প্রথমেই প্রতিজ্ঞাসূত্র, তন্মধ্যে প্রমেয় প্রভৃতি ষোলটি পদার্থের উল্লেখ আছে ; পরন্তু ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। প্রমেয় বিভাগে যে আত্মার উল্লেখ আছে, লক্ষণ ও পরীক্ষাসূত্র দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয়, সে কথা জীবাত্মপর। গোতমের মতে জীবাত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষপ্রদ।

ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মোক্ষপ্রদ কি না, তাহা গৌতমের গ্রন্থদ্বারা জানা যায় না। তবে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় বটে, পরন্তু সে উল্লেখ উল্লেখ মাত্র। সে উল্লেখ কেবল পরমত খণ্ডনের জন্য, স্বমত বিধানের জন্য নহে।"

কপিল, গৌতম এবং কনাদের দর্শনাদি পাঠ করিয়া এবং অপর-দিকে বেদ সকলেরই পরমশিরধার্য্য বস্তু দেখিয়া, অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা মনে করে যে এই সকল দার্শনিকেরা বেদ-বস্ত্র আবরণে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু আমাদের মনে হয় বেদই বল, দর্শনই বল, পুরাণতন্ত্রই বল, সকলই ভারতীয় মনীষীদিগের গভীর চিন্তা-সমুদ্রের মুক্তাস্বরূপ। তবে সে অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগর হইতে সকল ধর্ম্ম-রাজ্যের ডুবুরীই যে সকল রত্নের সন্ধান পাইয়া উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—এমত নহে। যিনি যতটুকু পাইয়াছেন তিনি ততটুকু জগৎ সমক্ষে ছড়াইয়া দিয়াছেন। এখন দেখা যায়, বৈদিক, অবৈদিক, নাস্তিক, আস্তিক সকল শাস্ত্রেই কতকগুলি বিষয় সকলেই মানিয়াছেন যথা—কর্ম্ম-ফলে জন্মগ্রহণ ও নানাবিধ যোনি ভ্রমণ হয়; জন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়; জীব নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে নানাপ্রকার নরক ও সুখসম্পদ প্রভৃতি দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; জন্মগ্রহণ নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি লাভই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়; এবং মুক্তি বা পরমপুরুষার্থ জ্ঞানোদয় হইলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীবুদ্ধ ঈশ্বর মানিতেন না ইহা মানিয়া লইলেও তিনি উল্লিখিত বিষয়গুলি যে মানিতেন ইহা একেবারে সুনিশ্চিত জ্ঞানাচার্য্য কপিল এবং তদনুচরেরা যদি ঈশ্বর না মানিয়াও হিন্দু বলিয়া পরিচিত এবং দেবতা-জ্ঞানে পূজিত হইতে পারেন তখন শ্রীবুদ্ধের ও তাঁহার ধর্ম্মের, সর্ব্ব-ধর্ম্মাশ্রয় বেদান্ত-ধর্ম্মে এবং হিন্দু সমাজে স্থান নির্দ্দেশ কেন না হইবে?

পূর্ব্বমীমাংসা পাঠ করিয়া শ্রীজৈমিনি কিরূপ ঈশ্বর এবং কিরূপ দেবতা মানিতেন তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে ঠিক ঠিক বোধগম্য হয় না। বিশেষতঃ প্রাচীন ভাষ্য ও টীকাকারেরা, আমরা ঈশ্বর বলিতে যাহা

বুঝি তাহা যেন এক প্রকার অস্বীকারই করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চম সূত্রের ভাষ্যে বেদ পৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণীত কি না, তাহা বিচার করিবার জন্য শবরস্বামী বৃত্তিকারের অভিপ্রায় বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেছেন,—

'অপৌরুষেয়ঃ এষঃ সম্বন্ধঃ' ইতি পুরুষস্য সম্বন্ধাভাবাৎ।

কথং সম্বন্ধোনাস্তি। পত্যক্ষস্য প্রমাণস্যাভাবাৎ তৎপূর্ব্বকত্বাচ্চেতরেষাম্।

"এই শব্দার্থের সম্বন্ধ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত নয়। কেন না ঐরূপ সম্বন্ধকারী পুরুষ বিদ্যমান নাই। যদি বল সম্বন্ধকারী পুরুষ বিদ্যমান নাই কেন? তাহার উত্তর এই যে সে বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে, অন্যান্য প্রমাণেরও সম্ভাবনা থাকে না।" সর্ব্বশেষে এই দর্শনের মতে যাবতীয় দেবতা মন্ত্রস্বরূপ, শরীর বিশিষ্ট নয়। কেন না যদি ইন্দ্রদেব যজমানের আহ্বানে ঘটে অধিষ্ঠিত হইতেন, তাহা হইলে ঐরাবতের ভারে ঘট ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইত।

এই সকল হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শন একদিনে হঠাৎ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা হিন্দুর বহুকাল ধ্যানপরায়ণতার ফল স্বরূপ। কত মীমাংসা, কত সাংখ্য, "কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূত, যোনি, পুরুষ বা ইহাদের সংযোগ" প্রভৃতি বিশ্ব কারণ, কত ঋষি কত যুগ-যুগ ব্যাপী ধ্যানের দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পরে সকল ভারতীয় চিন্তার সার্থকতা করিতে ৺ভগবান্ উপনিষদ্-খনি প্রাপ্ত সুবর্ণ নির্ম্মিত শূন্যবাদের মুকুট পরিয়া আসিলেন এবং নাগার্জ্জুন, অসঙ্গ প্রভৃতি সে মুকুটে নানা রত্ন খচিত করিয়া দিলেন, কিন্তু শ্রীশঙ্কর তাহাতে অদ্বৈত কোহিনুর সংযুক্ত করিয়া সে মুকুটের সমধিক শোভা বর্দ্ধন করিলেন।

এখন শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীশঙ্করের মতে প্রভেদ কি? শ্রীবুদ্ধ কেবলমাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম ও নির্ব্বাণ মানিতেন, কিন্তু শ্রীশঙ্কর নির্গুণ ব্রহ্ম ও নির্ব্বাণ ত মানিতেনই তাহা ছাড়া সগুণ ব্রহ্ম ও লীলাও মানিতেন এবং উভয়

মার্গই মুক্তি লাভের উপায় ইহাও স্বীকার করিতেন। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যখন জীব, জগৎ ঈশ্বর কিছুই থাকে না তখন সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রয়োজন কি?—ইহাই বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন। বুদ্ধদেব যে ঈশ্বর মানিতেন না এরূপ নহে। কারণ, তাঁহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "মহাশয়! ঈশ্বর আছেন?" তিনি বলিতেন, "আমি কি বলিয়াছি আছেন?" পুনশ্চ যদি জিজ্ঞাসা করিত "মহাশয় তবে কি ঈশ্বর নাই?" তিনি বলিতেন, "আমি কি বলিয়াছি নাই"। ঈশ্বর-প্রশ্ন প্রসঙ্গে আবার হয় ত বলিতেন "বৃক্ষ হইতে পাতা লইয়া আইস।" যদি কেহ একটি পাতা লইয়া আসিত তখন তিনি বলিতেন যে বৃক্ষে কি মাত্র একটি পাতা আছে? সেইরূপ অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের সকল খবর আমি কি প্রচার করিয়াছি? বুদ্ধদেব ঈশ্বর মানিতেন বটে কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানপথাবলম্বী ছিলেন বলিয়া তাহার প্রয়োজন বোধ করিতেন না।

আর একটি প্রশ্ন এই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। যদি শ্রীবুদ্ধ হিন্দু সমাজের অন্তর্গত সন্ন্যাসীই ছিলেন এবং হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য তথা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি সকলই প্রচলিত ছিল এবং তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণকেই শ্রেষ্ঠাসন দিতেন তবে তিনি স্ত্রী ও শূদ্রকে সন্ন্যাসের অধিকারী করিলেন কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলি—কারণ তিনি উপনিষদের শেষ ঋষি—ব্যাকরণের তীক্ষ্ণ খড়্গে "শূদ্রকে" ছেদ করিয়া তাহার মোক্ষ পথ অবরুদ্ধ করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ শব্দে বেদান্তের ঋষিরা কি বুঝিতেন তাহা একবার বজ্রসূচিকোপনিষদের আলোচনার দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

ঋষি বলিতেছেন,—

ওঁ বজ্রসূচীং প্রবক্ষ্যামি—বজ্রসূচী উপনিষদ্ বলিব।

বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি—বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ।

বেদবচনানুরূপং—কারণ ইহা বেদবচনানুরূপ।

কো বা ব্রাহ্মণো নাম—ব্রাহ্মণ এই নাম কাহার?

জীবো ব্রাহ্মণ ইতি—জীবই কি ব্রাহ্মণ ?

ন—না।

অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ—

অতীত এবং অনাগত চাণ্ডালাদি বহুবিধ দেহ জীব ধারণ করিয়াছে এবং করিবে, কিন্তু সকল দেহতেই জীব একই প্রকার থাকে।

কর্ম্মবশাদনেকদেহ সম্ভবাৎ

কারণ পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফল হেতু তাহাকে নানা দেহ ধারণ করিতে হয়

তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি—তাহা হইলে দেহই ব্রাহ্মণ ?

ন—না।

পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাৎ—

কারণ সকল দেহই একই প্রকারের পঞ্চভূত নির্ম্মিত।

জরা মরণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সাম্যদর্শনাৎ—

এবং জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি গুণ বিকার সকল দেহতেই সমান।

ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ
শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণঃ ইতি—

শাস্ত্রে যে বলিতেছেন ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ।

নিয়মাভাবাৎ—কিন্তু বাস্তবিক এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

পিত্রাদি শরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদি দোষসম্ভবাৎ।

দেহই যদি ব্রাহ্মণ হয় তাহা হইলে পিতার মৃত্যুর পর পুত্র যদি সে দেহের সৎকার করে তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবার কথা।

তর্হি জাতি ব্রাহ্মণ ইতি—তাহা হইলে কি জাতি ব্রাহ্মণ ?

ন—না।

জাত্যন্তরজন্তুষনেকজাতিসম্ভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি—

নানা জাতি এবং জন্তু হইতে বহু ঋষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ, জাম্বুকো জম্বুকাৎ, বাল্মীকো

বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যকায়াম, শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ, বশিষ্ঠ উর্ব্বশ্যাম্, অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ—

যেমন ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগ হইতে, কৌশিক কুশ হইতে, জাম্বুক শৃগাল হইতে, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্তকন্যা হইতে ব্যাস, খরগোশ পৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য জাত হইয়াছেন।

তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি—তাহা হইলে কি শাস্ত্রীয় জ্ঞানই ব্রাহ্মণের লক্ষণ?

ন—না।

ক্ষত্রিয়াদয়োঽপি পরমার্থদর্শিনোঽভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি।

কারণ ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও অনেক পরমার্থদর্শী, অভিজ্ঞ এবং পণ্ডিত আছেন।

তর্হি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি—তবে কি বর্ত্তমান কর্ম্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়?

ন—না।

সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসঞ্চিতাগামি কর্ম্মসাধর্ম্ম্যদর্শনাৎ—

কারণ সকল প্রাণিতেই তাহার প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া থাকে।

তর্হি ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি—তাহা হইলে কি ধর্ম্মই ব্রাহ্মণ?

ন—না।

ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি

কারণ হিরণ্যদাতা ধার্ম্মিক বহু ক্ষত্রিয় আছেন।

তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম—

তাহা হইলে ব্রাহ্মণ বলিতে কি বুঝা যায়?

যঃ কশ্চিদাত্মানমদ্বিতীয়ং জাতি গুণ ক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মি ষড়্ভাবেত্যাদি সর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পমশেষকল্পাধারমশেষভূতান্তর্যামিত্বেন বর্ত্তমানমন্তর্ব্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দস্বভাবপ্রমেয়মনুভবৈকবেদ্যমপরোক্ষতয়া ভাসমানং কর-

তলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদিদোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নোভাবমাৎসর্য্যতৃষ্ণাশামোহাদির্হিতো দম্ভাহংকরাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্তত এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ—

যিনি আত্মাকে অদ্বিতীয়, জাতি গুণ ক্রিয়াহীন, জন্মাদি ষড়ূর্ম্মি, কামাদি ষড়্ভাব প্রভৃতি দোষ রহিত এবং সত্য, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপেত্যাদি বলিয়া হস্তস্থিত আমলক ফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া কামরাগাদি দোষ বর্জ্জিত, শমদমাদি সম্পত্তি ষটক্ সম্পন্ন প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ।

ইতি শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ—ইহাই শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ, ইতিহাসের অভিপ্রায়।

এখন একবার শ্রীবুদ্ধ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যাউক,—

"হে দুর্ব্বুদ্ধে! তোমার জটাজূটে, এবং মৃগচর্ম্মে ফল কি? তোমার অভ্যন্তর রাগাদি ক্লেশরূপ হনন দ্বারা পরিপূর্ণ, তুমি বাহ্যশরীর পরিমার্জ্জিত করিতেছ।"

"যিনি ধূলি ধূসরিত জীর্ণ বস্ত্র ধারণ করেন, যিনি কৃশ এবং ধমনী সন্তত গাত্র এবং যিনি একাকী বনে (নির্জ্জনে) বিচরণ করেন এবং ধ্যান সমাধি রত তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।"

"ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইলে কিম্বা ব্রাহ্মণ ঔরসজাত হইলে আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি না, কারণ, সে যদি রাগাদি মলে মলিন হয় তাহা হইলে কেবল ভোবাদী হইবে (অর্থাৎ হে মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ এইরূপ কথনশীল হইবে); কিন্তু (যিনি) আসক্তিরহিত এবং নিষ্পাপী তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।"

যখন যুগ প্রবর্ত্তকেরা আসেন তখন তাঁহারা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অবস্থাচক্রে পড়িয়া আচার্য্য শঙ্কর এবং রামানুজ বেদাধিকার লইয়া "শূদ্র" শব্দের বোধ হয় অযথা অর্থ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যে দেশের শাস্ত্র বলেন সত্যই ব্রাহ্মণের লক্ষণ, কারণ—নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি—ব্রাহ্মণ না হইলে সত্য কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে সমর্থ হয় না, অতি

নীচ-যোনি হইলেও যে দেশের আচার্য্য বলেন—সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা—হে সৌম্য, তুমি সমিধ্ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব, কারণ, তুমি সত্য হইতে স্খলিত হও নাই, যে দেশের নারী মন্ত্র-দ্রষ্টা বাক্, জনক সভায় বিচারপরায়ণা গার্গী, শঙ্কর-মণ্ডন তর্কযুদ্ধে মধ্যস্থা উভয়ভারতী, যে দেশের অবতার রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, যে দেশের মহাপুরুষ কবির, রুহিদাস, হরিদাস—সে দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী যদি শূন্য অর্থবাদ লইয়া চিরকাল ব্যস্ত থাকেন, আমরা তাঁহাদিগকে করজোড়ে বলি—নিদ্রোত্থিত বেদান্তকেশরীর গর্জ্জন শ্রবণ কর—পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের সর্ব্বধ্বংসী করাল করবালের ভীম-আস্ফালন হইতে—"নহি নহ রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে।"

(ক্রমশঃ)

গায়ত্রীর তাৎপর্য্য।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ও তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

"আমরা সবিতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি যিনি আমাদের বুদ্ধি প্রেরণা করিতেছেন।"

এখানে সবিতা শব্দের অর্থ ঈশ্বর, কারণ ঈশ্বর জগৎ প্রসব বা সৃষ্টি করিয়াছেন।

সৃষ্ট্যর্থং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সবিতা স তু কীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্ত্যতে ॥

সবিতা শব্দের অপর অর্থও আছে। সে অর্থ সূর্য্য। কারণ এই

জগৎ সৃষ্টির অব্যবহিত কারণ সূর্য্য (আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরও এই মত)। কিন্তু গায়ত্রীতে ব্যবহৃত সবিতা শব্দের অর্থে সূর্য্যকে না বুঝিয়া আদি কারণ—যিনি সূর্য্যেরও কারণ—সেই পরব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। কারণ গায়ত্রীতে আছে—

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ

অর্থাৎ যিনি আমাদের বুদ্ধি পরিচালনা করেন। এ কথা সূর্য্যদেব সম্বন্ধে বলা যায় না। সূর্য্যদেব আমাদের বুদ্ধি পরিচালনা করেন না, ভগবান্ করেন। এই বুদ্ধিপরিচালক অর্থে শ্রুতিতে "অন্তর্য্যামী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "অন্তর্য্যামী" অর্থাৎ যিনি 'অন্তরে' থাকিয়া আমাদিগকে 'যমন' বা শাসন করেন। এই অন্তর্য্যামী পুরুষ যে সূর্য্যদেব হইতে ভিন্ন তাহা শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো
যম্ আদিত্যো ন বেদ
যস্য আদিত্যঃ শরীরং
য আদিত্যম্ অন্তরো যময়তি
এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।—বৃহদারণ্যক।

'যিনি সূর্য্যের মধ্যে অবস্থান করিলেও সূর্য্য হইতে ভিন্ন, যাঁহাকে সূর্য্য জানেন না, সূর্য্য যাঁহার শরীর, যিনি সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যকে স্বায়ত্ত করেন,—ইনিই তোমার আত্মা, ইনি অন্তর্য্যামী ও অমৃত।'

পাছে কেহ মনে করেন যে, এখানে আদিত্য শব্দের দ্বারা সূর্য্যের গোলককে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং এই গোলকের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যদেবকে অন্তর্য্যামী পুরুষ বলা হইয়াছে, এই জন্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

বেদিতুরাদিত্যাদ্বিজ্ঞানাত্মনোঽন্যোঽন্তর্যামীতি
স্পষ্টং নির্দ্দিশ্যতে। (১।১।২১ সূত্রের ভাষ্য)

অর্থাৎ আদিত্য শব্দের অর্থ সূর্য্যের গোলক নহে, কারণ

আদিত্যকে জ্ঞানবান বলিয়া বলা হইয়াছে (যম্ আদিত্যো ন বেদ), অতএব আদিত্য শব্দের অর্থে জ্ঞানবান সূর্য্যদেবকে বুঝিতে হইবে এবং অন্তর্য্যামী পুরুষ যে সূর্য্যদেব হইতে ভিন্ন শ্রুতিতে তাহাই বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গায়ত্রীমন্ত্রে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে। যে ভাবে ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে তাহার একটু বিশেষত্ব আছে। এবং আমার মনে হয় এই জন্য গায়ত্রীমন্ত্রের এতদূর প্রতিষ্ঠা।

আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে যে, ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি পরিচালনা করিতেছেন। যে শক্তি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করিতেছে, তাহা কত মহৎ আমাদিগকে তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যে শক্তি নিখিল জগৎ পরিচালনা করিতেছে, যে শক্তির কোনও সীমা নাই, যে শক্তির পক্ষে কিছু অসম্ভব বা দুরূহ নহে, সেই সর্ব্বলোকগামী, অপ্রতিহত, অপরিসীম শক্তি আমাদের বুদ্ধির পরিচালক। আমাদের প্রতিব্যক্তির মধ্যে কত অসীম কৃতিত্বের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। যে বুদ্ধির পরিচালক স্বয়ং ভগবান্ তাহার নিকট কিছুই অসম্ভব নহে। কবি তাহার ধীশক্তি প্রভাবে পৃথিবীর সকল মানবের মন আলোড়িত করিতে পারে। অসীমের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া সে সকলকে বিস্মিত করিয়া দিতে পারে। কালিদাস ও শেক্সপিয়র যে প্রতিভাবলে মানব মন বিমুগ্ধ করিয়াছেন সে প্রতিভা পরিচালনা করিয়াছিলেন ভগবান্। যে বুদ্ধি প্রভাবে উপনিষদের ঋষিগণ তুষারমণ্ডিত শৈলশিখরের ন্যায় মহীয়ান্ সত্য-সকল উপলব্ধি করিয়াছিলেন সে বুদ্ধিরও পরিচালক ভগবান্। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস—শেক্সপিয়র, নিউটন, গেটে ইঁহাদের বুদ্ধি যিনি পরিচালনা করিয়াছিলেন, আমাদের বুদ্ধিরও পরিচালক তিনি।

কেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক প্রকাশ লাভ করে না? কেন আমরা মনে করি, আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ, আমরা ইহা করিতে পারিব না, ইহা বুঝিতে পারিব না?—ইহার কারণ এই যে ভগবানের সহিত আমাদের যে যোগ তাহাতে অনেক

প্রতিবন্ধক আসিয়া পড়িয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি এই প্রতিবন্ধক। সংসারের ক্ষুদ্র বস্তুগুলি আমাদের চাঞ্চল্য জন্মায়। কাহারও প্রতি আসক্তি হয়, কাহারও প্রতি বিরক্তি বা ভয় হয়। এই সকল ভাব আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপযুক্ত বিকাশে বাধা জন্মায়। কোনও বিষয়ে বুদ্ধি পরিচালনা করিবার সময় এই সকল শতবিচ্ছিন্ন চিন্তা আমাদের বুদ্ধির প্রবাহ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে। এ সকল বাধা সরাইয়া ফেলিতে হইবে। আমাদের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, সংসারের ক্ষুদ্র বিষয়গুলি উপেক্ষা করিতে হইবে। প্রতিবন্ধক সরাইয়া ফেলিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক যে ভগবৎ শক্তি তাহার সহিত বুদ্ধিবৃত্তির যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

তাই গায়ত্রীমন্ত্র উদ্বোধনের মন্ত্র। আমাদের চিত্ত সকল মলিনতা, সকল ক্ষুদ্রতা, সকল দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া, যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরক সেই নিখিলশক্তির আধার অন্তর্য্যামী ভগবানের প্রতি উন্মুখ হউক। তাঁহার শক্তির প্রভাবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল বাধা অতিক্রম করিবে। তাঁহার জ্ঞানালোকে আমাদের চিত্ত সমুদ্ভাসিত হইবে। তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আমরা ধন্য হইব।

ব্রাহ্মণ ও সমাজ। *

(শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

কোন্ সুদূর অতীত হইতে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছি, পথে কতই বিলম্ব হইয়াছে, নানা লক্ষ্যভ্রংশকর প্রলোভনের কবলে পড়িয়া জন্মজন্মান্তরের বিড়ম্বনার পর এবার ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভে ধন্য হইয়াছি। তাই আজ এই মহান্ ব্রাহ্মণসংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া মনের কথা বলিবার অধিকার পাইয়াছি। এ কেবল

* হুগলি জেলাস্থ, শ্যামবাজার ব্রাহ্মণ সভায় পঠিত।

করুণাময়ের করুণাতেই সম্ভবপর হইয়াছে—নিজের কোন যোগ্যতায় নহে। অতএব যাঁহার সদাজাগ্রত চক্ষুগোচরে, যাঁহার অভ্রান্ত বিচারফলে ক্ষুদ্র মানবের অধিকার হয় বা যায়, প্রথমে তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে চিরসঞ্চিত দৈন্যের বোঝা লইয়া প্রণত হইয়া কৃপা ভিক্ষা করি। পরে এই মহতী সভার গুরুজনকল্প বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মহোদয়গণকে যথাজ্ঞান অভিবাদন করি। বন্ধুস্থানীয় সমবয়স্কগণকে প্রীতিনমস্কার করি কনিষ্ঠগণকে আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি এবং শ্রোতা ও দর্শকরূপে আগত শূদ্রভ্রাতৃগণকে আশীর্ব্বাদ করি।

প্রথমেই বলি, আমি ব্রাহ্মণ বলিতে ব্রহ্মপরায়ণ অতএব ত্যাগশীল ও সত্যনিষ্ঠকেই বুঝি। ধর্ম্ম ও সত্যই যাহাদের জীবন তাঁহাদিগের নিকট সত্য কথা অবশ্যই বক্তব্য—নতুবা সত্যের তথা ব্রাহ্মণত্বের অবমাননা করা হয়। অতএব আজ সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর নিকট, যাঁহারা চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুরু বলিয়া বিধানদিষ্ট, তাঁহাদিগেরই নিকট সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের প্রসঙ্গ তুলিব। সমাজে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের উপর উচ্ছৃঙ্খল কর্তৃত্বে ও মাত্র যজ্ঞসূত্রের দাবীতে স্থাপিত নহে—স্থাপিত আত্মগৌরবে, ধর্ম্মপ্রাণতায় ও শ্রীভগবৎ-প্রসাদে। অতএব এ সমিতিতে তুচ্ছ আচারমূলক বিষয় পরিহার করিয়া ব্রাহ্মণের প্রকৃত স্বরূপ ও বর্ত্তমান সমাজের দিকে দায়িত্ব নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব শ্রীভগবান্ আমায় শক্তি দিন।

যদি কেহ বলেন, 'বর্ত্তমানকালে অতীত যুগের উচ্চ আদর্শের অভাবে খাঁটি সত্য কথা অপ্রিয় হইয়া উঠিবে ও শূদ্রসমাজে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদার লাঘব হইবে।' তাহার উত্তরে বলি 'ভাই, ব্যাধি গোপন করিয়া আসাতেই রোগটী দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিয়াছে, আর ক্ষতের উপর বৃথা আত্মাভিমানের প্রলেপ দিয়া সমাজদেহে শোষের সংখ্যা বাড়াইও না।' আমাদের আসল ধাত (অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠা ও নিবৃত্তিপরায়ণতা) ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাই কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে আমাদের সকল প্রচেষ্টাই রোগীর প্রলাপের ন্যায় হইতেছে। ভ্রাতৃগণ, ধাত ধরিয়া আসিলেই সব উপসর্গ দূর হইবে,

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র-সমাজ পুনরায় সুস্থ হইয়া বিপুল উৎসাহে ও মহা আনন্দে জীবনপথে চলিবে। উভয় সমাজই জগৎপিতার প্রেমাবদ্ধ সন্তানরূপে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিবে।

প্রত্যেক মানবজীবনের দুইটা দিক আছে—(১) ভিতরের দিক বা স্বরূপের দিক, (২) বাহিরের দিক অর্থাৎ সমাজের দিক।

সমাজের দিক। সমাজের দিক আবার দুই রকম ;—(১) নিজের স্বার্থ বা সংসার, (২) পরের স্বার্থ বা সমাজ। মানুষ অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের পথে যতই যাইতে থাকে ততই নিজের সংসার হইতে সমাজের এবং সমাজ হইতে স্বরূপের দিকে অগ্রসর হয়। স্বভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া কেবল স্বভাবে অর্থাৎ চিদানন্দময় অবস্থাতে ফিরিতেই মানুষ জন্মের পর জন্মগ্রহণ করে।

তিন চারি বৎসরের শিশু কোন খাবার জিনিষ পাইলে কাহাকেও ভাগ দিতে চায় না, নিজের লালসা বড়ই প্রবল, আত্মতৃপ্তিই তাহার মূলমন্ত্র। পরে সেই শিশুই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারের তাপে দগ্ধ হইয়াও নিজের ভোগেচ্ছা সংযত করিয়া ভাইভগিনী স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে সুখী করিবার চেষ্টা করে। তখন নিজের সংসারকে সুখী করিয়াই তাহার আত্মতৃপ্তি। এখানে শিশু প্রথমে "আমি আমার" করিয়া পরে নিজেকে প্রসারিত করিয়া আত্মতৃপ্তির প্রথম ক্রমবিকাশ লাভ করে। তদ্রূপ মানব যখন অন্যান্য জীবযোনি পরিভ্রমণ করিয়া প্রথম প্রথম মানব জন্ম পায়, তখন সে নিজের সংসার, টাকা কড়ি, জমি জমা, খামার মরাই প্রভৃতি ভোগবাসনার তীব্র জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে, পরের দিকে তাকাইবার প্রয়োজন বোধ করে না। পশুর ন্যায় অজ্ঞান লইয়া জন্মায় ও মরে। প্রভেদ মাত্র মনুষ্যের আকৃতি। ছয়টা রিপুর খেলনা ইহারাই। এইরূপে আপন-সর্ব্বস্ব হইয়া জন্মজন্মান্তর ঘুরিতে ঘুরিতে যখন প্রচ্ছন্ন স্বরূপ-চৈতন্যের ঈষদ্বিকাশ হয় তখন মানব পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ স্বার্থের মোহ সম্পূর্ণ না কাটাইলেও পরের দিকে চাহিয়া ফেলে, পরের জন্য ভাবিয়া

ফেলে, এবং তাহাতে সুখও পায়। মার্জ্জিত-বুদ্ধি সহায়ে তখন সে বুঝে যে পাঁচজনকে লইয়াই তাহার জীবন, পাঁচজনের সুখদুঃখে, সম্পদবিপদে তাহারও অংশ আছে। সমাজের নিকট হইতে সে নানাভাবে সেবা বা উপকার পাইতেছে, তখন তাহারও অপরকে সেবা করিবার প্রবৃত্তি জাগে। নিজের সুখের বা স্বার্থের বাসনা কমিয়া যায়, কেবল পরার্থসাধনে আত্ম-নিয়োগেই তাহার তৃপ্তি হয়। ইহাই আত্মতৃপ্তির দ্বিতীয় ক্রমবিকাশ। পরের সেবা করিতে করিতে বিবেকের প্রেরণায় তাহার স্বরূপ চিন্তা ঘনীভূত হয়, চৈতন্যের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্তপ্রায় হয়, তখন তাহার প্রকৃত বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। ইতর-রসবিতৃষ্ণা তাহাকে আত্মানন্দ লাভ করায়। ইহাই আত্মতৃপ্তির তৃতীয় বা শেষ ক্রমবিকাশ।

পুণ্যভূমি ভারতের ব্রাহ্মণ ক্রমবিকাশের পথে উক্ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। সংসার ও সমাজ উভয়েই মায়ার লীলাভূমি। তাই মায়া বা শাশ্বতঃ অজ্ঞান অতিক্রম করাই ব্রাহ্মণের লক্ষ্য ও ও সাধনা ছিল। বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে, গুরুগৃহে বিদ্যাবলে সংসারের অনিত্যতা জানিয়া রাখিতেন। সংসার হইতে ফিরিবার চাবিকাঠি হাতে লইয়া যৌবনে গুরুর অনুমতিক্রমে সংসারে প্রবেশ করিতেন ও সংসারের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াও মায়াপাশের কাঠিন্য উপলব্ধি করিতেন। বানপ্রস্থে ও সন্ন্যাসে প্রথম আশ্রমের অর্জ্জিত বিদ্যার আলোকে ও ধ্যানধারণাসহায়ে স্বরূপের সাক্ষাৎকার পাইতেন। এবম্বিধ স্বরূপ-দ্রষ্টা ব্রাহ্মণ ঋষি নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের সংযম, সত্যনিষ্ঠা, পরার্থপরতা, তপঃশীলতা ও স্বরূপাববোধ তাঁহাদিগকে চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুরু করিয়া রাখিয়াছিল। এবং সেই পূত ব্রাহ্মণপ্রভাব এমনি অটল আসন পাতিয়াছে যে আজও আধুনিক ব্রাহ্মণের স্বেচ্ছাচার সে আসনকে সরাইতে পারে নাই। প্রাচীন ব্রহ্মবীর্য্য আজও তাঁহাদিগের অযোগ্য বংশধরগণকে হিন্দুসমাজে গুরুস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছে।

মধ্যমযুগের ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ নিবৃত্তি ও তপস্যার মাগ ছাড়িয়া

প্রবৃত্তি ও ভোগের মার্গ ধরিলেন—জন্মগত ব্রাহ্মণ হইলেও শূদ্রভাবাপন্ন হইলেন। নিজেদের হীনতা পা'ছে প্রকাশ পায় তজ্জন্য স্ত্রীলোক ও শূদ্রের বেদে অনধিকার ঘোষণা করিয়া শূদ্রসমাজকে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন রাখিয়া নিজেদের প্রতি 'ত্তির ভিত্তি শিথিল করিলেন। তাহারই ফলে আমাদের এই দুর্দ্দশা। কারণব্যতিরেকে কার্য্য হয় না। শুধু কালপ্রভাবকে দোষী করিয়া নিজেরা নির্দ্দোষ বলিলে চলিবে না। পূর্ব্বে শূদ্রের উপর স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণের অত্যাচার আজ ধনী শূদ্রযজমানের নিকট নিবন্ধর ব্রাহ্মণ পুরোহিতের লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছে।

সংসারে যাঁহার তি আগের দিকে না থাকে তাহাকে পিছাইতে হইবেই। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন হীন হইয়াছে তাই আমাদের সামাজিক জীবন নির্বীর্য্য ও নিষ্প্রভ হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মচর্য্যশীলতা ও অন্তর্মুখীনতা পুনরবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহারা সংসারের প্রতিপত্তির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেন অথচ সমাজ তাহাদেরই পদতলে ছিল। এক্ষণে আমাদিগকে শূদ্রোচিত ভোগাকাঙ্ক্ষা সংযত করিয়া, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির বাসনা দূর করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবন প্রাচীন আদর্শে গড়িতে হইবে। নিজেদিগকে শুদ্ধ ও যোগ্য না করিয়া অপরকে শাস্ত্রের শ্লোক দ্বারা আক্রমণ করিলে এবং দৃষ্টান্ত বিরহিত আদেশ দিলে উপহাসপাত্র হইতে হয়। আত্মশাসন না করিলে লাঞ্ছনা, দুদিন আগেই হোক্ আর পরেই হোক্ অনিবার্য্য।

এ অবস্থার পরিবর্ত্তন আমাদিগকেই করিতে হইবে। শুধু আচারবিচারের খুঁটিনাটি লইয়া নয়—প্রকৃত অন্তঃশুদ্ধি, সংযম ও ও পরার্থপরতা লইয়া। সমাজ নদীস্বরূপ, ধর্ম্ম নদীর জল, আচার জলের ঢেউ। তরঙ্গের ন্যায় আচার পরিবর্ত্তনশীল, একবার উঠিয়া কালগর্ভে বিলীন হয়। সেই বিলীন তরঙ্গের বৃথা অনুসন্ধানে শক্তিক্ষয় না করিয়া নূতন ভাবে প্রাচীন আদর্শে চলিলে নবীন ঢেউ উঠিবেই। ঢেউএর জন্য ততটা ব্যস্ততা না রাখিয়া জলের

বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রাখুন—নদীকে কানা না করিয়া স্রোতস্বতী রাখুন। সমাজের এবং জগতের উন্নতির আকাঙ্ক্ষার দিকে লক্ষ্য না রাখিলে শুধু বি এ, এম্ এ, পাশ করিয়াও ফল নাই, আর ব্যাকরণ স্মৃতির কচ্‌কচিতেও তৃপ্তি নাই। অধীত বিদ্যাকে ক্রিয়ামুখী করুন। সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সমবেত শক্তি ও চেষ্টা প্রযুক্ত করুন দেখিবেন, আবার সুদিন আসিবে, আবার অক্রোধ, অহিংসা, অলোভ, সত্য ও তপঃরূপে ব্রাহ্মণত্ব ফুটিয়া সজীব হইবে। ব্রাহ্মণত্ব আসিলেই সমাজে শক্তিসামঞ্জস্য ঘটিবে, শান্তি, সৌখ্য, সমৃদ্ধি সব আসিবে। ফুল ফুটিলেই ভ্রমর আসিবে, নতুবা ভ্রমরের গলায় ধরিয়া কাঁদিলেও সে আসিবে না।

কথা হাজার মিষ্ট ও সরস হইলেও তাহাতে চিঁড়ে ভিজে না। আর কত কত যুগের সঞ্চিত পাপে যে হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠোর সে হৃদয় যে শুধু কথায় ভিজিবে, অনুতপ্ত হইবে, তমঃ পরিহার-পূর্ব্বক নিজের এবং দেশের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিবে তাহা অনেকেই আশা করে না। আমি কিন্তু ব্রাহ্মণশক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, তাই বলিতেছি যে, আহূত শতাধিক গ্রামের মধ্যে কোন কোন গ্রামে এ শক্তির উদয় হইবে এবং কোন কোন ব্রাহ্মণ যুবক তাসপাশা, মাছধরা ও রঙ্গরস পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা আত্মোন্নতি ও সমাজোন্নতি করিতে প্রয়াসী হইবেন।

কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই লজ্জাজনক তামসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দেশ করা মাদৃশ ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাধ্যাতীত। রোগ জটিল ও উপসর্গবহুল। এ স্থলে আমি উপসর্গসমূহের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া রোগের কারণ নির্ণয় ও কারণ ধ্বংসের ব্যবস্থা সঙ্গত মনে করি। নতুবা গ্রামে গ্রামে যে সংখ্যাতীত উপসর্গ দেখা যাইতেছে তাহা কেবলমাত্র সামাজিক শাসন দ্বারা দূর করিতে হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের জন্য একটি সমাজ-দণ্ডবিধি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হয়। ক্ষুদ্র মানববুদ্ধি-উদ্ভাবিত বিশেষ ব্যবস্থা সকল স্থানে সকল অবস্থায় খাটে না। ব্রাহ্মণসমাজের উদ্দেশ্য

ও গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশ-কাল ও অভাব অনুযায়ী ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নতুবা এক সময়ের বা স্থানের পক্ষে যাহা প্রতীকার তাহা অন্যত্র রোগের কারণ হইয়া উঠিবে। সেইজন্য এখানকার অভাব বিবেচনা করিয়া নবজীবন সাধনার অন্তরায়ের ও ব্যবস্থার কথা মোটামুটি ভাবে বলিব। সুধীজন প্রয়োজনমত বিস্তৃত করিবেন।

সমাজের এই নূতন সাধনার পথে বাধাগুলি স্থূলতঃ দুই প্রকারের:—(১) বাহিরের অর্থাৎ সামাজিক ২) ভিতরের বা মানসিক।

(১) সামাজিক—

(ক) দলাদাল:—বসিতে হইলে স্থানটা ঝাঁট দিয়া বসিতে হয়, পূজা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আসনশুদ্ধি করিতে হয়। সমাজ-জীবনের সংস্কার করিতে হইলে অগ্রে গ্রামশুদ্ধি করিতে হইবে। গ্রামে দলাদলি, পুরোহিত-যজমান কোন না কোন পক্ষের নির্য্যাতন, ধনমত্ত ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল প্রভুত্ব থাকিলে গ্রামে শান্তি থাকে না, কোনও সদালোচনা হইতেই পাবে না। পূর্ব্বে মুনিঋষিগণ শান্তি নিকেতন তপোবনে সাধনাতৎপর থাকিতেন, হিংস্র জন্তুগণও তপোবনের বাধা জন্মাইত না। এখন আমাদের সেদিন—সে ভাগ্য নাই; এখন আমাদিগকে নিজ নিজ গ্রামকেই তপোবনের ন্যায় শান্তিভবন করিয়া লইয়া তবে জীবনস্রোত ফিরানরূপ সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে দলাদলি, দলসূত্রে দ্বেষবশতঃ মামলামোকদ্দমার সৃষ্টি, যজমান পুরোহিতের বীভৎস অভিনয়, ধনীর দাম্ভিকতা, দরিদ্রের লাঞ্ছনা প্রভৃতি দর্শনে কাহার না দুঃখ ও লজ্জা হয়? ঘরে আগুন লাগিলে ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনা বন্ধ রাখিয়া আগে আগুন নিবাইতে হয়। গ্রাম্য দলাদলিরূপ অগ্নিনির্ব্বাণের বর্ত্তমানের অব্যর্থ উপায়—ব্রাহ্মণসমাজের একতা। প্রত্যেক গ্রামের দলাদলি বন্ধ হইলেই আমাদের নূতন সাধনায় আসনশুদ্ধি হইবে।

(খ) দারিদ্র্য ও জীবিকাসঙ্কট:—লেখাপড়া কিছু থাকিলে

জীবিকাসঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার কতকটা সম্ভাবনা থাকে, উপায়ের পথ নানাদিকে খোলা থাকে। কিন্তু লেখাপড়া না থাকিলে, যাজনকার্য্য বা পাচনকার্য্য ব্যতীত অন্য উপায়ের পথ প্রায় রুদ্ধ থাকে। সে ক্ষেত্রে কেবল শূদ্রই (অধিকাংশ স্থলে) বেচারা পুরোহিতের ভাগ্য-বিধাতা হন। অন্নের সংস্থান বন্ধ হইবার ভয়ে বা দারিদ্র্যজনিত লোভের বশে শূদ্রের উৎকোচের আশায় পুরোহিত শূদ্রের অনুগত থাকেন। গ্রামের ষোল আনা ব্রাহ্মণের পূর্ণ সহানুভূতিলাভে যদি এই পুরোহিত নিশ্চিন্ত থাকিতে পান, তাহা হইলে তাঁহাকে জীবিকার জন্য যজমানের কৃপা-ভিখারী হইয়া থাকিতে হয় না। ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ। বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ব্যতীত এ সমস্যার সমাধান হয় না।

(গ) সৎসঙ্গের অভাব ও সদনুষ্ঠানের বিরলতা।—অলস ব্যক্তির মাথা শয়তানের বৈঠকখানা। গ্রাম এইরূপ লোকেই পূর্ণ। হীনবুদ্ধি, হীনচরিত্র ব্যক্তির বা সমাজের সংশ্রবে নিয়ত থাকিলে, তীক্ষ্ণবুদ্ধিও মলিন হয়, চরিত্রবানও ভ্রষ্ট হন। কাজকর্ম্মসূত্রে যতটা সংশ্রব না রাখিলে নয় মাত্র ততটা রাখিয়া অবশিষ্ট সময় নিজে নিজেই সদ্ব্যবহার করিতে হয়। সৎপ্রকৃতির লোক, তা তিনি শূদ্রই হোন্ আর ব্রাহ্মণই হোন্, বন্ধু ও সঙ্গী হইলে উভয়েরই কল্যাণ। সদনুষ্ঠান বলিতে গাছপ্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি ছাড়া গ্রাম্য ব্রাহ্মণের মস্তিষ্কে আর ধারণাই হয় না। নিজের স্বার্থ না রাখিয়া পরের কাজ দেখা, সেবা করা—এসব গ্রামে বড় বিরল।

(২) মানসিক বা ব্যক্তিগত।

(ক) মনের অকৃপা—শুনি তো অনেক হয় কই? হয় না, কেবল মনের উপর আধিপত্য নাই বলিয়া। এ আধিপত্য লাভ বহুদিনের অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের দ্বারা ঘটে। একদিনের, এক মুহূর্ত্তের কল্পনাটা, বাসনাটা চেষ্টা নয়। মন স্বতঃই বহির্ম্মুখ ও চঞ্চল। এই বহির্ম্মুখ মনকে বশ করা, পরিশেষে নাশ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া আধুনিক ব্রাহ্মণজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। * * মনের

গোলামই যদি রহিলাম, তবে ব্রাহ্মণত্বের বড়াই কেন? মনই ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা, ইহাকে শাসনে আনিতে পারিলে, অন্যান্য ইন্দ্রিয় আয়ত্তে আসিবে। বিবেক আশ্রয় দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তির জীবন পবিত্র হইতে থাকিলে, মন শুদ্ধ ও সবল হইতে থাকিলে সমাজও সজীব হইতে থাকিবে। বিদ্যাশিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্যানুশীলন ও লব্ধসমাধি সদ্গুরু আশ্রয় ব্যতীত মনকে স্ববশে আনিয়া ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা আকাশকুসুম মাত্র।

(খ) বুদ্ধির জড়তা—তপস্যা ব্যতীত আধ্যাত্মিক বা প্রকৃত বুদ্ধির নির্ম্মলতা আনিতে আর কিছুই পারে না।

বি এ, এম এ, পঞ্চতীর্থ, সপ্ততীর্থ, প্রভৃতি কোন উপাধিরই শক্তি নাই যে বুদ্ধিকে চিন্ময়ী করে, ঠিক ভাবে সত্যাভিমুখী করে। তবে মনুষ্যজীবনের অধিকাংশ ভাগই যখন সামাজিক, তখন সমাজে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করা খুবই আবশ্যক। শিক্ষাবিস্তারের উপর ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য শ্রেণীর সাংসারিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে। বিদ্যাশিক্ষায় চক্ষু ফুটে, নতুবা চোখ থাকতেও কাণা, বিদ্যাহীন মানব পশুর সমান। কূয়োর ব্যাঙ্ যেমন কুয়োটিকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মনে করে, ভাবে কুয়ো ছাড়া আর স্থান নাই, আর উচ্চতর জীব নাই। তেম্নি বিদ্যা না থাকিলে দেশের এবং বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকায়, মানুষ সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ও একঘেয়ে হয়, মূর্ত্তিমান্ কুসংস্কার-সমষ্টি হয়। যে ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণশিরোমণি, যাঁহার জিহ্বা বেদাদি শাস্ত্রালোচনায় রত ছিল, আজ তাঁহারই বংশধর অধিকাংশ গ্রামে এমনই মূর্খ যে সংযুক্ত বর্ণ লিখিতে কালঘাম ছুটে। দেবভাষা সংস্কৃত ভাষা তো দূরের কথা, মাতৃভাষা বাঙ্গালা বুঝাই সাধ্যাতীত। অতএব শিক্ষাপ্রচারের জন্য এ ব্যবস্থা বোধ হয় সঙ্গত হয় যে, গ্রামে গ্রামে অথবা সুবিধামত ২।৪ খানা গ্রাম একত্রে সকল বর্ণের শিশুদের জন্য নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা খোলা হোক, নির্লোভ, সত্যপ্রিয় কর্ম্মঠ শিক্ষক নিযুক্ত হোক্। পাঠশালাগুলি যেন দায় এড়ান না হয়। সমিতি হইতে স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী খোলা হোক্। সমিতির কোন

ব্যবস্থামতে সেই সেই পাঠশালাকে বা চতুষ্পাঠীকে মাসিক সাহায্য দেওয়া হোক। আর ব্রাহ্মণ যুবকগণকে বলি, ঐরূপে সুবিধামত পাঠাগার (Library) খুলিয়া সদ্‌গ্রন্থ, ধর্ম্মশাস্ত্র, সাধুপুরুষ কর্ম্মীদিগের জীবনী, বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ রাখা হোক্। নাটক নভেল বাদ দেওয়া হোক্। রঙ্গরস, তাস্, পাশা, মাছধরা প্রভৃতি তামসিক কার্য্যে কালক্ষেপ আমি আত্মহত্যার সদৃশ অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করি।

(গ) সৎসাহসের অভাব—সত্যকে আশ্রয় করিলে ও সৎকার্য্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলে সাহস আসে, বৃথা ভয় নষ্ট হয়।

উপসংহারে বলি, অনেক কথাই বলিলাম, দুটো কড়া সত্য কথাও বলিয়াছি, কেহ মনে আঘাত পাইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। তবে আমি যাহা বলিয়াছি, ঘরে ফিরিয়া একবার পাঁচজনে ধীরভাবে আলোচনা করিলে আমি কৃতার্থ হইব। প্রত্যেক গ্রামের দলাদলি মিটাইতে, গ্রামের অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির জন্য ও নিজের মনের গতি ফিরাইতে আমি হাতজোড় করিয়া কাতরভাবে সকলকে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ যুবক মহাশয়গণকে অনুরোধ করি। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইবার আন্তরিক চেষ্টা করিলে, ব্রাহ্মণের হৃদয়ে ভগবৎ-শক্তি খেলা করে, তাঁহার কর্ম্মে লোকের কল্যাণ হয়। নতুবা কদাচাররত, মদগর্ব্বিত ব্রাহ্মণের আস্ফালনে সমাজের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল হইতে পারে না। যুবক মহাশয়গণ, জ্ঞানচর্চ্চায় আত্মোন্নতিবিধানে ও লৌকিক কল্যাণসাধনে মনোনিবেশ করুন। তমোগুণ বর্জ্জন করিয়া সত্ত্বগুণের আশ্রয় লইবার চেষ্টা করুন। যদি সংসারের বশে, কুশিক্ষার ফলে, কালধর্ম্মের দোহাই দিয়া নূতনভাবে প্রাচীন আদর্শে জীবনগঠনরূপ সাধনায় নিরস্ত থাকিয়া তৃপ্ত হন, তাহা হইলে 'হরিবোল' দিয়া এইরূপ সভাসমিতিকে অচিরে তীরস্থ করুন। আমরা যে সমবেত হইয়াছি ইহা যেন নাট্যাভিনয়ের মত না হয়।

অতএব ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে যথাযোগ্য অভিবাদনান্তে বিদায় গ্রহণ

করিবার পূর্ব্বে আমি আন্তরিক কামনা করি, ব্রাহ্মণসমাজের কুম্ভকর্ণের ন্যায় এই দীর্ঘনিদ্রা ত্বরায় ভাঙ্গুক। যুবকগণ, অক্লান্ত থাকিয়া এই নবজাগরণের সূচনা করুন।

আন্তরিক আশা করি, এই সমিতি সর্ব্ববিষয়ে স্বশ্রেণীর মুখ উজ্জ্বল রাখুন ও আন্তরিক প্রার্থনা করি, শ্রীভগবান্ অমোঘ কৃপাকটাক্ষে এই বার্দ্ধক্যজীর্ণ মুমূর্ষু ব্রাহ্মণ-সমাজকে সঞ্জীবিত করিয়া নবোৎসাহে স্বকর্ত্তব্যপালন করিতে সমর্থ করুন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

লক্ষ্মণ-চরিত—শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত বি এ, প্রণীত, প্রকাশক শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত। মূল্য ।৵০ আনা, ডবল ক্রাউন ৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

পুস্তকখানি পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীচরণকমলে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। লক্ষ্মণ-চরিত বাস্তবিকই মহামুনি বাল্মীকির অদ্ভুত বিশ্লেষণ। ভাবরাজ্যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন চরিত্র মহর্ষি ব্যতীত কেহ এ পর্য্যন্ত চিত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না জানি না। আদর্শের প্রতি, ইষ্টের প্রতি কিরূপ দেহাভিমানশূন্য ভালবাসা সাধককে সর্ব্বশেষে পূর্ণত্যাগীতে পরিণত করে তাহাই লক্ষ্মণ চরিত্রে মহর্ষি দেখাইয়াছেন। লক্ষ্মণের বাল্য-চরিত্রে আমরা উক্ত ভাবের অঙ্কুর দেখিতে পাই এবং সেই ভাবের প্রতি শ্রদ্ধাই তাঁহাকে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' শেষে স্বীয় ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্রকেও—যাঁহাকে তিনি একমুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করেন নাই, ত্যাগ করিতে সক্ষম করিয়াছিল। এই মূল সূত্রটীর সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়াই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সেইজন্য গ্রন্থকার লক্ষ্মণের শৈশবের, যৌবনের এবং বনবাসান্তর অযোধ্যা-জীবনের দুই চারিটী করিয়া ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টায় তিনি যে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে লক্ষ্মণ-চরিত্র যেরূপ সুন্দর ত্যাগোদ্দীপক তাহাতে শুধু আমাদের কেন, যিনিই

এই পুস্তক পাঠ করিবেন তাঁহারই মনে হইবে গ্রন্থকার যদি চরিত্র-বিশ্লেষণের দিকে অত ঝোঁক না দিয়া লক্ষ্মণ চরিত্রের আরও দুই চারিটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া চরিত্র স্ফুটনের দিকে নজর দিতেন তাহা হইলে গ্রন্থখানি আরও সুখপাঠ্য হইত। সর্ব্বশেষে আমরা বলিতে চাই পুস্তকের ভাষা অতি সুললিত এবং সুসংস্কৃত হইলেও উহা যদি কথঞ্চিৎ সমাস এবং সন্ধিহীন হইয়া বালকবালিকাগণেরও উপযুক্ত হইত তাহা হইলে পুস্তকখানি আরও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইত। কারণ আজকাল আমরা দেখিতে পাই, বালকবালিকাগণ কীর্ত্তিবাস, কাশিরাম দাস প্রভৃতির পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লিখিত রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, সুভদ্রাদি চরিত্র পাঠ করিতে ভালবাসে না কিন্তু চরিত্রগুলি তাহাদিগকে যে মুগ্ধ করে না এরূপ নহে। আমরা কিন্তু চাই বালক বালিকাগণ ঐ চরিত্র সকল পাঠ করিয়া, তাহাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরিণত বয়সে তাঁহাদের ন্যায়ই আদর্শ পুরুষ বা রমণীতে পরিণত হউক। এরূপ ক্ষেত্রে রুচি বদলাইয়া যাওয়ার জন্য আক্ষেপ না করিয়া তাহাদেরই রুচি অনুযায়ী ভাষায় লিখিয়া চরিত্রগুলি তাহাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে যাহা হউক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যদি কাহারও হৃদয়ে লক্ষ্মণের ন্যায় একনিষ্ঠ ত্যাগী হইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে গ্রন্থকারের সকল শ্রম সফল হইয়াছে বলিতে হইবে।

উপাসনা তত্ত্ব—'অর্থাৎ হিন্দু উপাসকগণের অনুষ্ঠেয় তথ্য নির্ণয়'। শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বৰ্দ্ধমান, দাইহাট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ১ টাকা।

আধুনিক বঙ্গদেশের প্রচলিত পূজা, অর্চ্চা প্রভৃতি অনুষ্ঠান পদ্ধতির আলোচনা করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালী বা উপাসনা পদ্ধতিই বঙ্গদেশের সকল প্রকার অনুষ্ঠানাদিকেই অনুপ্রাণিত করিয়া রহিয়াছে এবং এমন কি, সমগ্র বঙ্গদেশকে একরূপ তন্ত্র প্রধান দেশ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তন্ত্র নামটী কতকগুলি

অপধর্ম্মী, কদাচারী সম্প্রদায়বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় উহা অনেকের মনে বিজাতীয় ভাব আনয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্র যে বাস্তবিকই ঐ সকল কদাচারিগণের সমর্থনকারী নহে—ঐ সকল অসৎব্যক্তিগণ আপনাদিগের অসৎ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই যে তন্ত্রোপদেশ সমূহের কুঅর্থ করিয়া আপনাদের কাজে লাগাইতেছে এবং তন্ত্রোপদিষ্ট সাধন সহায়েও যে বেদ এবং উপনিষদ্ লক্ষিত পরম-পদ পাওয়া যায় এই সকল বিষয় পুস্তকখানিতে আলোচিত হইয়াছে। তন্ত্র যে কোন ব্যক্তি-বিশেষের মস্তকোত্থিত নহে, উহা যে প্রাচীন বেদবিহিত উপাসনাপদ্ধতিরই ক্রমবিকাশ এবং মূলতঃ বেদোপদেশের সহিত তন্ত্রোপদেশের যে কোনও পার্থক্যই নাই তাহাও নানাবিধ প্রমাণোল্লেখের দ্বারা দেখান হইয়াছে। গ্রন্থকারের এই সকল অভিমতের সহিত আমরাও একমত। পুস্তখানির একটী বিশেষ বিশেষত্ব এই যে উহা অতি সরল এবং সুবোধ্য ভাষায় লিখিত। আশা করি পুস্তকখানি পাঠে বহু সাধক আপনাদের সাধনতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বীয় অভীষ্টের প্রতি সমধিক নিষ্ঠা-সম্পন্নই হইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।

বঙ্গে বস্ত্র-সঙ্কট।

আবেদন।

বস্ত্রের জন্য ভারতবাসীকে মুখ্যতঃ ইংলণ্ডের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের জন্য সওদাগরী জাহাজ-সমূহ যুদ্ধের কার্য্যেই ব্যাপৃত হইয়া পড়ায় আমদানীকারী জাহাজের অভাববশতঃ এদেশে বস্ত্র আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই জন্যই আজকাল বস্ত্র এইরূপ অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। যুদ্ধ এইরূপ আরও কিছুদিন চলিলে বস্ত্রের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে। বস্ত্র মহার্ঘ্য হওয়ায় ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশবাসীকেই সমধিক দুরবস্থায়

পতিত হইতে হইয়াছে। কারণ বঙ্গের প্রায় সমস্ত অধিবাসীই মিলে প্রস্তুত বস্ত্র পরিধেয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

কিন্তু শতকরা ৯৫ জনেরও অধিক বঙ্গবাসী দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত। ইঁহারা চিরকালই নিজেদের অন্নের ব্যবস্থা অতি কষ্টেই সম্পাদন করিয়া থাকে। এই মহার্ঘ্যের দিন প্রায় সকল নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য দুই তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ তাহাদের আয় পূর্ব্ববৎ স্বল্পই থাকায় তাহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অন্নের সংস্থান তাহারা এখনও কোনরূপে করিতেছে, কিন্তু আচ্ছাদন ক্রয় করিবার জন্য আর আয়ের কড়িতে কুলাইতেছে না। অথচ বস্ত্র না হইলে লজ্জা নিবারণ হয় না, ও জন-সমাজে বাস করা চলে না। উক্ত কারণের জন্যই বর্ত্তমান বস্ত্রাভাব দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতরেই প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে।

বস্ত্রাভাববশতঃ লোকের এরূপ কষ্ট হইতেছে যে, অনেককেই ছেঁড়াকাঁথা, ছেঁড়া মশারি, চট ইত্যাদি পরিয়া দিন কাটাইতে হইতেছে। দুই এক স্থলে এইরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত হীন অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য দুই চারি জন আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে—রাস্তা ঘাটে একাকী পাইলে বস্ত্র কাড়িয়া লওয়া ত আছেই। বহু ভদ্রগৃহস্থ পরিবারের এইরূপ দুরবস্থাও হইয়াছে যে, সমগ্র পরিবারের হয় ত একখানি কি দুইখানি গোটা কাপড় আছে ইহা কেবল পুরুষেরাই কার্য্যান্তরে যাইবার সময় ব্যবহার করিয়া থাকে—একেবারে দুই তিন জনকে বাহিরে যাইতে হইলে বস্ত্রে কুলায় না। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাঁহাদিগকে ২৪ঘণ্টা ছেঁড়া ন্যাকড়া ইত্যাদি পরিয়া, একরূপ বিবস্ত্রা হইয়াই অন্তঃপুরের মধ্যেই থাকিতে হয়। হঠাৎ কোন পুরুষমানুষ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবস্ত্রা অবস্থায় তাঁহাদের না দেখিয়া ফেলেন এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়। এইরূপ সংবাদ আমরা প্রায়ই শুনিতে পাইতেছি এবং সংবাদপত্রাদির স্তম্ভে প্রকাশিত হইতেছে। সাধারণেরও বোধ হয় এই সকল

সংবাদ অবিদিত নাই। আমরা নিজেরাও এই সকল সংবাদের সত্য নির্দ্ধারণের জন্য জেলায় জেলায় খবর লইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় প্রত্যেক জেলা হইতেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংবাদই আসিয়াছে।

এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণের সাহায্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া আমরা সাধারণের হইয়াই দুর্দ্দশাপন্ন বঙ্গবাসীর সেবায় অগ্রসর হইব স্থির করিয়াছি। ভারতবাসী আবহমানকাল জাতি ও দেশ নির্ব্বিশেষে দুঃস্থের ও অভাবগ্রস্তের সেবা করিয়া আসিয়াছে। ইহাই ভারতবাসীর সনাতন ধর্ম্ম। আজ কি তাঁহারা স্বীয় দেশবাসীর দুঃখের দিনে সেই সনাতন ধর্ম্ম ভুলিয়া যাইবেন? দেশবাসীর দুঃখে কি তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিবে না?

ইতিপূর্ব্বেই বিশ্বরাজ হুকুমচাদ নামক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সহৃদয়তায় মিশনের হস্তে ১৭০ জোড়া নূতন বস্ত্র আসায় আমরা তদ্দারা নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে বিতরণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। যথা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা), বপতারা (ঢাকা), গুটিয়া (বরিশাল), মহেশপুর (যশোহর), পাকরা (ময়মনসিং), বাঁকুড়া, কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া), গড়বেতা (মেদিনীপুর), দ্বারহাটা (হুগলী) শিলচর, (কাছাড়), এবং বেলুড় (হাওড়া)। ভবিষ্যতে অন্যান্য স্থানেও সাহায্যকেন্দ্র খুলিবার ইচ্ছা আছে। এখন এই ব্রত উদ্যাপনের ভার সাধারণের উপর।

সর্ব্বশেষে আমরা বলিতে চাই, অভাব যেরূপ সর্ব্বব্যাপী ও ভীষণ হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সহৃদয় ব্যক্তিগণ যদি আশু সাহায্য দানে অগ্রসর না হন, তাহা হইলে অবস্থা ক্রমশঃ আরও শোচনীয় হইয়া পড়িবে। সেই জন্য আমরা সকলের নিকট হইতেই নূতন বা পুরাতন বস্ত্র বা অর্থ ভিক্ষা করিতেছি। যিনি যেরূপে সাহায্য করিতে সক্ষম তাহা নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে ও স্বীকৃত হইবে। সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ১নং মুখার্জ্জির লেন, বাগবাজার, কলিকাতা; অথবা প্রেসিডেণ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ, হাওড়া।

(স্বাঃ) সারদানন্দ,
সেক্রেটারী,—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।

— —

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান।

(৬)

(স্বামী সারদানন্দ)

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের এক দিবস এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর স্থূলদেহের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে এবং তাহার গলার সংযোগ স্থলে পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি ক্ষত হইয়াছে। বিস্মিত হইয়া তিনি ঐরূপ ক্ষত হইবার কারণ কি ভাবিতেছেন এমন সময়ে শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন নানারূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া আসিয়া লোকে তাঁহাকে স্পর্শ পূর্ব্বক পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের পাপভার ঐরূপে তাঁহাতে সংক্রমিত হওয়ায় তাঁহার শরীরে ক্ষতরোগ হইয়াছে। জীবের কল্যাণ সাধনে তিনি লক্ষ লক্ষ বার জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক দুঃখভোগ করিতে কাতর নহেন, একথা আমরা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে সময়ে সময়ে বলিতে শুনিয়াছিলাম, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আনন্দের সহিত তিনি যে, এখন ঐ বিষয় আমাদিগকে বলিবেন, ইহা বিচিত্র বোধ হইল না, এবং উহাতে তাঁহার অপার করুণার কথা স্মরণ ও আলোচনা করিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু ঠাকুরের শরীর

পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে কোন নূতন লোক আসিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম না করে তদ্বিষয়ে ভক্তদিগের—বিশেষতঃ যুবক ভক্তদিগের মধ্যে উহাতে বিশেষ প্রয়াস উপস্থিত হইল এবং ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার পূর্ব্বজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা স্মরণ পূর্ব্বক এখন হইতে ঠাকুরের পবিত্র দেহ আর স্পর্শ করিবেন না এইরূপ সংকল্প করিয়া বসিলেন। আবার নরেন্দ্র প্রমুখ বিরল কোন কোন ব্যক্তি উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া অন্যকৃতকর্ম্মের জন্য অন্যের স্বেচ্ছায় ফলভোগ করারূপ যে মতবাদ খৃষ্টান বৈষ্ণব প্রভৃতি কোন কোন ধর্ম্মের মূল ভিত্তিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে উহাতে তাহারই সত্যতার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া ঐ বিষয়ের চিন্তা ও গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন।

ঠাকুরের নিকটে নূতন লোকের গমনাগমন নিবারণের চেষ্টা দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'চেষ্টা করিতেছ কর, কিন্তু উহা সম্ভবপর নহে—কারণ, উনি (ঠাকুর) যে, ঐ জন্যই দেহধারণ করিয়াছেন।' ফলে দেখা গেল, সম্পূর্ণ অপরিচিত, লোক সকলকে নিষেধ করিতে পারিলেও ভক্তগণের পরিচিত নবাগত ব্যক্তি সকলকে নিবারণ করা সম্ভবপর হইল না। সুতরাং নিয়ম হইল, ভক্তগণের মধ্যে কাহারও সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলে নবাগত কাহাকেও ঠাকুরের নিকটে যাইতে দেওয়া হইবে না এবং ঐরূপ ব্যক্তি সকলকে পূর্ব্ব হইতে বলিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম না করেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত কাহার কাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া মধ্যে মধ্যে উক্ত নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইতে লাগিল।

ঐরূপ নিয়ম লইয়া একদিন এক রঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। গিরিশ চন্দ্র পরিচালিত নাট্যশালায় ধর্ম্মমূলক নাটক বিশেষের অভিনয় দর্শন করিতে ঠাকুর এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে গমন করিয়াছিলেন এবং নাটকের প্রধান ভূমিকা যে অভিনেত্রী গ্রহণ করিয়াছিল তাহার অভিনয়দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে ঐ দিন উক্ত অভিনেত্রী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের পাদ বন্দনা

করিবার সৌভাগ্যেরও অধিকারিণী হইয়াছিল। তদবধি সে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিত এবং আর এক দিবস তাঁহার পুণ্য দর্শন লাভ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ঠাকুরের নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া সে এখন তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুত কালীপদ ঘোষের সহিত পরিচিত থাকায় বিশেষ অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক ঐ বিষয়ের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইল। কালীপদ সকল বিষয়ে গিরিশ চন্দ্রের অনুগামী ছিলেন এবং ঠাকুরকে যুগাবতার বলিয়া ধারণা করায় দুষ্কৃতকারী অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হইবে একথায় আস্থাবান ছিলেন না। সুতরাং ঠাকুরের নিকটে উক্ত অভিনেত্রীকে আনয়ন করিতে তাঁহার মনে কোনও রূপ দ্বিধা বা ভয় আসিল না। গোপনে পরামর্শ স্থির করিয়া এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি তাহাকে পুরুষের ন্যায় হ্যাট কোটে সজ্জিত করিয়া শ্যামপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজ বন্ধু বলিয়া আমাদিগের নিকট পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ঠাকুরের সমীপে লইয়া যাইয়া তাহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। ঠাকুরের ঘরে তখন আমরা কেহই ছিলাম না, সুতরাং ঐরূপ করিবার পথে তাঁহাকে কোন বাধাই পাইতে হইল না। আমাদিগের চক্ষে ধূলী দিবার জন্যই অভিনেত্রী ঐরূপ বেশে আসিয়াছে জানিয়া রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহস ও দক্ষতার প্রশংসা পূর্ব্বক তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঈশ্বরে বিশ্বাসবতী ও তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিবার জন্য তাহাকে দুই চারিটি তত্ত্ব কথা বলিয়া অল্পক্ষণ পরে বিদায় দিলেন। সেও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক কালীপদর সহিত চলিয়া যাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে আমরা পরে একথা জানিতে পারিলাম এবং আমরা প্রতারিত হওয়ায় তিনি হাস্য পরিহাস ও আনন্দ করিতেছেন দেখিয়া কালীপদর উপরে বিশেষ ক্রোধ করিতে পারিলাম না।

ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং তাঁহার সেবা করিবার ফলে ভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তিবিশ্বাস দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেও এক বিষয়ে তাহাদিগের মনের গতি বিপদ সঙ্কুল বিপরীত পথে যাইবার সম্ভাবনা এখন উপস্থিত হইয়াছিল। কঠোর ত্যাগ এবং কষ্টসাধ্য সংযমের আদর্শ অপেক্ষা সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাসই তাহাদিগের নিকটে এক্ষণে অধিকতর প্রিয় হইতেছিল। ত্যাগ ও সংযমকে ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক উদিত না হইলে ঐ প্রকার ভাবোচ্ছ্বাসসকল ধর্ম্মমূলক হইলেও যে, মানবকে কাম ক্রোধাদি রিপুর সহিত সংগ্রামে জয়ী হইবার সামর্থ্য দিতে পারে না একথা তাহাবা বুঝিতে পারিতেছিল না। ঐরূপ হইবার অনেকগুলি কারণ একে একে উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম সহজ বা সুখসাধ্য পথ ও বিষয়কে অবলম্বন করিতে যাওয়াই মানবের সাধারণ প্রকৃতি। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে যাইয়াও সে ঐজন্য সংসার ও ঈশ্বর—ভোগ ও ত্যাগ উভয় দিক রক্ষা করিয়া চলিতে চাহে। ভাগ্যবান কোন কোন ব্যক্তিই তদুভয়কে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া ধারণা করে এবং ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগরূপ আদর্শকে কাটিয়া ছাঁটিয়া অনেকটা কমাইয়া না আনিলে ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য হওয়া অসম্ভব, একথা বুঝিয়া ঐরূপ ভ্রমে পতিত হয় না। ঐরূপে উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া যাহারা চলিতে চাহে তাহারা শীঘ্রই ত্যাগাদর্শেরদিকে এতটা পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য ভাবিয়া সীমা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক চিরকালের নিমিত্ত সংসারে নোঙর ফেলিযা বসে। ঠাকুর ঐজন্য কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন সে ঐরূপে নোঙর ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে কি না এবং ঐরূপ করিয়াছে বুঝিলে ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগরূপ আদর্শের সে যতটা লইতে পারিবে ততটা মাত্র প্রথমে তাহার নিকটে প্রকাশ করিতেন। ঐজন্যই দেখা যাইত অধিকারীভেদে তাঁহার উপদেশ বিভিন্ন প্রকারের হইতেছে, অথবা তাঁহার গৃহী ও যুবকভক্তদিগকে তিনি সাধন সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকারের শিক্ষা দিতেছেন। ঐজন্যই আবার, সর্ব্ব-

সাধারণকে উপদেশ দিবার কালে তিনি বলিতেন, 'কলিতে কেবলমাত্র শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ত্তন ও নারদীয়ভক্তি।' সাধারণের মধ্যে তখন ধর্ম্ম ও শাস্ত্র চর্চ্চা এতটা লুপ্ত হইয়াছিল যে, 'নারদীয় ভক্তি' কথার অর্থও শতের মধ্যে একজন বুঝিত কি না সন্দেহ। উহাতেও যে, ঈশ্বর প্রেমে সর্ব্বস্বত্যাগের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে একথা লোকের হৃদয়ঙ্গম হইত না। সুতরাং ঠাকুরের অনভিজ্ঞ ভক্তগণ যে দুর্ব্বল প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া সময়ে সময়ে সংসার ও ধর্ম্ম উভয় বজায় রাখিবার ভ্রমে পতিত হইবেন না এবং সুখসাধ্য ভাবুকতার বৃদ্ধিটাকেই ধর্ম্মলাভের চূড়ান্ত বলিয়া ধরিয়া লইবেন না একথা বলা যায় না।

আবার ঠাকুরের কঠোর সংযম ও তপস্যাদি আমরা তাঁহার নিকটে যাইবার পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার অলৌকিক ভাবুকতা কোন্ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহা দেখিতে না পাওয়া ভক্তগণের ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইবার অন্যতম কারণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ বিষয়ের চূড়ান্ত কারণ উপস্থিত হইল, যখন গিরিশ চন্দ্র ঠাকুরের আশ্রয় লাভ এবং তাঁহাকে যুগাবতার বলিয়া স্থির ধারণা পূর্ব্বক প্রাণের উল্লাসে সাধারণের সম্মুখে ঐকথা হাঁকিয়া ডাকিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা ইতিপূর্ব্বে অনেকের প্রাণে উপস্থিত হইলেও তাহারা সকলে তাঁহার নিষেধ মানিয়া ঐ বিষয় প্রাণের মধ্যে লুকায়িত রাখিয়াছিল—কারণ ঠাকুর চিরকাল একথা বলিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার দেহরক্ষার অনতিকাল পূর্ব্বেই বহুলোকে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া জানিতে পারিবে। গিরিশ চন্দ্রের মনেরগঠন অন্যরূপ ছিল, তিনি দুষ্কর্ম্ম বা সুকর্ম্ম যাহা কিছু করিতেন আজীবন কখনও লুকাইয়া করিতে পারেন নাই, সুতরাং ঐ বিষয়েও ঠাকুরের নিষেধ মানিয়া চলিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রখর বুদ্ধি, উচ্চাবচ ঘটনাবলীপূর্ণ বিচিত্র জীবন এবং প্রাণের অসীম উৎসাহ ও বিশ্বাসই যে, তাঁহাকে ঠাকুরের দিব্যশক্তির অনন্ত প্রভাবের কথা বুঝাইয়া তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে সহায়তা করিয়াছে একথা ভুলিয়া যাইয়া তিনি

স্বয়ং যাহা করিয়াছেন তাহাই করিবার জন্য সকলকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ফলে আন্তরিকতার পরিবর্তে লোকে মুখে বকলমা দিয়াছি, আত্মসমর্পণ করিয়াছি ইত্যাদি বলিয়া সাধন, ভজন, ত্যাগ ও তপস্যাদির প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা পূর্ব্বক ধর্ম্মলাভ ব্যাপারটাকে সুখসাধ্য করিয়া লইল। ঠাকুরের প্রতি গিরিশ চন্দ্রের অসীম ভালবাসা ঐরূপে ঐবিষয় প্রচারের পথে অন্তরায় হইতে পারিত, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, যুগযুগান্তের গ্লানি দূর পূর্ব্বক অভিনব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের জন্য যাঁহার দেহধারণ এবং ত্রিতাপে তাপিত জীবকুলকে আশ্রয় দিবার জন্যই যিনি জন্মজরাদি দুঃখ কষ্ট স্বেচ্ছায় বহন করিতেছেন, অভীষ্ট কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার দেহাবসান কখন সম্ভবপর নহে। সুতরাং ঠাকুরের আশ্রয় লাভ পূর্ব্বক লোকে তাঁহার ন্যায় শান্তি ও দিব্যোল্লাসের অধিকারী হইবে বলিয়া তিনি যে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন তাহাতে দূষণীয় কিছুই নাই।

গিরিশচন্দ্রের প্রখর বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের সম্মুখে রামচন্দ্র প্রমুখ অনেক প্রবীণ গৃহীভক্তের বুদ্ধি তখন ভাসিয়া গিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি রামচন্দ্র বৈষ্ণববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং দিব্যশক্তির বিকাশ দেখিয়া তিনি যে ঠাকুরকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিবেন ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু গিরিশ চন্দ্রের প্রচারের পূর্ব্বে তিনি উহা অনেকটা রাখিয়া ঢাকিয়া লোক সমক্ষে প্রকাশ করিতেন। এখন গিরিশ চন্দ্রের সহায়তা পাইয়া তাঁহার উৎসাহ ঐ বিষয়ে সম্যক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি এখন ঠাকুরকে অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণাবতারে কে কোন্ সাঙ্গোপাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, সময়ে সময়ে তদ্বিষয়ের জল্পনাও করিতে লাগিলেন এবং বলা বাহুল্য, ভাবুকতার সাময়িক উচ্ছ্বাসে যাহাদিগের এখন শারীরিক বিকৃতি এবং কখন কখন বাহ্য সংজ্ঞার লোপ হইতেছিল তাহারা তৎকৃত সিদ্ধান্তে উচ্চস্থান লাভ করিতে থাকিল।

ঠাকুরের যুগাবতারত্বে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ভক্তগণের অনেকে যখন ঐরূপে ভাবুকতার উচ্ছ্বাসে অঙ্গ ঢালিতেছিল তখন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঢাকা হইতে আগমন এবং ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া সকলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা যে, তিনি ঢাকায় গৃহমধ্যে বসিয়া ধ্যান করিবার কালে ঠাকুর তথায় সশরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ও তিনি (বিজয়) তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বহস্তে স্পর্শ করিয়া দেখিয়াছিলেন* —অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগের ন্যায় ফলদ হইয়াছিল। ঐরূপে নানাপ্রকারে ভাবুকতার বৃদ্ধিতে ভক্তগণের মধ্যে পাঁচ সাত জনের তখন ভজন সঙ্গীতাদি শুনিবামাত্র বাহ্য সংজ্ঞার আংশিক লোপ ও শারীরিক বিকৃতি উপস্থিত হইতেছিল এবং অনেকেই সহজ বুদ্ধি ও জ্ঞান বিচারের প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঠাকুরের দৈবশক্তি প্রভাবে কখন কি অঘটন ঘটিয়া বসিবে এইরূপ একটা ভাব লইয়া সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতে অভ্যস্ত হইতেছিল।

ঐরূপে ভাবুকতার বৃদ্ধিই যখন ধর্ম্মের চূড়ান্ত বলিয়া ভক্তগণের মধ্যে পরিগণিত হইতেছিল তখন ত্যাগ, সংযম ও নিষ্ঠাদির তুলনায় উহা যে অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু এবং উহার নির্বাধ প্রশ্রয়ে ভবিষ্যতে বিষম বিপদের সম্ভাবনা আছে—একথা ঠাকুর যাঁহাকে ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাসন সর্ব্বদা প্রদান করিতেন সেই সূক্ষ্মদর্শী নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি ঐবিষয় তাহাদিগকে বুঝাইয়া উহার হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তগণের ঐরূপে বিপথে যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়াও ঠাকুর নিশ্চেষ্ট ছিলেন কেন? উত্তরে বলা যায় তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, কিন্তু যে ভাবুকতায় কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই, তাহাকে ঈশ্বরলাভের অন্যতম পথ জানিয়া ঐসকল ভক্তগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ঐপথের যথার্থ অধিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে ঐ পথে চালিত করিবার সময় ও সুযোগ

---

* গুরুভাব (উত্তরার্দ্ধ) ৫ম অধ্যায় দেখ।

অন্বেষণ করিতেছিলেন—কারণ তাঁহাকে আমরা বারংবার বলিতে শুনিয়াছি, 'ইচ্ছা করিলেই সহসা কোন বিষয় সংসিদ্ধ হয় না, কালে হইয়া থাকে,' অথবা ঐ বিষয়ের সিদ্ধি উপযুক্ত কালের আগমন প্রতীক্ষা করে। হইতেও পারে, ভক্তগণের ঐ ভ্রম দূর করিতে নরেন্দ্র নাথকে বদ্ধ পরিকর দেখিয়া ঠাকুর উহার ফলাফল লক্ষ্য করিতেছিলেন, অথবা নরেন্দ্রনাথকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঐ বিষয় সংসিদ্ধ করাই তাঁহার অভীপ্সিত ছিল।

দৃঢবদ্ধ শরীর এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ মন বিশিষ্ট ঠাকুরের যুবক ভক্তমণ্ডলীই তাঁহার কথা সহজে ধরিতে বুঝিতে পারিবে ভাবিয়া নরেন্দ্রনাথ নানা যুক্তিতর্ক সহায়ে তাহাদিগকে সর্ব্বদা বলিতে লাগিলেন, যে ভাবোচ্ছাস মানবজীবনে স্থায়ী পরিবর্ত্তন উপস্থিত না করে, যাহার প্রভাব মানবকে এইক্ষণে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া পরক্ষণে কামকাঞ্চনের অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না, তাহার গভীরতা নাই, সুতরাং তাহার মূল্যও অতি অল্প। উহার প্রভাবে কাহারও শারীরিক বিকৃতি যথা অশ্রু পুলকাদি, অথবা কিছুক্ষণের জন্য বাহ্য সংজ্ঞার আংশিক লোপ হইলেও তাঁহার নিশ্চয় ধারণা, উহা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রসূত। মানসিক শক্তিবলে উহাকে দমন করিতে না পারিলে পুষ্টিকর খাদ্য এবং চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

নরেন্দ্র বলিতেন, "ঐরূপ অঙ্গবিকার এবং বাহ্য সংজ্ঞা লোপের ভিতর অনেকটা কৃত্রিমতা আছে। সংযমের বাঁধ যত উচ্চ এবং দৃঢ় হইবে মানসিক ভাব তত গভীর হইতে থাকিবে, এবং বিরল কোন কোন ব্যক্তির জীবনেই আধ্যাত্মিক ভাবরাশির প্রবলতায় উত্তাল তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া ঐরূপ সংযমের বাঁধকেও অতিক্রম পূর্ব্বক অঙ্গবিকার এবং বাহ্যসংজ্ঞার বিলোপ রূপে প্রকাশিত হয়। নির্বোধ মানব ঐকথা বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত ভাবিয়া বসে। সে মনে করে ঐরূপ অঙ্গবিকৃতি ও সংজ্ঞাবিলুপ্তির ফলেই বুঝি ভাবের গভীরতা সম্পাদিত হয় এবং তজ্জন্য ঐ সকল যাহাতে

তাহার শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে থাকে। ঐরূপে স্বেচ্ছা প্রণোদিত চেষ্টা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয় এবং তাহার স্নায়ু সকল দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া ঈষন্মাত্র ভাবের উদয়েও তাহাতে ঐ বিকৃতি সকল উপস্থিত করে। ফলে উহার অবাধ প্রশ্রয়ে মানব চরমে চিররুগ্ন অথবা বাতুল হইয়া যায়। ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইয়া শতকরা আশীজন জুয়াচোর, এবং পনর জন আন্দাজ উন্মাদ হইয়া যায়। অবশিষ্ট পাঁচ জন মাত্র পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎকারে ধন্য হইয়া থাকে। অতএব সাবধান।'

নরেন্দ্র নাথের পূর্ব্বোক্ত কথা সকল সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমরা প্রথম প্রথম বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। কিন্তু অনতিকাল পরে ঘটনা চক্রে যখন জানিতে পারা গেল নির্জ্জনে বসিয়া ভাবোদ্দীপক পদাবলী গাহিতে গাহিতে অনুরূপ অঙ্গবিকৃতি সকল আনয়নের জন্য জনৈক চেষ্টা করিয়া থাকে—ভাবাবেশে বাহ্যসংজ্ঞার আংশিক বিলোপ হইলে অপর জনৈক যেরূপ মধুর নৃত্য করে সেইরূপ নৃত্য সে পূর্ব্বে অভ্যাস করিয়াছিল—এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নৃত্য দেখিবার স্বল্পকাল পরে অপর এক ব্যক্তিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তদনুরূপ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাঁহার (নরেন্দ্র নাথের) কথার সত্যতা আমাদিগের অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইল। আবার, জনৈকের পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন ভাবাবেশ হইতে দেখিয়া যেদিন তিনি তাহাকে বিরলে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া ভাবসংযম অভ্যাস ও অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং এক পক্ষকাল ঐরূপ করিবার ফলে সে যখন অনেকটা সুস্থ ও সংযত হইতে পারিল তখন নরেন্দ্র নাথের কথায় অনেকে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগের ন্যায় ভাবাবেশে অঙ্গবিকৃতি ও বাহ্যসংজ্ঞাবিলুপ্তি হয় নাই বলিয়া আপনাদিগকে অভাগ্যবান বলিয়া আর ধারণা করিতে পারিল না।

যুক্তিতর্ক অবলম্বনে ঐবিষয় প্রচার করিয়াই নরেন্দ্র ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু কাহারও ভাবুকতায় কিছুমাত্র কৃত্রিমতার সন্ধান পাইলে ঐ বিষয় লইয়া সকলের সমক্ষে ব্যঙ্গ পরিহাসে তাহাকে সময়ে সময়ে

বিশেষ অপ্রতিভ করিতেন। আবার পুরুষের স্ত্রীজনোচিত ভাবানুকরণ যথা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচলিত সখীভাবাদি সাধনাভ্যাস কখন কখন কিরূপ হাস্যাস্পদ আকার ধারণ করে তদ্বিষয়ে প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি ভক্তদিগের মধ্যে কখন কখন হাস্যের রোল তুলিতেন এবং আমাদিগের মধ্যে যাহাদিগের ঐরূপ ভাবপ্রবণতা ছিল তাহাদিগকে সখীশ্রেণীভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া পরিহাস করিতেন। ফল কথা, ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া পুরুষ নিজ পুরুষকার, তত্ত্বানুসন্ধান প্রবৃত্তি, ওজস্বীতাদি বিসর্জ্জন দিয়া সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিবে এবং স্ত্রীজনোচিত ভাবানুকরণ, বৈষ্ণবপদাবলী ও রোদন মাত্র অবলম্বন করিবে ইহা—পুরুষসিংহ নরেন্দ্রনাথ একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না—তজ্জন্য ঠাকুরের পুরুষ ভাবাশ্রয়ী জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বিশিষ্ট ভক্তদিগকে 'শিবের ভূত অথবা দানাশ্রেণীভুক্ত' বলিয়া পরিহাস পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতেন এবং তদ্বিপরীত সকলকে পূর্ব্বোক্তরূপে 'সখী শ্রেণীভুক্ত' বলিতেন।

ঐরূপে যুক্তিতর্কে এবং ব্যঙ্গ পরিহাস সহায়ে ভাবুকতার গণ্ডী ভগ্ন করিয়াই নরেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হন নাই কাহারও কোনরূপ ভাব ভঙ্গ করিয়া তাহার স্থলে অবলম্বনস্বরূপে অন্য ভাব যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় ততক্ষণ প্রচার কার্য্য সুসম্পন্ন ও ফলদ হয় না—একথা তিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেন এবং তজ্জন্য ঐবিষয়ে এখন হইতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অবসরকালে যুবকভক্ত-সকলকে দলবদ্ধ করিয়া তিনি সংসারের অনিত্যতা বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরভক্তিমূলক সঙ্গীত সকল তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া গাহিয়া তাহাদিগের প্রাণে ত্যাগ বৈরাগ্য এবং ভক্তি ভাব অনুক্ষণ প্রদীপ্ত রাখিতেন। ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া অনেকে তখন তাঁহার মধুর স্বরলহরী উৎক্ষিপ্ত 'কেয়া দেলূমান তামিল পেয়ারা আখের মাট্টিমে মিল যানা'—অথবা 'জীবন মধুময় তব নাম গানে, হয় হে অমৃতসিন্ধু চিদানন্দ ঘন হে' অথবা,

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তাদি নাহং
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণ নেত্রং
ন চ ব্যোম ভূমির্ণতেজোনবায়ু
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্—

প্রভৃতি সঙ্গীত ও স্তবাদি শ্রবণে বৈরাগ্য ও ঈশ্বর প্রেমের উত্তেজনায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন! ঠাকুরের জীবনের গভীর ঈশ্বরানুরাগ প্রভৃত সাধন কথা সকল বিবৃত করিয়া কখন বা তিনি তাহাদিগকে তাঁহার মহিমা জ্ঞাপনে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতেন এবং 'ঈশানুসরণ' গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন, 'প্রভুকে যে যথার্থ ভালবাসিবে তাহার জীবন সর্ব্বতোভাবে শ্রীপ্রভুর জীবনের অনুযায়ী হইয়া গঠিত হইয়া উঠিবে, নিশ্চয়—অতএব ঠাকুরকে আমরা ঠিক্ ঠিক্ ভালবাসি কি না তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উহা হইতেই পাওয়া যাইবে।' আবার 'অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা তাহা কর'—ঠাকুরের ঐকথা তাহা-দিগকে স্মরণ করাইয়া বুঝাইয়া দিতেন, তাঁহার সকল প্রকার ভাবুকতা ঐ জ্ঞানকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হইয়া থাকে—অতএব ঐজ্ঞান যাহাতে সর্ব্বাগ্রে লাভ করিতে পারা যায় তজ্জন্য তাহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

নূতন তত্ত্বসকলের পরীক্ষাপূর্ব্বক গ্রহণে তিনি তাহাদিগকে অনেক সময়ে প্রোৎসাহিত করিতেন। আমাদের স্মরণ আছে, ধ্যান বা চিত্তৈকাগ্রতা সহায়ে আপনার ও অপরের শারীরিক ব্যাধি দূর করা যাইতে পারে, ঐকথা শুনিয়া তিনি একদিন আমাদিগকে একত্র মিলিত করিয়া ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি দূর করিবার মানসে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে ঐরূপ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐরূপ আবার অযুক্তিকর বিষয় সকল হইতে ভক্তগণ যাহাতে দূরে অবস্থান করে তদ্বিষয়েও তিনি সর্ব্বদা প্রযাস পাইতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে—

মতিঝিলের দক্ষিণাংশ যথায় কাশীপুরের রাস্তার সহিত সংযুক্ত

হইয়াছে তাহারই সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীর বাটি ছিল। নানা সদ্‌গুণভূষিত হইলেও চক্রবর্ত্তী-মহাশয় লোকমান্যের জন্য নিরন্তর লালায়িত ছিলেন। বোধ হয় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি লোকমান্য পাওয়া যাইত তাহা হইলে তাহা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কিসে লোকে তাঁহাকে ধনী, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক, দানশীল ইত্যাদি যাবতীয় সদ্‌গুণশালী বলিবে এই ভাবনা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য নিয়মিত করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহাকে লোকের নিকটে হাস্যাস্পদ করিয়াও তুলিত। চক্রবর্ত্তী মহাশয় কোন সময়ে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'প্রাচ্য-আর্য্য-শিক্ষা-পরিষৎ', তাঁহার এক মাত্র পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন 'মৃগাঙ্কমৌলী পূততুণ্ডী", বাটিতে একটি হরিণ ছিল তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'কপিঞ্জল'—কারণ, তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির ছোট খাট সরল নাম রাখা কি শোভা পায়? তাঁহার ইংরাজী, সংস্কৃত নানা গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল। আলাপ হইবার পরে একদিন নরেন্দ্র নাথের সহিত তাঁহার বাটিতে যাইয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনি এত গ্রন্থ সব পড়িয়াছেন?' উত্তরে তিনি সবিনয়ে উহা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নরেন্দ্র উহার মধ্যস্থিত কতকগুলি গ্রন্থ বাহির করিয়া উহাদিগের পাতা কাটা নাই দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, 'কি জান ভায়া লোকে আমার পড়া পুস্তকগুলি লইয়া যাইয়া আর ফিরাইয়া দেয় নাই, তাহার স্থলে এই পুস্তকগুলি পুনরায় কিনিয়া রাখিয়াছি, এখন আর কাহাকেও পুস্তক লইয়া যাইতে দি না।' নরেন্দ্র নাথ কিন্তু স্বল্প দিনেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংগৃহীত যাবতীয় পুস্তকেরই পাতা কাটা নাই! সুতরাং ঐসকল গ্রন্থ যে তিনি কেবলমাত্র লোকমান্য লাভ ও গৃহশোভা বর্দ্ধনের জন্য রাখিয়াছেন তদ্বিষয়ে নরেন্দ্রের একরূপ দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল।

আমাদিগের সহিত আলাপ হইবার কালে ধর্ম্মসাধনার কথা-

প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনাকে জ্ঞান মার্গের সাধক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। কলিকাতাবাসী ভক্ত সকলের ঠাকুরের নিকটে যাইবার বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে মহিমাচরণ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন এবং কোন কোন পর্ব্বদিবসে পঞ্চবটীতলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, রুদ্রাক্ষ ধারণ ও একতারা গ্রহণ পূর্ব্বক আড়ম্বর করিযা সাধনায় বসিতেন। গৃহে ফিরিবার কালে ব্যাঘ্রাজীন খানি ঠাকুরের ঘরেব এক কোণে দেয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিয়া যাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে 'এক আঁচড়েই' চিনিয়া লইয়াছিলেন। কারণ, ঐ ব্যাঘ্রাজীনখানি কাহার একথা আমাদিগের একজন এক দিবস প্রশ্ন করিলে বলিয়াছিলেন, 'ওখানি মহিম চক্রবর্ত্তী রাখিয়া গিযাছে, কেন জান? লোকে উহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে ওখানি কার এবং আমি তাহার নাম করিলে ধারণা করিবে মহিম চক্রবর্ত্তী একটা মস্ত সাধক।'

দীক্ষা সম্বন্ধে কথা উঠিলে মহিম বাবু কখন বলিতেন 'আমার গুরুদেবের নাম আগমাচার্য্য ৺মরুবল্লভ' আবার কখন বলিতেন, ঠাকুরের ন্যায় তিনিও পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত তোতাপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। 'পশ্চিমে তীর্থ পর্য্যটন কালে এক স্থানে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম এবং দীক্ষিত হইয়াছিলাম, ঠাকুরকে তিনি ভক্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে বলিয়াছেন এবং আমাকে জ্ঞান মার্গের সাধক হইয়া সংসারে থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন'। বলা বাহুল্য ঐকথা কতদূর সত্য তাহা তিনি স্বয়ং এবং সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষই জানিতেন।

সাধনার মধ্যে দেখা যাইত মহিম বাবু যখন তখন এবং যেখানে সেখানে একতারার সুরের সহিত গলা মিলাইয়া প্রণবোচ্চারণ, মধ্যে মধ্যে এক আধটি উত্তরগীতাদি পুস্তকের শ্লোক পাঠ ও হুঁকার ধ্বনি করিতেন। তিনি বলিতেন, উহাই সনাতন জ্ঞানমার্গের সাধনা, উহা করিলে অন্য কোনও সাধনা করিবার প্রয়োজন নাই। উহাতেই কুলকুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া

উঠিবে ও ঈশ্বর দর্শন হইবে। মহিম বাবুর বাটিতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বোধ হয় প্রতি বৎসর ৺জগদ্ধাত্রী পূজাও হইত—উহা হইতে অনুমিত হয় তিনি শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষজীবনে ইনি শাক্তসাধনপ্রণালীই অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ, তখন ইঁহাকে একখানি ছোট বগি গাড়িতে করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমন করিবার কালে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতে শুনা যাইত 'তারা তত্ত্বমসি, ত্বমসি তৎ'। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অল্প স্বল্প জমীদারী ছিল, তাহার আয় হইতেই তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ হইত।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান করিবার কালে মহিম বাবু দুই তিন বার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তখন ঠাকুরের সহিত কুশল প্রশ্নাদি করিবার পরে তিনি সাধারণের নিমিত্ত যে ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহাতে আসিয়া বসিতেন এবং একতারা সংযোগে মন্ত্রসাধনে এবং উহারই ভিতর মধ্যে মধ্যে অপরের সহিত ধর্ম্মালাপে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার গৈরিক পরিহিত সুন্দর কান্তি, বিশাল বপু এবং বাক্য ছটায় মুগ্ধ হইয়া অনেকে তখন তাঁহাকে আধ্যাত্মিক নানা প্রশ্ন করিতে থাকিত। ঠাকুরও কখন কখন তাঁহাকে বলিতেন, তুমি পণ্ডিত, (উপস্থিত সকলকে দেখাইয়া ইহাদিগকে কিছু উপদেশ দাওগে। কারণ কতকগুলি শিষ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া নিজ নাম জাহির করাটা যে তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা একথা তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না।

শ্যামপুকুরে আসিয়া মহিম বাবু এক দিন ঐরূপে নানা কথা কহিতেছেন এবং অন্য সকল প্রকার সাধনোপায়কে হীন করিয়া তাঁহার অবলম্বিত সাধনপথই শ্রেষ্ঠ এবং সহজ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের যুবক ভক্ত সকলে তাঁহার ঐকথা সকল বিনা প্রতিবাদে শুনিতেছে দেখিয়া নরেন্দ্র নাথের আর সহ্য হইল না। তিনি বিপরীত তর্ক উত্থাপিত করিয়া মহিম বাবুর কথা অযুক্তিকর দেখাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আপনার ন্যায় একতারা

বাজাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলেই যে ঈশ্বর দর্শন উপস্থিত হইবে তাহার প্রমাণ কি? উত্তরে মহিম বাবু বলিলেন, নাদই ব্রহ্ম ঐ স্বরসংযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণের প্রভাবে ঈশ্বরকে দেখা দিতেই হইবে, অন্য আর কিছু করিবার আবশ্যক নাই'। নরেন্দ্র বলিলেন, 'ঈশ্বর আপনার সহিত ঐরূপ লেখা পড়া করিয়াছেন না কি? অথবা ঈশ্বর মন্ত্রৌষধি-বশঃ সর্পের ন্যায়—সুর চড়াইয়া হুম্ হাম্ করিলেই অবশ হইয়া সুড় সুড় করিয়া সম্মুখে নামিয়া আসিবেন'। বলা বাহুল্য, নরেন্দ্র নাথের তর্কের জন্য মহিম বাবুর প্রচার কার্য্যটা সেদিন বিশেষ জমিল না এবং তিনি ঐ দিবস শীঘ্র শীঘ্র বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত যথার্থ সাধক সকলে যাহাতে ঠাকুরের ভক্ত-দিগের নিকটে বিশেষ সম্মান পায় তদ্বিষয়েও নরেন্দ্র নাথের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিতেন, সাধারণে যেরূপে অপর সকলের নিন্দা এবং কেবল মাত্র নিজ সম্প্রদায়ের সাধক সকলকেই শ্রদ্ধা ভক্তি করে, ঐরূপ করিলে ঠাকুরের 'যত মত তত পথ' রূপ মতবাদের উপরে—সুতরাং ঠাকুরের উপরেই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। শ্যামপুকুরে থাকিবার কালে ঐরূপ একটি ঘটনার কথা আমাদিগের স্মরণ হইতেছে—

প্রভুদয়াল মিশ্র নামক জনৈক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য এক দিন উপস্থিত হইলেন। গেরুয়া পরিহিত দেখিয়া আমরা তাঁহাকে প্রথমে খৃষ্টান বলিয়া বুঝিতেই পারি নাই। পরে কথাপ্রসঙ্গে তিনি যখন তাঁহার স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিলেন তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, তিনি খৃষ্টান হইয়া গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার করেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, 'ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ভাগ্যক্রমে ঈশামসির উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ ইষ্টদেবতা রূপে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই কি আমাকে আমার পিতৃপিতামহাগত চাল চলনাদি ছাড়িয়া দিতে হইবে? আমি যোগশাস্ত্রে বিশ্বাস এবং ঈশাকে ইষ্টদেবতা রূপে অবলম্বন করিয়া নিত্য যোগাভ্যাস করিয়া থাকি। জাতিভেদে আমার বিশ্বাস না থাকি-

লেও যাহার তাহার হস্তে ভোজনে যোগাভ্যাসের হানি হয়, এ কথায় আমি বিশ্বাস করি এবং নিত্য স্বপাকে হবিষ্যান্ন খাইয়া থাকি। উহার ফলে খৃষ্টান হইলেও যোগাভ্যাসের ফল যথা, জ্যোতিঃ দর্শনাদি আমার একে একে উপস্থিত হইতেছে। ভারতের ঈশ্বর প্রেমিক যোগীরা সনাতন কাল হইতে গৈরিক পরিধান করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং উহাপেক্ষা আমার নিকটে অন্য কোন প্রকার বসন কি প্রিয়-তর হইতে পারে'? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া নরেন্দ্র নাথ তাঁহার প্রাণের কথা সকল ঐরূপে একে একে বাহির করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশিষ্ট সাধু ও যোগী বলিয়া জানিয়া তাহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগকেও ঐরূপ করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদিগের অনেকেও উহাতে তাঁহার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম ও তাঁহার সহিত একত্রে ঠাকুরের প্রসাদী মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়াছিল। ঠাকুরকে ইনি সাক্ষাৎ ঈশা বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঐরূপে নরেন্দ্র নাথ যখন ঠাকুরের ভক্তগণকে সুপথে পরিচালিত করিতে নিযুক্ত ছিলেন তখন ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। ডাক্তার সরকার পূর্ব্বে যে সকল ঔষধ প্রয়োগে স্বল্পাধিক ফল পাইয়াছিলেন ঐ সকল ঔষধে এখন আর কোন উপকার হইতেছে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং কলিকাতায় রুদ্ধ দূষিত বায়ুর জন্য ঐরূপ হইতেছে স্থির করিয়া সহরের বাহিরে কোন বাগান বাটীতে ঠাকুরকে রাখিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিলেন। তখন অগ্রহায়ণের অর্দ্ধেক অতীত হইয়াছে। পৌষ মাসে ঠাকুর বাটি পরিবর্ত্তন করিতে চাহিবেন না জানিয়া ভক্তগণ এখন উঠিয়া পড়িয়া ঐরূপ বাগানবাটির অনুসন্ধানে লাগিয়া যাইলেন এবং অনতিকালের মধ্যেই কাশীপুরস্থ মতিঝিলের উত্তরাংশ যেখানে বরাহনগর বাজারে যাইবার বড় রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে তাহারই সম্মুখে রাস্তার অপর (পূর্ব্ব) পার্শ্বে অবস্থিত ৺রাণী কাত্যায়নীর জামাতা ৺গোপাল চন্দ্র ঘোষের উদ্যানবাটি ৮০ টাকা মাসিক ভাড়ায় ঠাকুরের বাসের জন্য

ভাড়া করিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরের পরমভক্ত কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীনিবাসী সুরেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় উক্ত বাটিভাড়ার সমস্ত ব্যয়বহনে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

বাটি স্থির হইলে শুভদিন দেখিয়া শ্যামপুকুর হইতে দ্রব্যাদি লইয়া যাইয়া উক্ত বাটিতে থাকিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির একদিবস পূর্ব্বে অপরাহ্নে ভক্তগণ শ্যামপুকুরের বাসা চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঠাকুরকে কাশীপুরের উদ্যানবাটিতে আনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ধর্ম্ম জিনিষটা কি?*

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

রেল লাইনের উপর দিয়া একখানা প্রকাণ্ড রেলগাড়ী সশব্দে চলিতেছে—একটা ক্ষুদ্রকীট রেল লাইনের উপর দিয়া চলিতেছিল—গাড়ী আসিতেছে জানিতে পারিয়া সে আস্তে আস্তে রেল লাইন হইতে সরিয়া গিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইল। ঐ ক্ষুদ্র কীটটী যদিও এতই নগণ্য যে, রেলগাড়ীর চাপে যেকোন মুহূর্ত্তে তাহার মৃত্যুর সম্ভাবনা—তথাপি সে একটা জীবন্ত পদার্থ, আর রেলগাড়ীটা এত বৃহৎ, এত প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু উহা একটা যন্ত্রমাত্র, একটা জড় এঞ্জিনমাত্র। আপনারা বলিবেন, একটীর জীবন আছে, আর একটী মৃত জড়মাত্র—উহার যতই শক্তি থাক্, উহার গতি ও বেগ যতই প্রবল হউক না কেন, উহা মৃত জড় যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর ঐ ক্ষুদ্র কীটটী যে রেলের উপর দিয়া চলিতেছিল এবং এঞ্জি-নের স্পর্শমাত্রই যাহার নিশ্চিত মৃত্যু হইত, সে ঐ প্রকাণ্ড রেল-

---

* What is Religion নামক প্রবন্ধের অনুবাদ।

গাড়ীটীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও মহিমাসম্পন্ন। উহা যে সেই অনন্ত স্বরূপে-রই একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র, সেই কারণেই অত শক্তিশালী এঞ্জিন হইতেও উহার শ্রেষ্ঠত্ব। কেন উহার এই শ্রেষ্ঠত্ব হইল? জীবিত প্রাণ সম্পন্ন বস্তু হইতে মৃত জড় পদার্থের পার্থক্য বুঝিতে পারি কিসে? যন্ত্রকর্ত্তা যন্ত্রকে যেরূপে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করিয়া উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, উহা সেইটুকু মাত্র কার্য্যই সম্পাদন করে, উহার কার্য্যগুলি জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় নহে। তবে জীবিত ও মৃতের ভিতর কিরূপে প্রভেদ করা যাইবে? জীবিত প্রাণীর ভিতর স্বাধীনতা আছে, তাহার জ্ঞান আছে, আব মৃত জড় বস্তর ভিতর স্বাধীনতা নাই, কারণ, তাহার জ্ঞান নাই, উহা কতকগুলি জড় নিয়মের গণ্ডীতে বদ্ধ। এই যে স্বাধীনতা, যাহা থাকাতে কেবল যন্ত্র হইতে আমাদের বিশেষত্ব—সেই স্বাধীনতা পূর্ণভাবে লাভের জন্যই আমরা সকলে চেষ্টা করিতেছি। আমাদের যত প্রকার চেষ্টা আছে, তাহাদের সকল গুলিরই উদ্দেশ্য—কিসে আমরা অধিকতর স্বাধীন হইব। কারণ, পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হইলেই কেবল আমরা পূর্ণত্ব পাইতে পারি। আমরা জানি বা না জানি, স্বাধীনতা লাভ করিবার এই চেষ্টাই সর্ব্বপ্রকার উপাসনাপ্রণালীর ভিত্তি।

জগতে যত প্রকার উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত আছে, সেইগুলিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তাহা হইলে আমরা দেখিব, অতি অসভ্যজাতিসকল ভূতপ্রেতাদির উপাসনা করিয়া থাকে। পূর্ব্ব পুরুষদিগের আত্মার উপাসনা, সর্পপূজা, জাতীয় দেববিশেষের উপাসনা—এগুলি লোকে কেন করিয়া থাকে? কারণ লোকে যেরূপেই হউক এইটী বুঝিয়া থাকে যে, উক্ত দেবাদি পুরুষগণ আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী এবং তাহারা আমাদের স্বাধীনতায় বাধা দিতেছে। সেই জন্য উাহারা এই সকল পুরুষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে, যাহাতে তাহারা তাহাকে কোনরূপ অনিষ্ট না করিতে পারে অর্থাৎ যাহাতে তাহারা অধিকতর স্বাধীনতালাভ করিতে পারে। ঐ সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষের পূজা করিয়া,

তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদের বরস্বরূপ নানাবিধ কাম্যবস্তু লাভেরও আকাঙ্ক্ষা করে। যেগুলিকে মানুষের নিজ পুরুষকার সহায়ে উপার্জ্জন করা উচিত, সেইগুলিকেই তাহারা দেবতার অনুগ্রহবলে লাভ করিতে চাহে!

যাহা হউক, মোটের উপর এই সকল উপাসনাপ্রণালীর আলোচনায় ইহাই উপলব্ধি হয় যে, সমগ্র জগৎ একটা কিছু অদ্ভুত ব্যাপারের আশা করিতেছে। এই আশা আমাদিগকে একেবারে কখনই পরিত্যাগ করে না, আর আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, আমরা সকলেই অদ্ভুত আজগুবির দিকেই ছুটিয়া চলিযাছি। জীবনের অর্থ ও উহার রহস্যের অবিরাম অনুসন্ধান ছাড়া আমাদের মন বলিতে আর কি বুঝায়? আমরা বলিতে পারি, অশিক্ষিত লোকেই এই আজগুবির অনুসন্ধানে ব্যস্ত, কিন্তু তাহারাই বা কেন উহার অনুসন্ধান করিবে, এ প্রশ্নের হাত ত আমরা সহজে এড়াইতে পারিব না। বাইবেলে দেখা যায় সমগ্র য়াহুদী জগত যীশুখ্রীষ্টের নিকট নিদর্শন স্বরূপ একটা অলৌকিক ঘটনা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত। কিন্তু শুধু য়াহুদীরা কেন, সমগ্র জগৎই যে হাজার হাজার বর্ষ ধরিয়া এইরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখিবারই প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছে। আবার দেখুন, সমগ্র জগতে সকলেরই ভিতর একটা অসন্তোষের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা একটা আদর্শ ধরিলাম, জীবনের একটা লক্ষ্য করিলাম—কিন্তু উহার দিকে অগ্রসর হইয়া অর্দ্ধপথ পঁহুছিতে না পঁহুছিতে নূতন একটা আদর্শ ধরিয়া বসিলাম। নির্দ্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে যাইবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তার পর বুঝিলাম, উহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। সময়ে সময়ে আমাদের এইরূপ অসন্তোষের ভাব আসিতেছে, কিন্তু যদি এই অসন্তোষের শান্তি না হয়, তবে আমাদের এই সকল মানসিক চেষ্টা সমূহের পরিণাম কোথায়? এই সর্ব্বজনীন অসন্তোষের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই, স্বাধীনতা লাভই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য—যতদিন না সে এই স্বাধীনতা লাভ করিতেছে, ততদিন কিছুতেই

তাহার অসন্তোষ দূর হইবার নহে। মানব সর্ব্বদাই স্বাধীনতার অনুসন্ধান করিতেছে, মানবের সমগ্র জীবনটাই এই স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা মাত্র। কিন্তু জন্মগ্রহণ করিবামাত্র নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া থাকে। জন্মিবা মাত্রই যে শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠে, উহার অর্থ আর কিছুই নহে—সে জন্মাইয়াই দেখে, সে নানা অবস্থাচক্রে বদ্ধ—তাই সে যেন ক্রন্দন করিয়া উক্তাবস্থার প্রতিবাদ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। মানবের এই স্বাধীনতা বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হইতেই তাহার এই ধারণা জন্মিয়া থাকে—এমন একজন পুরুষ অবশ্যই আছেন, যিনি সম্পূর্ণ মুক্তস্বভাব। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরধারণা মানবমনের স্বভাবসিদ্ধ। বেদান্তে মানবমনের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সর্ব্বোচ্চ ধারণাকে সচ্চিদানন্দ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহা চিদ্‌ঘন ও স্বভাবতঃই আনন্দঘনস্বরূপ। আমরা অনেক দিন ধরিয়া ঐ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমাদের অভ্যন্তরীণ বাণীকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, আমরা নিয়মের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়া আমাদের স্বাভাবিক মনুষ্যপ্রকৃতির স্ফূর্ত্তিতে বাধা দিবার প্রয়াস পাইতেছি, কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ মানবস্বভাবসুলভ সহজ সংস্কার প্রকৃতির নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতেছে। আমরা ইহার অর্থ না বুঝিতে পারি, কিন্তু অজ্ঞাতসারে আমাদের মানবীয় ভাবের সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের নিম্নস্তরের মনের সঙ্গে উচ্চতর মনের সংগ্রাম চলিয়াছে আর এই প্রতিদ্বন্দ্বীতার সংঘর্ষে নিজের একটা পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া, যাহাকে আমরা আমাদের আমিত্ব বা ব্যক্তিত্ব বলি, তাহাকে বজায় রাখিবার একটা বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়।

এমন কি, নরকের অস্তিত্বও যে মানুষ কল্পনা করিয়াছে, তাহাতে এই অদ্ভুত ব্যাপারটী দেখা যায় যে, আমরা জন্ম হইতেই প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকি—আমাদিগকে জন্মমাত্রই নানারূপ নিয়মে বাঁধিতে চেষ্টা করে—আমরা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া

বলিয়া উঠি—'কোনরূপ নিয়মে আমরা চলিব না'। যখনই আমরা জন্মাই, জীবন প্রবাহের প্রথম আবির্ভাবেই, জীবনের প্রথম ঘটনাই প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ। যতদিন আমরা প্রকৃতির নিয়মাবলী মানিয়া চলি, ততদিন আমরা যন্ত্রের মত—ততদিন জগৎপ্রবাহ নিজ গতিতে চলিতে থাকে—উহার শৃঙ্খল আমরা ভগ্ন করিতে পারি না। নিয়মই মানুষের প্রকৃতিগত হইয়া যায়। কিন্তু যখনই আমাদের ভিতর প্রকৃতির এই বন্ধন ভাঙ্গিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা হয়, তখনই উচ্চস্তরে জীবনের প্রথম উন্মেষ হইযাছে বুঝিতে হইবে। মুক্তি—স্বাধীনতা—আত্মার অন্তস্তল হইতে সদা সর্ব্বদা এই সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কিন্তু হায়, অনন্ত নিয়তিচক্রে সে বদ্ধ—প্রকৃতির শত-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইযা রহিযাছে।

এই যে নাগপূজা—ভূতপ্রেতের উপাসনা এবং বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও সাধনা সহায়ে—অতিপ্রাকৃতিক শক্তিলাভের চেষ্টা দেখা যায়, এগুলির অর্থ কি? কোন বস্তুতে জীবনীশক্তি রহিযাছে, উহার ভিতর একটা যথার্থ সত্তা আছে,—একথা আমরা কেন বলি? অবশ্য এই সকল অনুসন্ধানের ভিতর, জীবনীশক্তিকে বুঝিবার, যথার্থ সত্তাকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টার ভিতরে নিশ্চিতই একটা অর্থ আছে। উহা কখন নিরর্থক, উহা কখন বৃথা হইতে পারে না। ঐগুলি মানবের মুক্তি-লাভের—পূর্ণ স্বাধীনতালাভের প্রতিনিয়ত চেষ্টারই ফলমাত্র। আমরা যে বিদ্যাকে বিজ্ঞানশাস্ত্র নামে অভিহিত করি, তাহা এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিযা আসিতেছে এবং সকল লোকেই সদাই এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির ভিতর ত স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই। উহার ভিতর নিয়ম—কেবল নিয়ম, কিন্তু তথাপি মুক্তির ঐ চেষ্টা চলিয়াছে। বিশাল সূর্য্যমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র পরমাণুটী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রকৃতিরই নিয়মাধীন—এমন কি মানবের পর্য্যন্ত স্বাধীনতা নাই। কিন্তু আমরা একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা অনাদিকাল হইতে প্রাকৃতিক নিয়মাবলির আলোচনা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু মানুষ

আমরাও যে নিয়মের অধীন—একথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না, বিশ্বাস করিতে চাহি না—কারণ, আমাদের আত্মার অন্তস্তল হইতে প্রতিনিয়ত মুক্তি! মুক্তি! স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! এই অনন্ত সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে। মানুষ যখন নিত্যমুক্ত পুরুষস্বরূপ ঈশ্বরের ধারণা লাভ করিয়াছে, তখন সে অনন্তকালের জন্য এই বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া শান্তি পাইতে পারে না। মানুষকে উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে অগ্রসর হইতেই হইবে, আর এ চেষ্টা যদি তাহার নিজের জন্য না হইত, তবে সে ইহা এক অতি কষ্টকর ব্যাপার বলিয়া মনে করিত। মানব নিজের দিকে তাকাইয়া বলিয়া থাকে, 'আমি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির ক্রীতদাসস্বরূপ, আমি বদ্ধ; তাহা হইলেও একজন এমন পুরুষ আছেন, যিনি প্রকৃতির নিয়মে বদ্ধ নহেন—যিনি নিত্যমুক্ত ও প্রকৃতির প্রভু।' সুতরাং বন্ধনের ধারণা যেমন আমার মনের অচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ, ঈশ্বরধারণাও তদ্রূপ আমাদের প্রকৃতিগত, আমাদের মনের অচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। এই স্বাধীনতার ভাব হইতে উভয়টীই আসিয়াছে। এমন কি, এই স্বাধীনতার ভাব না থাকিলে উদ্ভিদের ভিতর পর্য্যন্ত জীবনীশক্তি থাকিতে পারে না। উদ্ভিদে অথবা কীটের ভিতর ঐ জীবনীশক্তি বিকশিত হইয়া ব্যষ্টিগত ভাবে প্রকাশিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। অজ্ঞাতসারে ঐ মুক্তির চেষ্টা উহাদের ভিতর কার্য্য করিতেছে—উদ্ভিদ্ যে জীবনধারণ করিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য উহার নিজ বিশেষত্ব, নিজের বিশেষ রূপটীকে, নিজের নিজস্বকে রক্ষা করিবে—ঐ মুক্তির অবিরাম চেষ্টাই উহার ঐ চেষ্টার প্রেরক, প্রকৃতি নহে। প্রকৃতি যে আমাদের উন্নতির প্রত্যেক সোপানটীকে নিয়মিত করিতেছে, এইরূপ ধারণা করিলে মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাবটীকে একেবারে উড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু যেমন আমাদের নিয়মে বদ্ধ জড়জগতের ধারণা চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির ধারণাও চলিয়াছে। এই দুই ধারণার ক্রমাগত সংগ্রাম চলিয়াছে। আমরা নানা মতমতান্তরের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবাদের কথা শুনিতেছি, কিন্তু বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন সম্প্রদায় অন্যায় বা অস্বাভাবিক

নহে—উহারা থাকিবেই। শৃঙ্খল যতই দীর্ঘ হইতেছে, ততই স্বভাবতঃই দ্বন্দ্বও বাড়িতেছে, কিন্তু যদি আমরা বুঝি যে, আমরা সকলই সেই এক রকম লক্ষ্যে পঁহুছিবারই চেষ্টা করিতেছি, তাহা হইলে বিবাদের আর প্রয়োজন থাকে না।

মুক্তি বা স্বাধীনতার এই মূর্ত্ত বিগ্রহস্বরূপ প্রকৃতির প্রভুকে আমরা ঈশ্বর বলিয়া থাকি। আপনারা তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারেন না। তাহার কারণ আরনারা এই স্বাধীনতার ভাবকে কখন তাড়াইতে পারেন না, ঐ ভাব ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও জীবনধারণ করিতে পারা যায় না। যদি আপনারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন, তবে কি কখনও এখানে আসিতেন? খুব সম্ভব যে, প্রাণিতত্ত্ববিৎ আসিয়া এই মুক্ত হইবার প্রতিনিয়ত চেষ্টার একটা ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং দিবেনও। এ সবই মানিলাম, কিন্তু তথাপি ঐ স্বাধীনতার ভাবটীও আমাদের ভিতর হইতে যাইতেছে না। যেমন 'আমরা প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতির বন্ধন কোনরূপে কাটাইতে পারি না', এই ভাবটী আমাদের ভিতর রহিয়াছে, এই স্বাধীনতার ভাবটীও তদ্রূপ আমাদের মধ্যে নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বন্ধন ও মুক্তি, আলো ও ছায়া, ভাল ও মন্দ—সর্ব্বত্র এই দুই দুইটী করিয়া জিনিষ রহিয়াছে। বুঝিতে হইবে, যেখানেই কোন প্রকার বন্ধন, তাহার পশ্চাতে মুক্তিও গুপ্তভাবে রহিয়াছে। একটী যদি সত্য হয়, তবে অপরটীও অবশ্য সত্য হইবে। সর্ব্বত্রই এই মুক্তির ধারণা অবশ্য থাকিবেই। আমরা অশিক্ষিত ব্যক্তির ভিতর যে প্রকার বন্ধনের ধারণা দেখিতে পাই, তাহাকে আমরা মুক্তির চেষ্টা বলিয়া এখন বুঝিতে না পারি, কিন্তু তথাপি ঐ ভাব তাহার ভিতর রহিয়াছে। অশিক্ষিত বর্ব্বর মানবের মনে পাপ ও অপবিত্রতার বন্ধন রূপ ধারণা অতি অল্প, কারণ, তাহার প্রকৃতি পশুস্বভাব হইতে বড় অধিক উন্নত নহে। সে বাহ্য প্রকৃতির বন্ধন হইতে বাহ্যবস্তুসম্ভোগের অভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু এই নিম্নতর ধারণা হইতে ক্রমে তাহার মনে মানসিক ও নৈতিক বন্ধনের ধারণা

ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে। এখানে আমরা দেখিতে পাই, সেই ঈশ্বরীয় ভাব অজ্ঞানাবরণের মধ্য দিয়া ক্ষীণভাবে প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমতঃ ঐ আবরণ অতিশয় ঘন থাকে এবং সেই ব্রহ্মজ্যোতিঃ একরূপ আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা—সেই মুক্তি ও পূর্ণত্বরূপ উজ্জ্বল অগ্নি—সদা শুদ্ধ ও অনাচ্ছাদিত ভাবেই বর্ত্তমান থাকে মানব উহাতেই ব্যক্তিধর্ম্মের আরোপ করিয়া তাহাকে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা একমাত্র মুক্ত পুরুষ বলিয়া ধারণা করে। সে তখনও জানে না যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড বস্তু—প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, ধারণার তারতম্যে।

সমগ্র প্রকৃতিই ঈশ্বরের উপাসনা স্বরূপ। যেখানেই কোনপ্রকার জীবন আছে, সেখানেই এই মুক্তির অনুসন্ধান এবং এই মুক্তিই ঈশ্বরস্বরূপ। এই মুক্তিলাভ হইলে নিশ্চিতই সমগ্র প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ হয় আর জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ অসম্ভব। আমরা যতই অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হই, ততই আমরা প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারি। আর যতই প্রকৃতি আমার বশীভূত হইতে থাকে, ততই আমরা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন, অধিকতর ওজস্বী হইতে থাকি, আর যদি এমন কোন পুরুষ থাকেন, যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও প্রকৃতির প্রভু, তাঁহার অবশ্য প্রকৃতির পূর্ণজ্ঞান থাকিবে, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ হইবেন। মুক্তি বা স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি অবশ্য থাকিবে আর কেবল যে পুরুষ এইগুলি লাভ করিবেন, তিনিই প্রকৃতির পারে যাইতে পারিবেন।

বেদান্তে ঈশ্বরবিষয়ক যে সকল তত্ত্ব পড়া যায়, তাহাদের মূলে পূর্ণ মুক্তি বা স্বাধানতা হইতে জাত পরমানন্দ ও নিত্যশান্তিরূপ ধর্ম্মের উচ্চতম ধারণা রহিয়াছে। সম্পূর্ণ মুক্তভাবে অবস্থান—কিছুতেই উহাকে বদ্ধ করিতে পারে না—যেখানে প্রকৃতি নাই, কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই এমন কিছু নাই, যাহা তাঁহাতে কোন পরিণাম উৎপাদন করিতে পারে। এই মুক্তভাব আপনার ভিতর

রহিয়াছে, আমার ভিতর রহিয়াছে এবং ইহাই একমাত্র যথার্থ স্বাধীনতা।

ঈশ্বর সদাই নিজ মহিমাময় অপরিণামী স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আপনি ও আমি তাঁহার সহিত এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আবার এদিকে বন্ধনের কারণীভূত প্রকৃতি, প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার, ধন, নামযশ, মানবীয় প্রেম প্রভৃতি পরিণামী প্রাকৃতিক বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। কিন্তু এই যে সমগ্র প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে, উহার প্রকাশ কিসের উপর নির্ভর করিতেছে! ঈশ্বরের প্রকাশেই প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে সূর্য্য চন্দ্র তারার প্রকাশে নহে।

যেখানে যে কোন বস্তু প্রকাশ পায়, সূর্য্যের আলোকেই হউক বা আমাদের অন্তরাত্মার আলোকেই হউক, উহা তিনিই। তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে।

আমরা দেখিলাম, এই ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ, ইনি ব্যক্তি নহেন, অথচ সর্ব্বজ্ঞ, প্রকৃতির জ্ঞাতা ও প্রভু, সকলের ঈশ্বর। সকল উপাসনার মূলেই তিনি রহিয়াছেন আর আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, তাঁহারই উপাসনা হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই। একথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি বলি, যাহাকে অশুভ বলে, তাহাও তাঁহার উপাসনা। তাহাও সেই মুক্তিরই একটা দিকমাত্র। শুধু তাহাই নহে—আপনারা হয়ত আমার একথা শুনিয়া ভয় পাইবেন, কিন্তু আমি বলি, যখন আপনি কোন অন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন, ঐ মুক্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষাই প্ররোচক শক্তিরূপে উহার পশ্চাতে রহিয়াছে। উহা হয়ত ভুল পথে চলিয়াছে, কিন্তু উহা রহিয়াছে বলিতে হইবে আর পশ্চাতে ঐ মুক্তির -ঐ স্বাধীনতার প্রেরণা না থাকিলে কোনরূপ জীবন বা কোনরূপ প্রেরণাই থাকিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় শিক্ষা।

(ভারত বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্ম)

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

I go forth to preach a religion of which Buddhism is nothing but a rebel child, and Christianity, with all her pretensions, only a distant echo.

—Vivekananda.

উপরোক্ত মতটি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত স্বামীজির সহিত ঐ বিষয় লইয়া জনৈক পাশ্চাত্য বিদুষীর সহিত যে আলাপন হয় তাহা অগ্রে উদ্ধৃত করিব।

প্রশ্ন—বৌদ্ধ কর্ম্মকাণ্ড কোথা হইতে আসিল ?

স্বামীজি—বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে।

প্রশ্ন—অথবা, ইহা দক্ষিণ ইউরোপে প্রচলিত ছিল বলিয়া, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভাল নয় কি যে বৌদ্ধ, ঈশাহী এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সকলই এক সাধারণ ভূমি হইতে উদ্ভূত ?

স্বামীজি—না, তাহা হইতেই পারে না! তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল! এমন কি জাতি বিভাগের বিরুদ্ধে পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম কিছুই বলে নাই। অবশ্য, জাতি বিভাগ তখনও কোন নির্দ্দিষ্টরূপ লাভ করে নাই, এবং বুদ্ধদেব আদর্শটীকে পুনঃ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন মাত্র। মনু বলিতেছেন, যিনি এই জীবনেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। বুদ্ধদেব এইটী সাধ্যমত কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—কিন্তু ঈশাহী এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কি সম্বন্ধ ? তাহারা এক, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে ? এমন কি, আমাদের

পূজাপদ্ধতির যাহা মেরুদণ্ডস্বরূপ, আপনাদের ধর্ম্মে তাহার নাম গন্ধও নাই!

স্বামীজি—নিশ্চয়ই আছে! বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও Mass আছে, তাহাই দেবতার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা, আর তোমাদের Blessed Sacrament আমাদের প্রসাদ স্থানীয়। শুধু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রথানুযায়ী উহা হাঁটু না গাড়িয়া, বসিয়া বসিয়া নিবেদন করা হয়। তিব্বতের লোক হাঁটু গাড়িয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ধূপদীপ দান এবং গীতবাদ্যের প্রথা আছে।

প্রশ্ন—কিন্তু ঈশাহী ধর্ম্মের মত ইহাতে কোন প্রার্থনা আছে কি?

স্বামীজি—না; আর ঈশাহী ধর্ম্মেও কোন কালে ছিল না। এ ত ছাঁকা প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম, এবং প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম মুসলমানের নিকট হইতে সম্ভবতঃ মূর জাতির প্রভাবের মধ্য দিয়া, ইহা গ্রহণ করিয়াছিল। পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া, সেটা একমাত্র মুসলমান ধর্ম্মই করিয়াছে। যিনি অগ্রণী হইয়া প্রার্থনা পাঠ করেন, তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ান এবং শুধু কোরাণ পাঠই বেদী হইতে চলিতে পারে। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম এই ভাবটীই আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। এমন কি, tonsure পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, উহাই আমাদের মুণ্ডন। জাষ্টিনিয়ান্ দুই জন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে মুসার যুগে প্রচলিত বিধিনিষেধ করিতেছেন, আমি এইরূপ একখানি চিত্র দেখিয়াছি। তাহাতে সাধুদ্বয়ের মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত বৌদ্ধ যুগের প্রাক্‌কালীন হিন্দুধর্ম্মে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী দুইই বর্ত্তমান ছিল। ইউরোপ নিজ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলি থিবেইড হইতে পাইয়াছে।

প্রশ্ন—এই হিসাবে তাহা হইলে আপনি ক্যাথলিক ধর্ম্মের ক্রিয়া-কাণ্ডকে আর্য্য ক্রিয়াকাণ্ড বলিয়া স্বীকার করেন?

স্বামীজি—হাঁ। প্রায় সমগ্র ঈশাহী ধর্ম্মই আর্য্যধর্ম্ম বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমার মনে হয়, খৃষ্ট বলিয়া কখনও কেহ ছিল

না। আমার ক্রীটদ্বীপের অদূরে সেই স্বপ্ন * দেখা অবধি বরাবর এই সন্দেহ! অলেকজান্দ্রিয়ায় ভারতীয় এবং মিসরীয় ভাবের সংমিশ্রণ হয়; এবং উহাই য়াহুদী ও যাবনিক (গ্রীক) ধর্ম্মের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া জগতে ঈশাহী নামে প্রচারিত হইয়াছে।

জানইত যে, 'কার্য্যকলাপ' এবং 'পত্রাবলী' Acts and Epistles 'জীবনীচতুষ্টয়' (Gospels) হইতে প্রাচীনতর, এবং সেণ্টজন একটা মিথ্যা কল্পনা। মাত্র একজন লোক সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ—তিনি সেণ্টপল। তিনিও আবার স্বচক্ষে ঘটনাগুলি দেখেন নাই, এবং তিনি নিজে কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বকধার্ম্মিকত্বেরও (Jesuitry) অসদ্ভাব ছিল না—'যেমন করিয়া পার আত্মার উদ্ধার কর'—এইরূপ নহে কি?

রেঁণার ঈশাজীবনী ত শুধু ফেণা। ইহা ষ্ট্রসের কাছে ঘেঁসিতে পারে না, ষ্ট্রসই সাঁচ্চা প্রত্নতত্ত্ববিৎ। ঈশার জীবনে দুইটী জিনিস

* ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারত প্রত্যাগমনের পথে নেপল্‌স্ হইতে পোর্ট সৈয়াদ আসিবার সময় স্বামীজি স্বপ্ন দেখেন যে, এক শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল "এই ক্রীটদ্বীপ" এবং তিনি যাহাতে পরে উহাকে চিনিতে পারেন, এই জন্য উক্ত দ্বীপের একটা স্থান তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। উক্ত স্বপ্নের মর্ম্ম এই ছিল যে, ঈশাহী ধর্ম্মের উৎপত্তি ক্রীট দ্বীপে এবং তৎসম্বন্ধে সে তাঁহাকে দুইটী ইউরোপীয় শব্দ শুনাইল, তাহাদের মধ্যে একটি থেরাপীউটা † (Therapeutæ)- এবং বলিল, উভয়ই সংস্কৃত শব্দজ। থেরাপীউটা শব্দের অর্থ—থেরা অর্থাৎ বৌদ্ধ, ভিক্ষুগণের পুত্রগণ (পিউটা, সংস্কৃত পুত্র শব্দজ)। ইহা হইতে স্বামীজি যেন বুঝিয়া লন, যে ঈশাহী ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের একদল প্রচারক হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে. ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। ভূমির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বৃদ্ধ আরও বলিল, "প্রমাণ সব এই খানেই আছে, খুঁড়িলেই দেখিতে পাইবে।" লেখিকা। (নিবেদিতা)

† It is my own belief that the second word was Essene. But alas, I cannot remember the Sanskrit derivation! N.—Vide, The Master As I saw Him Historic Christianity -His Dream—P.P. 351 (1910).

জীবন্ত ব্যক্তিগত লক্ষণে ভূষিত—সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উপাখ্যান, ব্যভিচার অপরাধে ধৃতা সেই রমণী এবং কূপপার্শ্ববর্ত্তিনী সেই নারী।

এই শেষোক্ত ঘটনাটীর ভারতীয় জীবনের সহিত কি অদ্ভুত সুসঙ্গতি! একটী স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিয়া দেখিল, কূপের ধারে বসিয়া একজন পীতবাস সাধু তাহার নিকট জল চাহিলেন। তাহার পর তিনি তাহাকে উপদেশ দিলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শুধু ভারতীয় গল্পে উপসংহারটা এইরূপ হইবে যে, যখন উক্ত নারী গ্রামবাসীগণকে সাধু দেখিতে এবং সাধুর কথা শুনিবার জন্য ডাকিতে যাইল, সেই অবসরে সাধুটী সুযোগ বুঝিয়া পালাইয়া বনমধ্যে আশ্রয় লইলেন।

মোটের উপর আমার মনে হয় বুড়ো হিলেল ঠাকুরই (Rabbi Hillel) ঈশার উপদেশাবলীর উদ্ভবকর্ত্তা, আর নাজারীন নামধারী এক বহু প্রাচীন (কিন্তু স্বল্প জানিত) য়াহুদী সম্প্রদায় সহসা সেণ্টপল কর্ত্তৃক যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এক পৌরাণিক ব্যক্তিকে পূজাস্পদ বস্তু বলিয়া জোগাইয়া দিয়াছে।

পুনরুত্থান (Resurrection) জিনিসটা ত বসন্ত-দাহ (Spring, Cremation) প্রথারই রূপান্তর মাত্র। যাহাই হউক না কেন, দাহ প্রথা শুধু ধনী যবন (গ্রীক) ও রোমকগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল আর সূর্য্যঘটিত নব উপাখ্যানটী সেই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই উহাকে রহিত করিয়া থাকিবে।*

এখন Alexandria এবং Palestine এ বর্দ্ধমান Therapeuts (থেরা পুত্ত বা স্থবির পুত্র) এবং Essenes দের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ

* Vide Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda by Sister Nivedita as translated by Swami Madhavananda—‘স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে’ পৃঃ ৯৫—১০০।

আলোচনার প্রয়োজন। Renan তাঁহার Life of Jesus নামক গ্রন্থে বলেন যে এই Essene শব্দটী Therapeut শব্দটীর গ্রীক অনুবাদ। † তিন জন প্রাচীন ঐতিহাসিক হইতে আমরা ইহঁাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতে পারি—Flavius Josephus, Philo এবং Pliny, Therapeutsরা Alexandriaতে বাস করিতেন। তাঁহাদেরই একটি শাখা Palestine এ আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহারাই পরে তদ্দেশীয় ভাষায় Essene বলিয়া পরিচিত হন। John the Baptist এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন।

ইঁহার নিকট হইতে শ্রীযীশুখ্রীষ্টের অভিষেক ক্রিয়া (Baptism) সম্পাদিত হয়। প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এই Essene সম্প্রদায়ের একটি শাখা মাত্র। কিন্তু ধীরে ধীরে এই Essene শাখা খ্রীষ্ট ধর্ম্মেতেই মিশিয়া যায়। কিন্তু ইহার কিয়দংশ মরুভূমির মধ্যে অবস্থান করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল। যাহাদের এক সম্প্রদায় Sabæanism বলিয়া পরিচিত এবং যাহাদের অন্তর্গত Hanifite দের নিকট শ্রীমহম্মদ ধর্ম্ম শিক্ষা করেন এবং পরে ঐ Sabæanismও ইসলাম ধর্ম্মে মিশিয়া যায়। নির্জ্জন বাস, স্ত্রী ও পুরুষের আজীবন কৌমার ব্রত, অহিংসা, বর্ণবিভাগ, স্ত্রীজাতির হীনত্ব, অভিষেক, গুপ্ত তন্ত্র মন্ত্র, শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, ইহুদি মন্দিরে অগমন এবং পশু বধের বিরোধিতা, আত্মার অমরত্ব, বহুজন্মবাদ, সূত্র ও ব্রহ্মদণ্ড, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান, পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি, স্পর্শ দোষ ভোজনকালে মৌনাবলম্বন, সাধারণ ভাণ্ডার, ক্ষেত্রে কার্য্য, নিরামিষ ভোজন, আলখেল্লা পরিধান, আহারের পূর্ব্বে ও পরে জয় উচ্চারণ। মলত্যাগের পর তদুপরি মৃত্তিকাদ্বারা আবরিত করণ, পুত্রার্থে ভার্য্যা প্রভৃতি মতবাদ, একত্রোপাসনা, মদ্য ও মাংস ত্যাগ, ঔষধ বিতরণ

---

† Gr. Essenoi and Essaioi, literally physicians, because they practiced medicine, from chald, asaya, from Heb, asa, to heal :—Webster.

প্রভৃতি ব্যাপার Essene এবং Therapeuts দের মধ্যে প্রচলিত ছিল।*

এই সকল দেখিয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অনুমান করিতে হয় যে এই Therapeuts এবং Essene-রা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কারণ তাৎকালিক পাশ্চাত্য ধর্ম্মের মধ্যে কোথায়ও ঐরূপ আচার পদ্ধতি বর্ত্তমান ছিল না বরং উহাদের আচার পদ্ধতির সহিত ভারতীয় আচার পদ্ধতির সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আরও যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা একে একে লিপিবদ্ধ করা যাউক। "এলেকজিন্দ্রিয়া নগর নিবাসী ক্লেমেন্স্ নামক গ্রীক পণ্ডিত ন্যূনাধিক দুই শত খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়েরই কিছু কিছু প্রসঙ্গ করিয়া যান। তিনি শ্রমণ ও শ্রমণার উল্লেখ করিয়া কহেন, ইহারা একরূপ পিরামিডের উপাসনা করে ও তাহার মধ্যে দেবতা বিশেষের অস্থি প্রোথিত আছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই পিরামিড বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্তূপ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয় ইহাতে সন্দেহ নাই। পর্ফিরি নামে অন্য একটি গ্রীক পণ্ডিত ন্যূনাধিক তিন শত খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি লিখেন, ব্রাহ্মণেরা একটি জাতি-বিশেষ এবং শ্রমণেরা একত্র বিমিশ্রত নানাজাতীয় লোক। শ্রমনেরা মস্তক মুণ্ডন এবং বহির্ব্বসনের অভ্যন্তরে একরূপ আলখেল্লা ব্যবহার করে; গৃহ-সম্পত্তি সমুদায পরিত্যাগ করিয়া নগরের বহির্ভাগে একত্র অবস্থিতি করে; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয শাস্ত্রালাপ করিয়া কালক্ষেপ করে এবং নিত্য রাজ-সন্নিধানে তণ্ডুল-দান প্রাপ্ত

* For better studies vide the Religion of Israel by Dr. Kuenen Vol. III. p 126—136, 203—4. Also vide History of the Jews by Henry Hart Milman D. D. or Vide Renan's Life of Jesus. See also Bunsen's Angel Messiah of Buddists, Essenes and Christians p. 149.

For original studies Vide The Jewish historian, Flavius Josephus' Antiquities and Philo's Judæus, quod omen. prob. liber

হইয়া আপনাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই শ্রমণ যে বৌদ্ধ পরিব্রাজক অর্থাৎ ভিক্ষু ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে"*।

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম তুলনা করিলে দেখা যায়—উভয় অবতারের জন্মোপলক্ষে একই নক্ষত্র (পুষ্যা বা 8 of cancer) ও মহাপুরুষা-গমন প্রসঙ্গ (অসিত এবং Simeon), উভয়ের জননীই অলৌকিক-ভাবে গর্ভধারণ করেন, যিশুক্রোড়ে ম্যাডোনা ও করুণাদেবীর ক্রোড়ে বুদ্ধের একই প্রকার প্রতিকৃতি, উভয়েরই বেশ্যা ও দুর্দ্দান্তের উপর কৃপা, একই প্রকারের নৈতিক উপদেশ প্রচার, উভয়েরই মার বা সয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হওন, দ্বাদশ শিষ্য, দান দয়া, ক্ষমা, সত্যাদি স্বাভাবিক ধর্ম্মের প্রাধান্য, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি ম্লেচ্ছ সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তদীয় ফল-ভোগে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন, ঘণ্টা ও জপমালা ব্যবহার, নিজ নিজ দেবালয়ে

---

* Wheeler's History of India, Vol. III. P. 240.

† The discovery of Asoka's inscription at Girnar, which tells us that, that enlightened emperor of India made peace with five Greek Kings, and sent Buddhist missionaries to preach his religion in Syria explains to us the process by which the ideas were communicated. Researches into the doctrines of the Therapeuts in Egypt and of the Essenes in Palestine leave no doubt even in the minds of such devout a Christian thinker as Dean Mansel that the movement which those sects embodied was due to Buddhist missionaries, who visited Egypt and Palestine within two generations of the time of Alexander the Great. Some moderate Christian writers admit that Buddhism in Syria was a preparation, a 'forerunner' (to quote the word used by Professor Mahaffy) of the religion preached by Jesus over two centuries later.—A History of Civilization in Ancient India Vol. II. by R. C. Dutt

দীপদান, লোবানাদি দাহ্য গন্ধ দ্রব্য প্রদান, ধর্ম্ম সঙ্গীত গান, কি স্বদেশ, কি বিদেশ সর্ব্বত্র ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ প্রভৃতি অনেক বিষয়ে উভয়ের অতিশয় সন্নিকট সম্বন্ধ। *

পুরাতত্ত্বের ফলে যে সকল অপূর্ব্ব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে তাহার মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় একটি অতি গুপ্ত কথা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আমরা ঐ বিষয়টি নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি,—

* A Roman Catholic Missionary, Abbe Huc, was much struck by what he saw in Thibet. "The crosier, the mitre the dalmatic, the cope or pluvial, which the grand LLamas wear on a journey, or when they perform some ceremony outside the the temple, the service, with a double choir, psalmody, exorcisms, the censer swinging on five chains and contrived to be opened or shut at will, benediction by the LLamas with the right hand extended over the heads of the faithful, the chaplet, sacerdotal cilibacy, lenten, retirements from the world, the worship of saints, fasts, processions, litanies, holy water, these are the points of contact between the Buddhists and ourselves". Mr. Arthur Lillie, from whose book the above passage is quoted, remarks, "The good Abbe, has by no means exhausted the list, and might have added confessions, tonsure, relic worship, the use of flowers, lights and images before shrines and alters, the sign of the cross, the Trini in unity, the worship of the Queen of Heaven, the use of religious books in a tongue unknown to the bulk of the worshippers, the aureole or nimbus, the crown of saints and Buddhas, wings to angels, penance, flagellations, the flabellum or fan, popes, cardinals, bishops, abbots, presbyters, deacons, the various architectural details of the Christian temple.—Buddhism in Christendom, p. 202. as quoted by R. C. Dutt in A History of Civilisation in Ancient India, p. p. 377.

"লাবুলে ও লিএবরেখ্‌ট্‌ (Prof Liebrecht) নামে দুইটি ফরাসী ও জার্ম্মান্ পণ্ডিতের অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে রোমান্ ক্যাথলিকেরা একজন সাধুকে খৃষ্ট ধর্ম্মান্তর্গত সিদ্ধপুরুষ জ্ঞান পূর্ব্বক ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন। অবশেষে প্রমাণ হইল তিনি আর কেহই নহেন আমাদের বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধ। ঐ সিদ্ধ পুরুষের নাম জোসফট্। প্রথমে ফরাসী লাবুলে, পরে জর্ম্মেন্ লিএব্‌রেখ্‌ট্‌, তদন্তর ইংলণ্ড-বাসী বীল্ নিজ নিজ ভাষায় এ বিষয়টি প্রতিপাদন করেন। ম্যাক্সমূলর্ ইহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।* দমস্‌ক্-নিবাসী জোঅন্নস্ নামে একটি গ্রীক্ গ্রন্থকার বার্লাম্ ও জোঅসফ্ নামে দুই ব্যক্তিবিষয়ক একখানি উপাখ্যান রচনা করেন। উহা অবিকল বুদ্ধ চরিত। জোসফটও বুদ্ধের ন্যায় রাজপুত্র। তাঁহার জন্মগ্রহণ হইলে, একটি জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়া বলেন, জোসফট্ মহত্তর মহিমা লাভ করিবেন। সে মহিমা নিজ রাজ্যে নয়, তাহা উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর সাম্রাজ্য মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইবে। বস্তুতঃ তিনি খৃষ্টীয় সম্প্রাদায়ের অভিনব ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। এই বিষয়ের প্রতিবিধানার্থ অশেষরূপ উপায়াবলম্বন করা হয়। তাঁহাকে সকল প্রকার সুখদ সামগ্রী পরিপূর্ণ একটি প্রাসাদ মধ্যে রক্ষা করা হইল এবং তিনি যাহাতে রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর বিষয় কিছুমাত্র অবগত হইতে না পারেন, তদর্থ যথোচিত যত্ন করা হইল। কিছুকাল পরে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহ বহির্ভূত হইতে আদেশ দেন। তিনি রথারোহণ পূর্ব্বক এক দিবস একটি অন্ধ ও অপর একটি খঞ্জকে দর্শন করেন। অপর একদিন ঐরূপে বহির্গত হইয়া একটি জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পান; তাহার অঙ্গ গলিত, কেশ পলিত, দন্ত স্খলিত এবং পদযুগল কম্পিত। তিনি এই সমস্ত দর্শন পূর্ব্বক বিষণ্ণ মনে গৃহ প্রত্যাগমন করিয়া মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতেছেন এমন সময় একটি

* Chips from a German Workshop by Max Muller, Vol. IV. p. p. 176—189.

সন্ন্যাসী তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া ঈশু প্রচারিত উচ্চতম সুখ সম্পত্তির আশার বিষয় উপদেশ দেন। এই সমস্ত ব্যতিরেকেও, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বুদ্ধ ও জোসফটের অন্য অন্য বিষয়ও সুন্দর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয়েই পরিশেষে নিজ নিজ পিতাকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন এবং উভয়েই মৃত্যুর পূর্ব্বে বুদ্ধ বা সেণ্ট্ বলিয়া পরিগণিত হন।

"অতএব জোঅন্স যে ভারতবর্ষীয় বুদ্ধচরিতের অনুকরণ বা অনুবাদ করিয়া উক্ত উপাখ্যান রচনা করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি। মক্ষমূলর মনে করেন যে ললিতবিস্তর হইতেও উহার অনেক স্থল গৃহীত হইয়াছে। বুদ্ধ ও জোসফট যে প্রাচীন ব্যক্তিকে দর্শন করেন, গ্রীক ও সংস্কৃত উভয় গ্রন্থে তাহাকে কতকগুলি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সেই বিশেষণ গুলির সাতিশয় সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

"মসসৌদি সেবিয়ন্ ধর্ম্ম-* প্রবর্ত্তকের নাম যুদস্ফ এবং কিতাব ফিহ্রিস্ত্ নামক আরবীয় গ্রন্থের লেখক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের নাম যুঅসফ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রেঁণো ঐ দুইটি নাম পার্সী বুদ্সৎফ্ অর্থাৎ সংস্কৃত বোধিসত্ত্ব শব্দেরই অপভ্রংশ † স্থির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বেবর (Weber) বলেন যে ঐ ফরাসী পণ্ডিতের এই সুকৌশল-সম্পন্ন অভিপ্রায়ই উপস্থিত বিষয় অর্থাৎ জোসফট্ ও বুদ্ধদেবের অভেদ-প্রতিপাদনের মূলসূত্র।"§

---

* কেলডিয়া প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ প্রচলিত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র এই সমস্ত জ্যোতিষ্কের উপাসনা। পশ্চাৎ মিশর ও গ্রীসেও এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়।— The faith of the world, Vol II, 1881, Sabians.

† Memoire Sur l'Inde, par Reinand p. 91

§ Weber's History of Indian Literature, p. 307

—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় উপক্রমণিকা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৫৬-৫৭।

অপরদিকে জগতে যত নীতিমূলক গল্প দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ বলিয়াই বোধ হয়। নানা যুগে ঐ সকল গল্প নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গমন করিয়াছে *। সকলেই জানেন যে নীতিযুক্ত গল্পের খনি হইতেছে বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থ। এ সকল গল্প ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল। শ্রীবুদ্ধ সেই গুলিকে নীতিযুক্ত করিয়াছিলেন মাত্র। সে যাহাই হউক, পাশ্চাত্য গল্পের সহিত ঐ সকল গল্পের অত্যধিক মিল এবং ঐ সকল গল্প প্রাচ্যঢংয়ে লেখা—যেমন প্লেটোর ক্রাটাইলাসের (Cratylus) অন্তর্গত সিংহ চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ † এবং ষ্ট্রাটিস (Strattis 400 B. C.) বর্ণিত নউলের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি ‡ প্রভৃতি গল্প বৌদ্ধ জাতকে দেখা যায়। ইহা ছাড়া সোলেমানের (Solomon) বিচারের মধ্যে যক্ষিণী জাতক * কি প্রকারে প্রবেশ করিল ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মক্ষমূলর ইহার কোনও সমাধান খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু আমাদের বোধ হয় ভারতবাসীদের সহিত ইহুদিদের সমাগম ফলে বাইবেলের মধ্যে ভারতবর্ষীয় নানা বিষয় প্রবেশ করিয়াছে। বাইবেলের অন্তর্গত 'রাজমালার' † সময় ভারতবর্ষের যে ঐ সকল দেশের সহিত নানা ভাবে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল তাহা বাইবেলের মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ (যথা হস্তীদন্ত, বানর, ময়ুর এবং চন্দন কাষ্ঠ বাচক) হইতে বুঝা যায় ‡। অবশ্য কেহ যেন মনে না করেন যে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যিশুখৃষ্টকে অপ্রতিপাদন করা। আমাদের প্রতিপাদ্য এই, যে খৃষ্ট ধর্ম্ম হিন্দু চিন্তাদ্বারাই পরিপুষ্টি

---

* See Selected Essays, Vol. I, p. 500. 'The Migration of Fables.'

† Cratylus, 441A, on a similar fable in Æsop, see Benfey, Pantschatantra vol 1, p 463 M. M Selected Essays, Vol. I. p. 513.

‡ See Fragmenta Comic (Didot) p 302; Benfey, l. c. vol. 1. p. 374.

লাভ করিয়াছিল। যিশু খৃষ্ট ভারতবর্ষীয় নীতি ও সঙ্ঘের সহিত তদ্দেশীয় নানা বিশ্বাস ও সেশ্বরবাদ একত্র করিয়া জগতের সমক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। পারসিক আহিরম্যান ও অহুরমেজদা খৃষ্টধর্ম্মের ভগবানের সহিত সয়তানের চিরবিরোধ স্মরণ করাইয়া দেয়। মৃত্যুর পর বহুকাল পরে মৃত ব্যক্তির আত্মা পুনরায় দেহের মধ্যে প্রবেশ করিবে ইত্যাদি মিশরীয় চিন্তা অথবা মৃত্যুর পর পৃথিবীর অন্তস্থলে গুহা-বদ্ধ জীবাত্মা প্রভৃতি পারসিক চিন্তা খৃষ্টধর্ম্মের Day of Judgment এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। Neo-Platonic সম্প্রদায়ের Tripple Triad of Jamblicus এর মধ্যেই খৃষ্ট ধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি God the Father, God the Son, God the Holy Ghost লুক্কায়িত ছিল। কিন্তু আমরা ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে এই Neo-Platonic সম্প্রদায় ভারতীয় Gymno-Sophist দের দ্বারা অতিমাত্র অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। বেবরের (Weber) কথায় বলিতে গেলে,—

"Buddhists and Jews, Greeks and Egyptians, mingled together, bringing with them the most diverse forms of religion. These conditions led to the development of comparative theology, on the one hand, and to the fusion of beliefs or a kind of Religious eclecticism, on the other, and paved the way for Catholic unity."

এ যাবৎ আমরা উদীচ্যখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব লইয়া আলোচনা করিয়াছি এখন একবার পৃথিবীর অপর পারস্থ ভূখণ্ডের সহিত ভারত-সম্বন্ধী ধর্ম্মেতিহাস লইয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সিংহল

* See some excellent remarks on this subject in Rhys Davids, Buddhist Birth Stories, vol. pp. xiii & xliv.

† 1 Kings iii. 25.

‡ Science of Language, vol. i. p. 186

শ্যাম, নেপাল, তিব্বত, কাবুল, গান্ধার, চীন, মঙ্গলিয়া, কোরিয়া, জাপান ও মধ্যএসিয়ায় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা খণ্ডও যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব অনুভব করিয়াছিল এ কথা শুনিলে অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। কিছুকাল পূর্ব্বে "কলম্বসের পূর্ব্বে আমেরিকার আবিষ্কার" শীর্ষক একটী সচিত্র প্রবন্ধ আমেরিকার এক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি প্রমান হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে যে পাঁচজন বৌদ্ধ ভিক্ষু রুষের উত্তর সীমা কাম্‌সকাটকা হইতে পাসিফিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আলাস্কা দিয়া আমেরিকায় প্রবেশ পূর্ব্বক দক্ষিণে মেক্সিকো পর্য্যন্ত গমন করেন। ঐ পথ দিয়া আমেরিকা যাত্রা দুরূহ ব্যাপার নহে; মধ্যে যে আল্যুসিয়াদি দ্বীপপুঞ্জ আছে তাহা অতিক্রম করিয়া, কি সহজে আমেরিকা পৌঁছান যায় মানচিত্র দৃষ্টে তাহা বুঝিতে পারিবেন; বলিতে কি, চীন পরিব্রাজকদিগের স্থল-পথ দিয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ অপেক্ষা অনেক সহজ। মেক্সিকো ও তৎ সন্নিহিত আদিম আমেরিকানদের ইতিহাস, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন সকল এই ঘটনার সত্যতা বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচীন চীন গ্রন্থাবলীতে ফুসং নামক এক পূর্ব্ব-দেশের উল্লেখ আছে, সে দেশের এক বৃক্ষ হইতে ফুসং নাম গৃহীত হয়। বর্ণনা হইতে মেক্সিকো দেশে 'আগুয়ে' বা 'মাগুয়ে', যে বৃক্ষ জন্মে তাহার সহিত ফুসং বৃক্ষের সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয়।

"চীন সাহিত্যে হুইসেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামে একটী গ্রন্থ আছে, তার লেখাটী অত্যন্ত সরল, এমন কোন অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই যাহা লেখকের কল্পনা প্রসূত বলিয়া মনে হয়। এই বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে হুইসেন কাবুলবাসী ছিলেন, ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে য়ু-আন সম্রাটের রাজত্ব কালে ফুসং হইতে কিঞ্চেন রাজ-ধানীতে আগমন করেন। তখন রাজ্য-বিপ্লব বশতঃ তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, বিদ্রোহ থামিয়া গেলে পরবর্ত্তী

নূতন সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি ফুসং হইতে কৌতুক জনক নানা নূতন নূতন সামগ্রী ভেট লইয়া আসেন। তাহার মধ্যে একরকম কাপড় ছিল তাহা রেশমের মত নরম অথচ তার সূতা এরূপ কঠিন যে কোন ভারি জিনিষ ঝুলাইয়া রাখিলেও ছিঁড়িয়া যায় না। Mexico র 'আগুয়ে' গাছ হইতেও ঐ রকম রেশম উৎপন্ন হয়। আর একটি সুন্দর ছোট দর্পণ উপহার দেন। তাহার অনুরূপ দর্পণ Mexico অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ব্যবহৃত হইত। রাজাজ্ঞায় হুইসেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত তাঁহার কথা মত লিখিয়া লওয়া হয় তাহার সারাংশ এই ঃ—

"পূর্ব্বে ফুসং বাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের কিছুই জানিত না ৪৫৮ খৃঃ সুংবংশীয় তামিং সম্রাটের রাজত্ব কালে কাবুল হইতে ৫ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ফুসং গমন করত সে ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেখানকার অনেকে বৌদ্ধভিক্ষু রূপে দীক্ষিত হয় ও তখন হইতে লোকদের রীতি নীতি সংশোধন আরম্ভ হয়। পরিব্রাজক ভিক্ষুরা কামাস্কাটকা হইতে কোন্ পথ দিয়া কিরূপে যাত্রা করেন, কোন্ পথ কতদূর, অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ ঐ গ্রন্থে সকলি বিন্যস্ত আছে। ফুসং বৃক্ষের গুণাগুণ, তার ছাল হইতে সূতা বাহির হওয়া ও বস্ত্র বয়ন ও তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত যথাযথ বর্ণিত আছে। সে দেশে এক প্রকার রাঙ্গা পিয়ারা জন্মে ও প্রচুর দ্রাক্ষা জন্মানর কথা আছে যাহা Mexico দেশের ফলের সহিত ঠিক মেলে। ও দেশে তাম্র পাওয়া যায়, লৌহ খনি নাই, সোনারূপার ব্যবহার নাই, জিনিসের দরের ঠিক নাই। ওখানকার লোকদের রাজতন্ত্র, রীতি নীতি বিবাহ ও অন্ত্যেষ্ঠি পদ্ধতি, নগর, দুর্গ, সেনা ও অস্ত্র শস্ত্রের অভাব এই সকল বিষয়ের যেরূপ বর্ণন আছে তাহা আর আদিম আমেরিকা, বিশেষতঃ Mexico অঞ্চলে যাহা দেখা যায় তাহার মধ্যে চমৎকার ঐক্য দৃষ্ট হইবে।

"Mexico বাসীদের মধ্যে এইরূপ শ্রুতি আছে যে একজন শ্বেতকায় বিদেশী পুরুষ, লম্বা শুভ্র বসন, তার উপর এক আলখাল্লা, এই

বেশে আগমন করেন। তিনি লোকদিগকে পাপ পরিহার, ন্যায়, সত্য ব্যবহার, শিষ্টাচার, মিতাচার এই সমস্ত ব্যবহারধর্ম্মের উপদেশ দেন। পরে সেই সাধুপুরুষের উপর লোকের উৎপীড়ন আরম্ভ হওয়াতে তিনি প্রাণভয়ে হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন কেহই সন্ধান পাইল না, এক পাহাড়ের উপর তাঁর পদচিহ্ন রাখিয়া গেলেন। তাঁহার স্মরণার্থ Magdalina গ্রামে তাঁহার এক প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, তাঁব নাম উই-সি-পেকোকা, সম্ভবতঃ "হুই-সেন-ভিক্ষু" নামের অপভ্রংশ। আর একজন বিদেশী ভিক্ষু কতকগুলি অনুচর সঙ্গে Pacific Ocean তীরে আসিয়া নামেন। হয়ত তাঁহারা উল্লিখিত পঞ্চভিক্ষু। এই সকল ভিক্ষুরা যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন তাহা অনেকটা বৌদ্ধমতের অনুরূপ। Spanish জাতি কর্ত্তৃক আমেরিকা বিজয়কালে তাহারা Mexico ও মধ্য আমেরিকার জনপদে যে ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস প্রচলিত দেখেন, তাহাদের শিল্প, গৃহ নির্ম্মাণকৌশল, মাস গণনার রীতি প্রভৃতি যাহা প্রত্যক্ষ করেন Asiaর ধর্ম্মের ও সভ্যতার সহিত তাহার এমন আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য যে তাহা দুই দেশের পরস্পর লোক সমাগম ভিন্ন আর কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

"আর এক প্রকাব প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা ভাষাগত। এসিয়া খণ্ডে 'বুদ্ধ' নামের তেমন চলন নাই। বুদ্ধের জন্ম নাম 'গৌতম' এবং জাতীয় নাম 'শাক্যই' প্রচলিত। এই দুই নাম এবং তাহার অপভ্রংশ শব্দ Mexico প্রদেশ সমূহের নামে মিলিয়া গিয়াছে। দেশীয় যাজকদের নাম এবং উপাধিও ঐরূপ সাদৃশ্য ব্যঞ্জক।

"গ্বাতে মালা—গোতম আলয়, হুয়াতামো ইত্যাদি স্থানের নাম; পুরোহিতের নাম গ্বাতে মোট্ জিন-গৌতম হইতে ব্যুৎপন্ন বোধ হয়। ওয়াস্ককো, জাকাটেকাস, শাকাটাপেক, জাকাটলাম, শাকা পুলাস এই সকলের আদিপদে শাক্য নামের সাদৃশ্য দেখা যায়। মিক্স্ টেকার প্রধান পুরোহিতের উপাধি হচ্চে "তায়া সাকা" অর্থাৎ শাক্যের মানুষ। পালঙ্কে একটি বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার

"শাক-মোল" (শাক্যমুনি) নাম। কোলোরাডো নদীর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে একজন পুরোহিত বাস করিতেন তাঁর নাম গৌতুশাক্য (গৌতম শাক্য)। তিব্বতী কোন নাম চা'ন ত দেখিতে পাইবেন Mexico র পুরোহিতের নাম ত্লামা। আর এক কথা—মেক্সিকো দেশের নাম সেখানকার এক বৃক্ষ হইতেই হইয়াছে; হুইসেন যদি ঐ দেশে গিয়া থাকেন তাহা হইলে ফুসং বৃক্ষ হইতে দেশের নাম-করণ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

"পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমেরিকায় এমন কতকগুলি জিনিস পাওয়া গিয়াছে যাহা সে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের মূর্ত্তিমান প্রমাণ-স্বরূপ। ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি, সন্ন্যাসী বেশধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুমূর্ত্তি হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি (আমেরিকায় হস্তীর ন্যায় কোনও জন্তু ছিল না), চীন পাগোডাকৃতি দেবালয়, প্রাচীরের গায়ে চিত্র, খোদিত শিলা, স্তূপ, বিহার, অলঙ্কার, এই সকল জিনিসে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ছাপ বিলক্ষণ পড়িয়াছে।"*

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে Prof. Fryer স্থির করিয়াছেন যে ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রচারকার্য্যে আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন।

---

* The Buddhist Discovery of America—Harper's Magazine.

—বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার এম্, এ, বি, এল্)

(৭)

সাধুর লক্ষণ।

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দান্তোমৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহোমিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥

কৃপালু, কাহারও দ্রোহ করেন না, তিতিক্ষু, সত্যই তাঁহার বল, অসূয়া জন্য হর্ষবিষাদ-রহিত, সকলের উপকারক, বিষয়দ্বারা ক্ষুব্ধ হন না, তাঁর বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত, মৃদুবিত্ত, সদাচার, অপরিগ্রহ, ক্রিয়াশূন্য, মিতভোজী, তাঁর অন্তকরণ সংযত, স্বধর্ম্মে স্থির, মদেকাশ্রয়, মননশীল, সাবধান, নির্ব্বিকার, বিপদেও অকৃপণ, তিনি ক্ষুৎপিপাসা শোক মোহ জরামৃত্যু জয় করিয়াছেন, মানাকাঙ্ক্ষী নহেন, অন্য লোককে মানদ, পরকে বুঝাইতে দক্ষ, অবঞ্চক, কারুণিক, সম্যক্ জ্ঞানী ইত্যাদি। এগুলি সাধুর লক্ষণ।

---

(৮)

ভক্তের লক্ষণ।

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চ্চনং।
পরিচর্য্যাস্তুতি প্রহ্বগুণ কর্ম্মানুকীর্ত্তনং॥
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনং॥

মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনং । * * * *

* * * * বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্ ॥

মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ । * * * *

অমনিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্ । * * * *

আমার প্রতিমা ও আমার ভক্তকে দর্শন স্পর্শনার্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি ও প্রণত হইয়া গুণকর্ম্মের অনুকীর্ত্তন, আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার ধ্যান, লব্ধবস্তুর সমর্পণ, দাস্য ভাবে নিজেকে নিবেদন, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা, আমার জন্মকর্ম্মকথন, আমার পর্ব্বানুমোদন, আমার ব্রত ধারণ। নিজে কিম্বা সকলে মিলিত হইয়া আমার অর্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা, অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, কৃতকর্ম্মের পরিকীর্ত্তন না করা—ইত্যাদি। এগুলি ভক্তের লক্ষণ।

---

(৯)

সৎ সঙ্গ ।

তার পর ভগবান বুঝাইলেন যে ভক্তিযোগ সাধুসঙ্গ দ্বারা লাভ হয়। ভগবানের মতে সাধুসেবার মত ফলপ্রদ উপায় আর কিছুই নাই।

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব ।

নোপায়োবিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥

হে উদ্ধব! সৎসঙ্গজ ভক্তিযোগ ছাড়া অন্য উপায় নাই। কারণ আমি সন্তদের পরম আশ্রয়।

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এবচ ।

ন স্বধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥

ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ ।

যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গাপহো হি মাং ॥

আসন প্রাণায়ামাদি যোগ, সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্ববিবেক অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদরূপ, কৃচ্ছ্রতপঃ, সন্ন্যাস, অগ্নিহোত্রাদি ইষ্ট, কূপারামাদিনির্ম্মাণ পূর্ত্ত, দান, একাদশী উপবাসাদি ব্রত, যজ্ঞ অর্থাৎ দেবপূজা, ছন্দ

অর্থাৎ রহস্য মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম, যম, ইহারা কেহই আমাকে বশীভূত করিতে পারে না, যেরূপ সর্ব্বসঙ্গনাশক সাধুসঙ্গ আমাকে বশীভূত করে।

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসীতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥

তাহারা বেদ পাঠ করে নাই, আচার্য্যের উপাসনা করে নাই, তাহাদের ব্রত ছিল না, তপস্যা ছিল না, কেবল সাধুসঙ্গ হেতু আমাকে পাইয়াছিল।

---

(১০)

কর্ম্মত্যাগ কখন?

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রং॥

গুরূপাসনালব্ধ একভক্তি দ্বারা ও শাণিত জ্ঞানকুঠার দ্বারা জীবোপাধি ত্রিগুণাত্মক নিজ শরীর ছেদন করিয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে "অস্ত্র" অর্থাৎ সাধন ত্যাগ কর।

(১১

ভক্তি কিসে হয়?

সত্ত্বাদ্ধর্ম্মো ভবেদ্ বৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্ভক্তি লক্ষণঃ।
সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে॥

স্বত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে আমার ভক্তিরূপ ধর্ম্ম হয়। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি সাত্ত্বিক পদার্থ সেবা করিলে হয়। তাহা হইতে ধর্ম্ম হয়।

দশটী স্বাত্ত্বিক পদার্থ সেবা করা উচিত।

আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম্ম চ জন্ম চ।
ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ॥
* * * * সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে। * * * *

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির জন্য স্বাত্বিক আগম, অপ, প্রজা, দেশ, কাল, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান মন্ত্র সংস্কার এই দশটী সেবা করা উচিত, কারণ এই দশটীতে সত্ত্ব রজ ও তম তিন গুণের বৃদ্ধি হয়।

(১) আগম—পুরাণ বেদান্ত প্রভৃতি নিবৃত্তি সাত্ত্বিকশাস্ত্র সেবা কর উচিত। রাজসিক পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তিশাস্ত্র ও তামসিক পাষণ্ড বৌদ্ধ শাস্ত্র সেবা করা উচিত নহে। করিলে রজ-গুণ ও তমঃগুণের বৃদ্ধি হইবে।

(২) অপ্—স্বাত্বিক তীর্থাপ গঙ্গোদকাদি সেবা করা উচিত। রাজস, গঙ্গোদক ও তামস সুরাদি সেবা করা উচিত নহে। করিলে রজঃ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৩) প্রজা—স্বাত্বিক নিবৃত্ত জন সেবা করিবে। রাজস প্রবৃত্ত ও তামস দুরাচার জন সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৪) দেশ—স্বাত্বিক বিবিক্ত দেশ সেবা করিবে, রাজস রথ্যাদি দেশ ও তামস দ্যূতসদন সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৫) কাল—ধ্যানাদির জন্য ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তাদি কাল সেবা করিবে, রাজস প্রদোষ কাল ও তামস নিশীথ কাল সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে। প্রদোষ কালের ধ্যান লোকরঞ্জনার্থ ও নিশীথ কালের ধ্যানে নিদ্রার ব্যাঘ্যাত হেতু মন স্থির হয় না।

(৬) কর্ম্ম—সাত্ত্বিক নিত্য কর্ম্ম সেবা করিবে, রাজস কাম্য কর্ম্ম ও তামস অভিচারাদি কর্ম্ম সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৭) জন্ম—সাত্ত্বিক শৈব ও বৈষ্ণব দীক্ষা সেবা করিবে, রাজস শাক্ত দীক্ষা ও তামস ভূতপ্রেতাদি দীক্ষা সেবা করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে। [শাক্ত দীক্ষা মাত্রই রাজস নহে, কাম্য হইলেই রাজস, নিষ্কাম হইলেই সাত্ত্বিক।]

(৮) ধ্যান—সাত্ত্বিক শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান সেবা করিবে, রাজস কামিনী ধ্যান ও তামস শত্রুধ্যান করিবে না। করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

(৯) মন্ত্র—সাত্ত্বিক প্রণব মন্ত্র সেবা করা উচিত। রাজস কাম্য মন্ত্র ও অভিচার তামস মন্ত্র সেবা করিবে না, করিলে রজ তম বৃদ্ধি হইবে।

(১০) সংস্কার—সাত্ত্বিক আত্মার "সংস্কার" অর্থাৎ শোধক সেবা করিবে। রাজস দেহসংস্কার ও তামস গৃহসংস্কার সেবা করিবে না, করিলে রজ ও তম বৃদ্ধি হইবে।

---

(১২)

বিষয় ও বাসনা ত্যাগ হয় কিরূপে।

বিষয় গুণজ, বাসনাও গুণজ।

* * * * জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ॥

বিষয় ও বাসনা ব্রহ্মস্বরূপ জীবের "দেহ" অর্থাৎ অধ্যস্ত উপাধি জীবের স্বরূপ নহে।

* * * * ময়ি তুর্য্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদ্ গুণচেতসাম্॥

তুরীয় আমাতে অবস্থিত হইয়া সংসৃতি বন্ধ ত্যাগ করিবে। তাহা হইলেই বিষয় ও বাসনার ত্যাগ হইবে।

সিদ্ধ ব্যক্তির দেহ মাতালের কাপড়।

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতম্বা সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপং।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধ॥

দেহ আসনে অবস্থিতি করুক বা আসন হইতে উত্থিত হউক সিদ্ধ তাহা দেখেন না। যে দেহ দ্বারা আত্মার স্বরূপ অধিগত হওয়া যায়, সেই দেহ দৈবাৎ মৃত হউক বা দৈববশতঃ জীবিত থাকুক, সিদ্ধ খোঁজ রাখেন না, যেরূপ মদিরামদান্ধ অর্থাৎ মাতালের পরিহিত বাস কোমরে আছে বা নাই, তার হুঁস থাকে না।

(১৩)

উর্জ্জিতা ভক্তি।

বিভিন্ন উদ্দেশ্য।

কর্ম্মমীমাংসক বলেন, ধর্ম্মই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। কাব্যালঙ্কার-প্রণেতা বলেন, যশই উদ্দেশ্য। বাৎসায়নাদি বলেন, কামই উদ্দেশ্য। যোগশাস্ত্রকৃৎরা বলেন, সত্য শম দমই উদ্দেশ্য। দণ্ডনীতিকৃৎরা বলেন, ঐশ্বর্য্যই উদ্দেশ্য। চার্ব্বাকেরা বলেন, আহার ও মৈথুনই উদ্দেশ্য। কেহ কেহ বলেন, দেবপূজা, তপ, দান, ব্রত, নিয়ম, যমই উদ্দেশ্য। কিন্তু এসব তুচ্ছ ফল।

ভক্তিই মুখ্য।

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়াদিশঃ॥

অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচেতা, আমার দ্বারা সন্তুষ্টমনা ভক্তের সকল দিক সুখময়।

ভক্ত মুক্তিও চায় না।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥

ভক্ত পারমেষ্ঠ্য চায় না, মহেন্দ্র লোক চায় না, সার্ব্বভৌম চায় না, পাতালের আধিপত্য চায় না, যোগসিদ্ধি চায় না, মুক্তিও চায় না। তিনি আমাকে ছাড়া আর কিছু চান না।

উর্জ্জিতা ভক্তিতে ভগবান লাভ হয়।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং যোগ উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

যোগ, সাংখ্য, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাস দ্বারা সেরূপ আমাকে বশীভূত করিতে পারে না, যেরূপ আমার উর্জ্জিতা ভক্তি আমাকে বশীভূত করে।

উর্জ্জিতা ভক্তিতে জাতিদোষ নাশ হয়।

* * * * ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে। ভক্তি দ্বারা জ্ঞান লাভ। জ্ঞান ও ভক্তি এক জিনিষ॥

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তং॥

আমার পুণ্যগান শ্রবণ ও বর্ণন দ্বারা যেমন যেমন চিত্ত শুদ্ধ হয় তেমন তেমন সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়, যেরূপ চক্ষু অঞ্জন সম্প্রযুক্ত হইলে, সূক্ষ্ম বস্তু দেখা যায়। অতএব জ্ঞান ভক্তির অবান্তর ব্যাপার পৃথক নহে।

(১৪)

উন্নতির প্রধান অন্তরায় যোষিৎ।

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ॥
ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গত॥

স্ত্রীলোক ও স্ত্রীসঙ্গিদের সঙ্গ দূরে ত্যাগ করিয়া নির্ভয় দেশে, বিজনে থাকিযা অতন্দ্রিত হইযা আমাকে চিন্তা করিবে। পুরুষের যোষিৎ সঙ্গ দ্বারা ও যোষিৎ সঙ্গীদের সঙ্গ দ্বারা যেরূপ ক্লেশ ও বন্ধ হয, সেরূপ অন্য বিষযের প্রসঙ্গেতে হয় না।

শিখগুরু।*

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র)

গোবিন্দসিংহ।

বাস্তবজগতে আমরা এরূপ বহুসংখ্যক ব্যক্তি দেখিয়া থাকিব, যাহারা আপনাপন দৈনন্দিন জীবনধারণোপযোগী জীবিকা অর্জ্জন মানসে প্রাণপাতী পরিশ্রম করিয়াও উদরপূর্ত্তির উপযুক্ত আহার সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় না—যাহারা এই বিশাল প্রকৃতিরাজ্যে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে যাইয়া পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়, যাহাদিগের মানবজন্মের সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ ও বিফল করিবার জন্য শত্রু সর্ব্বদা লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রাণে আতঙ্ক ও বিভীষিকার সৃষ্টি করে, যাহারা জীবনে সাফল্য ও সিদ্ধি-লাভোদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবিধ বিপজ্জালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, যাহাদিগের জগতে আপন বলিবার কেহ নাই, নৈরাশ্যে প্রবোধ দিবার কোন সুহৃৎ, শোকে সান্ত্বনা দিবার কোন সহায়ক নাই—এরূপ শোচনীয় ভাবে জীবনযাপন করিলেও তাহাদিগের প্রত্যেকের জীবনে এমন এক শুভ মুহূর্ত্ত আইসে যখন বিধাতার আশীষ-বারি অবিচ্ছিন্নভাবে তাহাদিগের মস্তকে বর্ষিত হয়। তাঁহার অপার করুণা ও অনুগ্রহ তাহাদিগকে অবশ্যম্ভাবী পতন

---

* 'শিখগুরু' শীর্ষক প্রবন্ধাবলী লিখিতে যাইয়া আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি। এস্থলে ঐ সকলের রচয়িতাগণের নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

1. History of the Sikhs (in 2 Vols.) By W. L. M'Gregor, M.D. (published by James Madden & Co.)
2. Guru Govind ('The Saints of India' series published by Mr. Nateson & Co.) By K. V Ramaswami, B A., B.L.
3. আর্য্যকীর্ত্তি...শ্রীরজনীকান্ত সেন।
4. গুরু গোবিন্দসিং—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

হইতে রক্ষা করে, কোন্ এক অজ্ঞেয় স্থান হইতে সহায় ও সাহায্য তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়—তখন আবার তাহাদিগের নিরাশপ্রাণে নব আশার সঞ্চার হইতে থাকে, তাহারা অভীপ্সিতলাভে মানবজীবন ধন্য জ্ঞান করে। জাতীয় জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা দেখি, বিশ্বেতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় উহা লিখিত রহিয়াছে। যখন কোন দুর্ব্বলজাতি অত্যাচার-অবিচারে উত্যক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে শত্রু-সমাবৃতভাবে আতঙ্কময় জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে, আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা ও বীর্য্যহীন হইয়া প্রতিক্ষণেই আপনাদিগের অস্তিত্বলোপভয়ে ভীত হয়, সেই সময়েই তাহাদিগের রক্ষাকল্পে শ্রীভগবান উপযুক্ত সহায়ক ও রক্ষক প্রেরণ করিয়া থাকেন— যিনি ঐশী শক্তিতে বলীয়ান হইয়া জাতীয় মহাতরণীর কর্ণধাররূপে বিরাজ করিতে থাকেন এবং সর্ব্বপ্রকার ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়া তরী পার করাইয়া দেন, উহার ফলে ধ্বংসোন্মুখ জাতি আবার আপন বৈশিষ্ট্য ফিরিয়া পায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে ফরাসী-দিগের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করুন; ঐ সময়ে গৃহবিবাদ, বিপ্লব ও ষড়যন্ত্র প্রভৃতিতে সমগ্র ফরাসী-রাজ্য পরিপূর্ণ– উহার ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিশক্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। দুর্ব্বল ও অসহায় নৃপতি সপ্তম চার্লস কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে পুত্তলিকাবৎ ফরাসী-সিংহাসনে বিরাজ করিতে লাগিলেন—স্বজাতির সকল অস্তিত্ব বুঝি বা লোপ পায়, কিন্তু তাঁহার কোন যোগ্যতা নাই! এদিকে বহিঃশত্রু আসিয়া রাজ্যাধিকারে প্রবৃত্ত হইল এবং অবিলম্বে কয়েকটী বিখ্যাত নগরী অধিকার করিয়া বসিল। এইরূপে ফরাসীজাতি যখন আন্তর্জাতিক কলহে মরণোন্মুখ, যখন বহিঃশত্রু আসিয়া উহার স্বাধীনতা-হরণের জন্য উদ্যত—সেই নৈরাশ্যের মুহূর্ত্তে সাহায্য আসিয়া উপস্থিত হইল— ভগবানের দয়ায় ফরাসী আবার আত্মশক্তি ফিরিয়া পাইল। কোন্ এক সুদূর, অপরিচিত, নির্জ্জন পল্লী হইতে অলৌকিক শক্তিসম্পন্না, বীরাঙ্গনা জোয়ান (Joan of Arc) আসিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন—ফরাসী-জাতি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইল।

জগতের ইতিহাসে ফরাসীর অতুলকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া জোয়ান চলিয়া গেলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপখণ্ডে আবার ইহারই পুনরভিনয় দেখিতে পাই। ধর্ম্মপ্রাণ ইউরোপীয়গণ যখন যথেচ্ছাচারী, লম্পট পোপদিগের অমানুষিক অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইতেছিল, যখন ইউরোপের আকাশ উহাদিগের অনুশোচনা ও হাহাকারধ্বনিতে বিদীর্ণ হইতেছিল, সেই সময়ে মহামতি লুথারের (Martin Luther) ন্যায় একজন অসামান্য মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল; সকলে তাঁহাকে ভগবানের শ্রেষ্ঠদান বলিয়া সাদরে নেতৃত্বে বরণ করিয়া লইলেন। ধর্ম্মজগতে স্বাধীনতা আবার ফিরিয়া আসিল।

শিখদিগের জাতীয় জীবনে ইহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় নাই। পাঠক দেখিয়াছেন, হরগোবিন্দের পরবর্ত্তী গুরুত্রয়ের সময়ে নানারূপ দুর্ব্বলতা আসিয়া জাতীয় জীবনে ব্যর্থতা আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। পূর্ব্বের তেজস্বিতা ও পরাক্রম হারাইয়া উপযুক্ত নেতার অভাবে শিখগণ নানা উপায়ে বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, তাহাদিগের প্রাণে আশঙ্কা হইল, বুঝি বা মুসলমানদিগের ভীষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধঘোষণা করিতে সক্ষম না হইয়া তাহাদিগের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। এইরূপে জীবন-মরণের মহাসমস্যা আসিয়া শিখদিগের প্রাণে প্রবল অস্থৈর্য্যের সৃষ্টি করিল। বিশেষতঃ কিরূপভাবে সামান্য একজন মুসলমান-প্রহরী আসিয়া তেগ্‌বাহাদুরকে তাহার অনুগামী হইতে দৃঢ় আজ্ঞা করিয়াছিল,—তৎপরে গুরু কিরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া সশস্ত্র রাজানুচরের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, রাজদরবারে সভাসদ্‌পরিবেষ্টিত হইয়া আওরঙ্গজেব তৎপ্রতি কিরূপ নীচতাজ্ঞাপক কটূক্তি ও বিদ্রূপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহার পর তাঁহার অপমৃত্যু! সে কি ভীষণ দৃশ্য! সেই সকল ঘটনা সর্ব্বদাই শিখদিগের মনে বিক্ষুব্ধ হইতেছিল এবং আপনাদিগকে একান্ত অসহায় ভাবিয়া তাহারা উন্নতির সকল আশা-ভরসা জলাঞ্জলি দিল। তাহাদিগের সেই ঘুমঘোর বিনষ্ট করিয়া গোবিন্দসিংহ আবির্ভূত হইলেন—শিখ লুপ্ত-সৌভাগ্য আবার ফিরিয়া পাইল।

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের হৃদয়ে দৃঢ়ধারণা হইয়াছিল যে শিখ-জাতি জীবিত থাকিলে মোগলশক্তি অক্ষুণ্ণ রহিবে না; এই আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বলপ্রয়োগ ভিন্ন অপর কোন উপায় নাই। তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণাই ভারতে আবার যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি করিল। মৃত্যুকালে পিতা তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন—

"হিন্দু ধরমকো নহি বিগাড়ো।
একে হুনহো কো প্রতিপালো॥"

শিখ পূর্ব্বে স্বেচ্ছায় মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে যায় নাই, কিন্তু মোগল নৃপতিদিগের অমানুষিক অত্যাচার, অত্যধিক সঙ্কীর্ণতা ও অবিচারে তাহারা আর ধৈর্য্যধারণে সক্ষম হইল না—তাই অপর কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে উঠে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেবর্ষি নারদ প্রশ্নচ্ছলে নৃপোত্তম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন —'মহারাজ! দুর্ব্বল শত্রুকে ত বলপূর্ব্বক পীড়িত করেন না?' এই সামান্য নারদীয় উপদেশের মধ্যে রাজ্যপালনের মূলমন্ত্রটী নিহিত রহিয়াছে এবং দেখিতে পাই উহার প্রতি অমান্য প্রকাশ করিয়া অনেক শাসনকর্ত্তা উপযুক্ত ফলভোগ করিয়াছেন। এই দোষেই স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ হলাণ্ডদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রেও প্রায় ঐরূপ ফল হইয়াছিল।

খৃষ্টাব্দের ১৬৬৬ বর্ষে পাটনায় গোবিন্দসিংহের জন্ম হয়। তদীয় পিতা ধূর্ত্ত রামরাওয়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার আশায় ঐস্থানে আশ্রয় লন। বাল্যকাল হইতেই গোবিন্দ শারীরিক ব্যায়াম ও নানা-প্রকার দুঃসাধ্য ক্রীড়ায় রত থাকিত এবং কতকগুলি সহচর-সমভি-ব্যাহারে অতি দূরবর্ত্তী নির্জ্জনকানন প্রদেশে শীকার করিয়া বেড়াইত। শৈশবে গোবিন্দ কিরূপ অদ্ভুত সাহসিকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিল তাহার বিবরণ 'সূর্য্যপ্রকাশ' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। কথিত আছে, একদা গোবিন্দ কয়েকজন সঙ্গী লইয়া পথের উপর নানা-

রূপ ক্রীড়া করিতেছিল। বাদ্‌শার অধীনস্থ জনৈক শাসনকর্ত্তা সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নানা আড়ম্বরে সেই পথ দিয়া যাইতে-ছিলেন। হঠাৎ কতিপয় বালককে গতিরোধ করিতে দেখিয়া তাঁহার অনুচরবর্গ উহাদিগকে তিরস্কার করিল এবং শেষে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিল। গোবিন্দ দলের নেতা—সকলে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিল। আপনাদিগের আনন্দোল্লাসে অকস্মাৎ এরূপ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে সকলকে ডাকিয়া গোবিন্দ বলিল—'আয় ভাই! আমরা খুব হাসিতে থাকি।' এইরূপে অবজ্ঞাত হইয়া নবাবের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রহিল না—তিনি অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বাদরেব মত মুখ করিয়া তোমরা কি কহিতেছ?" সাহসী গোবিন্দ উত্তর করিল—

"বদন বিলোচন।
সমান জিন বাদরকে॥
ল্যায় হেঁ রাজ সোই ভয়ো।
হৃদয় তব থামেও॥
যয়হে তেজ ঠারো।
কোই হোয় নারাখ বারো॥
তব হয়রো হোঁয়ে ভারো।
বনে সম বিধ বামে য়ো॥

অর্থাৎ—"মুখ দেখ, বাদরের মত নহে। এই তোমার রাজ্য লইবে; তোমার হৃদয় কাঁচা হইবে, কিন্তু তোমার এ তেজ চলিয়া যাইবে। রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। এখন যে হালকা আছে, তখন সে ভারি হইবে। সে সময়ে বিধি বাম হইবে।" সামান্য একটী বালকের মুখ হইতে এরূপ উত্তর শ্রবণে নবাব স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার আর কিছু করিবার ক্ষমতা রহিল না। বাল্য-জীবনের এই সামান্য ঘটনা তাঁহার ভবিষ্য-উন্নতির পূর্ব্বাভাস প্রদান করিল। এ উক্তির সত্যতা তিনি নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল ঐ স্থানে কাটাইবার পর গোবিন্দ আনন্দপুর নামক স্থানে পিতার নিকট গমন করেন। যাহাতে পুত্র ভবিষ্যতে উন্নতি-লাভ করিতে সক্ষম হয়, তেগ্‌বাহাদুর তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় কোন দিন দেন নাই। সবিশেষ কঠোর শাসনের মধ্যে থাকিয়া গোবিন্দসিংহের শরীর-মন উভয়ই সমভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী জনকের এইরূপ সুশিক্ষার প্রভাবেই তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির রক্ষাকর্ত্তা ও মুখোজ্জ্বলকারী হইতে সক্ষম হন। যাহা হউক, তৎপরে মানব-জীবনের কর্ম্ম-কোলাহল ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে দিন দিন গোবিন্দ নানাবিধ প্রয়োজনীয় এবং অত্যাবশ্যক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তিনি বাল্য হইতেই শিখদিগের অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধীয় সকল প্রকার তথ্য সঞ্চয় করেন এবং সবিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত ঐ সকলের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন। ভবিষ্যতে জাতীয় জীবন সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিয়াছিলেন, পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানরাশি তাঁহার পথপ্রদর্শকরূপে কার্য্যকরী হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই তাঁহার সময়ে শিখগণ উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে সক্ষম হয়। যাহা হউক, গোবিন্দের সমক্ষেই মোগলসৈনিক আসিয়া নির্দ্দোষ ও নিরভিমান তেগ্‌বাহাদুরকে দরবারে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। উহাদিগের নৃশংসতা ও অমানুষিক অত্যাচার সন্দর্শনে যুবক হৃদয় ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় পূর্ণ হইল কিন্তু কি করিবে উহার যে কোন ক্ষমতা নাই!

ঐ ঘটনার পর কিয়ৎকাল অতীত হইল। দিল্লীর কোন সংবাদাদি না পাইয়া গোবিন্দের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইল—তিনি পিতার জীবনসম্বন্ধে সন্দীহান হইলেন। এদিকে যতই দিন যায় তেগ্‌বাহাদুর ততই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হন। তদানীন্তন প্রথানু-সারে অগত্যা তিনি নারিকেল ও পয়সা দিয়া একজন শিখকে গোবিন্দের নিকট প্রেরণ করিলেন। ঐ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া সমুচিত

সম্ভ্রমের সহিত গোবিন্দসিংহের পাদবন্দনা করিয়া বলিল—"আপনার নিকট মহাত্মা তেগ্‌বাহাদুরের ইহাই শেষ অনুরোধ—

বিনা দের তুরকণ্‌ প্রহারে, সেবকন্‌ রচ্ছো বলঠান্‌।"

অর্থাৎ অবিলম্বে মুসলমান সংহার করিবে এবং সেবকগণের বলরক্ষা করিবে। এই ঘটনার অব্যবহিতকাল পরে পিতার অপমৃত্যুর বার্ত্তা তাঁহার নিকট পৌঁছিল। উহা শ্রবণ করিয়া সমগ্র শিখসমাজ ক্ষোভে ও অনুতাপে একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং আপনা-দিগকে অসহায় জ্ঞান করিয়া শোকাভিভূত হইল। যাহা হউক, কিয়ৎকালের জন্য উহারা আপনাদিগকে সংযত রাখিয়া তেগ্‌বাহাদুরের অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাধানে ব্যাপৃত রহিল। মোগলের হস্ত হইতে গুরুর ছিন্নমুণ্ড উদ্ধার করা যে কিরূপ দুরূহকর্ম্ম তাহা শিখগণ উত্তমরূপেই বুঝিত। সেই জন্য গোবিন্দসিংহ সেবকগণকে একত্র আহ্বান করিয়া উক্ত কঠিন কার্য্যের ভার উপযুক্ত ব্যক্তিকে লইতে বলিলেন। জনৈক নির্ভীক তেজস্বী শিখ উহার দায়িত্ব লইতে স্বীকৃত হইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিল। রাজপ্রহরীদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া হউক, বা অপর কোন উপায়ে হউক, ঐ ব্যক্তি তেগ্‌বাহাদুরের ছিন্নমুণ্ড অবিলম্বে গোবিন্দসিংহের নিকট পৌঁছিয়া দিয়া সমগ্রজাতির সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা লাভ করিল। শিখগণ একত্র সমবেত হইয়া মুণ্ডটী কিরাতপুরে প্রথিত করিয়া তদুপরি উপযুক্ত সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিল। তৎপরে নতজানু হইয়া সকলে একবাক্যে তৎসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিল—এই প্রবল অন্যায় ও অত্যাচারের সমুচিত প্রতিশোধ লইতে হইবে, সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া উহার জন্য প্রাণপাত করিতে হয়, সেও স্বীকার।

অতঃপর তেগ্‌বাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র গোবিন্দসিংহকে গুরুপদে বরণ করিয়া লইবার জন্য সকলে মিলিয়া আয়োজন করিতে লাগিল। নানাপ্রকার সৌখীন দ্রব্যসম্ভার লইয়া চারিদিক হইতে ভক্তগণ সমবেত হইতে লাগিলেন। কথিত আছে, গোবিন্দের নিকট যখন কেহ কোন প্রকার উপঢৌকনাদি লইয়া যাইত, তিনি উহার মধ্যে

অস্ত্র ও ঘোটক পাইলে অতীব সন্তুষ্ট হইতেন এবং বলিতেন—"আয়ুধ ঘোড়া যে লেয়াহেঁ সে শিখ খুসী গুরুকী লেইহঁ। মন বাঁছত সকল ফল পাইহেঁ।" যে শিখ আয়ুধ ও ঘোড়া লইয়া আসিবে, সে গুরুর আশীর্ব্বাদ লইবে এবং মনোবাঞ্ছিত ফল পাইবে। অভিষেকের সময় সকলকে নানারূপ দ্রব্য লইয়া যাইতে দেখিয়া লাহোরনিবাসী হরযশ নামক সভিখী বংশোদ্ভব জনৈক ক্ষত্রিয়শিখ ভক্তিভরে গুরুপদে প্রণত হইয়া করযোড়ে বলিল—"আমি অতি সামান্য ব্যক্তি। কিন্তু হীনজনের মান, সহায়, সম্পদ সকলই গুরুর নিকট। আমার প্রার্থনা এই যে আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া দাসীরূপে গ্রহণ করুন—তাহার জীবন ধন্য হইবে।" ঐ ব্যক্তির সহৃদয় প্রার্থনায় গোবিন্দ কর্ণপাত করিলেন এবং ঐ প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে নানা আড়ম্বরের সহিত ঐ শুভ-উপলক্ষেই 'মাত জিতোজীর' সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

ইহার কিছুকাল পরেই গোবিন্দের দ্বিতীয় বিবাহ হয়। পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না কিন্তু মাতার বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইয়াছিল। জনৈক শিখ আপন ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ গুরুকে আপন কন্যাদান করিল—ইঁহার নাম সুন্দরী। গোবিন্দের চারিটী পুত্রলাভ হয়—জিতোজী হইতে জোরায়র সিংহ এবং জুঝার সিংহ, সুন্দরী হইতে অজিৎসিং ও কলাটসিং। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম দুইজন যুদ্ধে নিহত হয় এবং অপর দুইজন সিরহিন্দে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারায়।

যুবক গোবিন্দসিংহ নিজ অনুচরবর্গের সহিত শক্তিসঞ্চয়ের সকল প্রকার আয়োজন করিতে লাগিলেন। উহা দেখিয়া তদীয় প্রতিবেশী পার্ব্বত্য নৃপতিবৃন্দ ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল এবং উহাতে যে তাহাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী তাহা স্থির বুঝিতে পারিল। অবশেষে উহারা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবে বলিয়া স্থির করিল। তাই উহার কারণানু-সন্ধান করিতে লাগিল। কুলহরের রাজা ভীমচাঁদের সহিত গুরুর সামান্য একটী হস্তী উপলক্ষ্য করিয়া বিবাদ বাধে। উহার একটী

স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। গোবিন্দসিংহ গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে নানাস্থান হইতে ভক্তগণ বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া আসিত। কামরূপের রাজাও নানা উপহারদ্রব্যের সহিত একটী কর্ম্মপটু সুন্দরকায় হস্তী প্রদান করেন। গুরু উহার পৃষ্ঠে সমারূঢ় হইয়া বন্যপ্রদেশে মৃগয়া করিতে যাইতেন। একদা তাঁহার হস্তী ভীমচাঁদের এলাকাস্থ ভূমিতে যাইয়া কিয়ৎপরিমাণ ক্ষতি করিল। ঐ ব্যপদেশে দুইদলে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। শেষে যুদ্ধ ঘোষিত হইলে ভাঙ্গানির ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ সৈন্যসমাবেশ করিয়া সমবেত হইল। এই ভীষণ বিগ্রহে শিখসৈন্য অদ্ভুত পরাক্রমের সহিত বিপক্ষীয়গণকে সংহার করিয়াছিল এবং অবশেষে সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া আপনাদিগের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। তখন চতুর্দ্দিক হইতে 'ওয়া গুরু জী কী ফতে' রব উত্থিত হইতে লাগিল। ইহার পর শিখগণ যে মোগলশক্তির শত্রু, তাহা সর্ব্বসমক্ষে প্রচারিত হইয়া গেল। তখন হইতে ভারতসাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে শিখ ও মোগলের, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ-বহ্নি বহুবর্ষের জন্য প্রজ্বলিত হইল। শ্রীগুরু তদ্দর্শনে আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন—কিসে তিনি আবার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপনে সমর্থ হইবেন অনুক্ষণ তাহাই ধ্যানমগ্ন হইয়া চিন্তা করিতেন।

গোবিন্দসিংহ নিজে অসামান্য শক্তিশালী পুরুষ হইলেও আপন অভীপ্সিতলাভের পথে যে কত বাধাবিঘ্ন ও অন্তরায় বর্ত্তমান তাহা সম্যক্ অবধান করিয়াছিলেন—তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে ঐ ব্রত সুসিদ্ধ করা মানবশক্তির সাধ্যাতীত, দৈবশক্তির সহায় না লইলে তিনি কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। দেবতা ও মানব উভয়ের শক্তি একত্র সমবেত করিতে হইবে। তাই সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলমাত্র অস্ত্রশিক্ষার প্রচলন করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই—বিজয়লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া তাঁহার অনুপ্রেরণাতেই জাতীয়-জীবন উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। যাহাতে শিখসৈন্যগণের মনে সাহস ও বীর্য্য জাগরূক হয় তজ্জন্য তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে কতিপয় স্বধর্ম্ম-

নিষ্ঠ ও তপস্বী ব্রাহ্মণগণকে সমাহূত করিয়া হিন্দুর মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণ প্রভৃতির অংশবিশেষ অনূদিত করাইয়া শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে প্রাত্যহিক আবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের দেবচরিত্রের এক একটি ঘটনার বিবরণ আবৃত্তি করিতে করিতে উহাদিগের মনপ্রাণে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইত। যখন তাহারা শুনিত,

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ! ॥"

তখন তাহাদিগের হৃদয়ে নূতন উদ্যমের উন্মেষ হইত। চণ্ডিকাদেবীর আরাধনা করিতে মনস্থির করিয়া তিনি উক্ত ব্রাহ্মণগণের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যজ্ঞে পৌরহিত্যের উপযুক্ত, তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। উঁহারা বারাণসীনিবাসী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কেশবদাসকে ঐ কার্য্যের জন্য আহ্বান করিতে অনুরোধ করিলেন। গুরু সংবাদ লইয়া জ্ঞাত হন যে, কেশবদাস ঐ সময়ে জ্বালামুখী নামক স্থানে তীর্থদর্শন-মানসে অবস্থান করিতেছেন—তাঁহার শিষ্যেরা তথায় সত্বর উপস্থিত হইয়া উঁহাকে সাদরে শ্রীগুরুসকাশে লইয়া গেল।

আনন্দপুর হইতে সপ্তক্রোশ উত্তরে চণ্ডিকা নয়নাদেবীর মন্দির অবস্থিত—উহা পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যপীঠরূপে সর্ব্বত্র পরিগণিত। কেশবদাসের সহিত গোবিন্দসিংহ যজ্ঞ করিবার জন্য ঐস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রায় চারিমাস এই নির্জ্জনপ্রদেশে নিয়মিতভাবে দেবীর পূজা, ধ্যান ও আরাধনায় মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। আত্মীয় স্বজনদিগের সকল কথা বিস্মৃত হইয়া সেই একনিষ্ঠ সাধক আরাধ্যদেবীর করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন—যেন তাঁহার জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে তিনি সক্ষম হন, যেন শিখজাতি আবার উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করে! এই দীর্ঘ সময়ে তিনি দেবীর উদ্দেশ্যে যে সকল স্তবস্তুতি রচনা করেন তাহার বিশেষ বিবরণ 'সূর্য্যপ্রকাশে' লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এস্থলে পাঠকের কৌতুহল-নিবৃত্তির জন্য

একটিমাত্র উপহার দিব। দেবী অষ্টভুজার সমক্ষে শ্রীগুরু তদ্‌গত-প্রাণ হইয়া আবেগভরে বলিতে লাগিলেন—

। ওঁ সৎগুরু প্রসাদ।

শ্রীভগবতীজী সহায়॥

ভগবতীচ্ছন্দ ছক্কাপাত সাহি॥

নমো উগ্রদন্তী অনন্তি সবইয়া।
নমো যোগ যোগেশ্বরী যোগ মায়িয়া॥ ১
নমো কেহরী বাহনী শত্রুহন্তি।
নমো শারদা ব্রহ্ম বিদ্যা পঢ়ন্তি॥ ২
নমো ঋদ্ধিদা সিদ্ধিদা বুদ্ধিদায়িনী।
নমো কাল্‌কে কাল্‌কো কালছেনী॥ ৩
নমো কাল আজাল হয়েহের তেরো।
নমো তিনহু লোক কিনো আহে রো॥ ৪
নমো জ্যোতি জ্বালা তোমে বেদ গাঁয়ে।
সুরাসুর ঋষীশ্বর মাহি ভেদ পায়েঁ॥ ৫
তুহি যোগ যুগ তেনি তুহিঁ খড্যা ধারে।
তুহি জয় করন্তি অসুর গহি পছারে॥ ৬
তুহি যোগনি খপ্রভরণী অদোখং।
রক্তবীজকে প্রাণকো পাকড়্ সোখং॥ ৭
তুহি জল থলে পর্ব্বতে গিরি নিবাসী।
তুহি সভ ঘটনমো নিরালম্ব প্রকাশী॥ ৮
তুহি দুষ্ট দাহনী তুহি সর্ব্বপালী।
তুহি বৃচ্ছ পোহপা তুহি আপ মালী॥ ৯
তুহি বিশ্বভরণী তুহি জন্ প্রকাশি।
তুহি অলখবরণী তুহি ভূ আকাশী॥ ১০
নমো জালপা দেবী দুর্গে ভবানী।
তিলুলোক নব খণ্ডমৈ তুম প্রধানী॥ ১১

অটল ছত্র ধারণী তুহি আদি দেবং।
সকল মুনী জনা তোহি নিশ দিন সরেবং ॥১২

তুহি কাল আকাল কি জ্যোতি ছাজৈ।
সদাজয় সদাজয় সদাজয় বিরাজৈ॥ ১৩

স্রিএহি দাস মাঙ্গে কৃপাসিন্ধু কি জৈ।
স্বয়ং ব্রহ্মকি ভক্তি সব্বত্র দিজৈ॥ ১৪

তুহি জাগতি জ্যোতি জ্বালা স্বরূপং।
তুহি জগ্ সকলমৈ রমন্তি অনুপং॥ ১৫

মহামূঢ় হাও দাস দাসন্তেহারা।
পকড় বাহ ভর জল করো বেগ পারা॥ ১৬

ফতেহি ডঙ্ক বাজে কৃপা ইএঁও করীজে।
এহি বারতা দাস কি নিৎ শুনিযে॥ ১৭

করহু হুকুম্ আপনা সকল দুষ্ট ঘায়ু।
তুরক্ হিন্দকা সকল ঝগ্রা মিটায়ুঁ॥ ১৮

আগম স্থুর বীরে উঠে সিংহ যোধা।
পাকড়্ তুর্কনকো কারঁবৈ নিরোধা॥ ১৯

সকল জগৎমো খালিসা পন্থা গাজে।
জগে ধর্ম হিন্দুতুরক্ দুন্দ্ ভাজে॥ ২০

জপৌ জাপঁ একা হরে হরি অকালং।
হয়ৈ *বদুনি সব্ ছিন্‌কমৈ নেহালং॥ ২১

শুনো তুম ভবানী চামন কি পুকারে।
কর দাসোপর মেহর আপ্রম্ অপারে॥ ২২

ভগবতী দোহরা।

দ্বার তোমারে ঠাঢ় হোঁ একবর দিজে মোয়।
পন্থ চলে ত জগতমে দুষ্ট খেপাবহু তোঁয়॥

---

* অর্থাৎ সৎগুরু প্রসাদে প্রাপ্ত একমাত্র ওঁকার মঙ্গলা-চরণরূপে ব্যবহৃত।

শ্রীভগবতী দেবী সহায়। দশম গুরুর লিখিত ভগবতী সম্বন্ধীয় এই ছয় ছন্দ।

ভক্তের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় দেবী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

হে উগ্রদন্তি! (তুমি) অনন্ত অপেক্ষাও অধিক, তোমাকে নমস্কার।

হে যোগমায়া! তুমি যোগ যোগেশ্বরী, তোমাকে নমস্কার। হে কেশরীবাহিনী! শত্রুসংহারিণী। তোমাকে নমস্কার। হে সারদা! তুমি ব্রহ্মবিদ্যা পাঠকারিণী, তোমাকে নমস্কার। হে সিদ্ধি ঋদ্ধি ও বুদ্ধিদায়িনী। তোমাকে নমস্কার। হে কালিকে! তুমি কালের কালকে ক্ষয় কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তকাল দেখিতে পাও, তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিলোক-ব্যাপিনী তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্যোতির প্রকাশক, বেদ তোমার গান করে, তোমায় নমস্কার। সুর অসুর ঋষিগণ তোমার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না। তুমি অসুরগণকে ধরিয়া পরাজয় পূর্ব্বক জয়লাভ কর। তুমি যোগযুক্ত, তুমি খড়্গধারিণী। তুমি যোগিনী, খপ্রধারিণী, দোষ-শূন্যা (পবিত্রা)। তুমি রক্তবীজকে ধরিয়া তাহার প্রাণ শোষণ করিয়াছিলে। তুমি জল স্থল পাহাড় পর্ব্বত নিবাসিনী। তুমি সর্ব্বঘটকে সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেছ। তুমি দুষ্টকে দমন কর। তুমি সকলকে পালন কর। তুমি বৃক্ষ, পুষ্প, তুমিই স্বয়ং মালী। তুমি বিশ্ব ভরিয়া আছ। তুমি জগতকে প্রকাশ করিতেছ। তুমি অলক্ষ্যবরণী— অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর। তুমিই পৃথিবী, তুমিই আকাশ। হে সারদা দেবি। দুর্গে! ভবানি! তোমায় নমস্কার। তিনলোক নবখণ্ডে তুমিই প্রধানা। অটল ছত্রধারিণী তুমিই আদিদেব। সকল মুনিগণ নিশিদিন তোমায় স্মরণ করিতেছে। তুমি কাল অকালের জ্যোতি, তোমাতেই শোভা পাইতেছে। জয় সমূহ তোমাতেই বিরাজ করিতেছে। এ দাস এই প্রার্থনা করিতেছে যে প্রকৃত ব্রহ্মভক্তি (ভগবদ্ভক্তি) সর্ব্বত্র প্রদান করুন। তুমি জাগতিক জ্যোতিঃ প্রকাশ স্বরূপ। সমস্ত জগতে অনুপম রমণ করিতেছ। আমি তোমার দাসানুদাস—অতি মূঢ়। আমার বাহু ধরিয়া সত্বর ভববারি হইতে উদ্ধার কর। এমন কৃপা কর যে জয়ডঙ্কা বাজুক। দাসের এই নিবেদন—সর্ব্বদা শুন। তুর্ক হিন্দুর সকল ঝগড়া মিটুক্। স্বয়ং হুকুম কর সকল দুষ্টকে নাশ কর। মহাসুর বীর যোদ্ধ, সিংহগণ উঠুক, তুর্কগণকে নিরোধ করুক। সমস্ত জগতে খালসাপন্থ (শিখধর্ম্ম) বিরাজিত হউক হিন্দুধর্ম্ম জাগুক, তুর্ক-অন্ধকার ঘুচুক। অকাল পুরুষের একমাত্র হরি হরি নাম জপদ্বারা সকল জগৎ ক্ষণমাত্রে তৃপ্তিলাভ করুক্। হে ভবানি। তুমি আমার নিবেদন শুন, দাসের প্রতি এই অপার দয়া বিতরণ কর।

ভগবতী দোহরা (ভগবতী শব্দ মঙ্গলার্থ ব্যবহৃত। দোহরা—ছন্দবিশেষ) তোমার দ্বারে আমি দাঁড়াইয়া আছি। আমায় এক বর দাও। জগতে (শিখ) পন্থ চালাই— তুমি দুষ্ট নাশ কর। (শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুদিত।)

অতঃপর গোবিন্দের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে তিনি তাঁহার কার্য্যাবলীতে অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছেন—তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া দেবী 'করদ' নামক অসি প্রদান করিলেন এবং অবিলম্বে খালসা গঠনে আজ্ঞা দিলেন। কথিত আছে গোবিন্দ তন্ময়মনে মুদ্রিত নয়নে চিন্তারত থাকাতে দেবীর প্রথম আহ্বানে নয়ন উন্মিলন করেন নাই। সেইজন্য দেবী বলেন—"যেহেতু তুমি প্রথমেই চক্ষু মুদ্রিত করিলে তখন তোমার জীবদ্দশায় খালসাগণ বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিবে না, পরে হইবে।" তৎপরে গোবিন্দ আপন অঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া বলি প্রদান করেন। উহাতে সম্যক্ সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন আপনার চারিটি পুত্রের মধ্যে একটি উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইবেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর প্রবল অনিচ্ছা-বশতঃ ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন এই সময় শ্রীরামচন্দ্র সেবক মহাবীরস্বামী তাঁহাকে দেখা দেন এবং আপনার 'কাছ' (ছোট পাজামা) প্রদান করিয়া বলেন উহা পরিধান করিলে তিনি অল্পায়াসেই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবেন। শিষ্যদিগকেও ঐরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গে বস্ত্র-সঙ্কট।

আবেদন ও কার্য্যবিবরণী।

গতবারের বিবরণীতে বঙ্গের ভীষণ বস্ত্র-সঙ্কটের বিষয়ে আমরা সহৃদয় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম এবং উক্ত অভাব মোচনার্থ সাহায্য ভিক্ষাও করিয়াছিলাম। পূর্ব্বাপেক্ষা অভাব ভীষণ-তর আকার ধারণ করিলেও আমরা এপর্য্যন্ত উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ বা বস্ত্র সাহায্য প্রাপ্ত হই নাই। বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিক হইতে বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রত্যহ সাহায্য-প্রার্থনার পত্র প্রাপ্ত হইতেছি। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণকেই যখন বস্ত্র-ভিক্ষা করিতে হইতেছে তখন গরীবের অবস্থা কিরূপ হইয়া পড়িয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক, যৎকিঞ্চিৎ আমরা এপর্য্যন্ত পাইয়াছি, তাহা অভাবের তুলনায় নিতান্ত সামান্য হইলেও বিশেষ অনুসন্ধানের পর নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে বিতরণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। নিম্নে কেন্দ্রগুলির নাম ও বিতরিত বস্ত্রের সংখ্যা প্রদত্ত হইল।—মৈমনসিংহ ২০; নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) ১০; দুপতারা (ঢাকা) ১০; বারহাটা (হুগলী) ৩৪; মহেশপুর (যশোহর) ১০; বাঁকুড়া ৩২; গড়বেতা (বাকুড়া) ১০; পারুরা (মৈমনসিংহ) ১৪; কোয়ালপাড়া (বাকুড়া) ৪২; গুটিয়া (বরিশাল) ২০; কোটালপাড়া (ফরিদপুর) ২০; সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) ৪০; এবং বেলুড় (হাবড়া) ১০০খানি।

প্রত্যেক কেন্দ্রেরই সেবকগণ পুনঃ পুনঃ বস্ত্র পাঠাইতে লিখিতেছেন কিন্তু আমাদের নিকট অতি অল্পসংখ্যক বস্ত্র থাকায় তাহাদিগকে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র পাঠাইতে পারিতেছি না। যদিও আমরা বুঝিতেছি, আশু সাহায্যদান প্রয়োজন। সেই জন্য আমরা ধনী-ব্যক্তিগণের নিকট, ও মাড়োয়ারী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট বিশেষতঃ যাহারা বস্ত্র-ব্যবসায়ে নিযুক্ত এবং সহৃদয় সাধারণের

নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। ইহাতে তাহাদের গরীব এবং দুস্থ ভ্রাতৃবৃন্দেরই সেবা করা হইবে।

আজকাল অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই বস্ত্র-সঙ্কটের মূলোচ্ছেদ করিতে চরকার প্রচলনের এবং কার্পাস তুলার চাষের চেষ্টা করিতেছেন। বাস্তবিক, এই উপায়েই বস্ত্র-সমস্যার কথঞ্চিৎ মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু সাধারণের নিকট আমাদের নিবেদন,—বর্ত্তমান বস্ত্র-কষ্টের—যাহার জন্য দু'চার জনকে আত্মহত্যাও করিতে হইয়াছে, অপনয়নার্থ সমবেত চেষ্টা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে বস্ত্র-সঙ্কট নিবারণকল্পে যিনি বস্ত্র বা অর্থ দান করিয়া সাহায্য করিতে চান, তাহা নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। সেক্রেটারী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ১নং মুখার্জ্জি লেন বাগবাজার, কলিকাতা; অথবা প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ আঃ, হাওড়া।

(স্বাক্ষর) স্বামী সারদানন্দ ।
সেক্রেটারী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।
১৬ই ভাদ্র, ১৩২৫
কলিকাতা।

———

ধর্ম্ম জিনিষটা কি?

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর এই 'মুক্তির'—এই স্বাধীনতার স্পন্দন হইতেছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরতম প্রদেশে যদি একত্র না থাকিত, তবে আমরা বহুত্বর ধারণাই করিতে পারিতাম না উপনিষদে ঈশ্বর ধারণা এইরূপ। সময়ে সময়ে এই ধারণা আরও উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে—উহা আমাদের সমক্ষে এমন এক আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, যাহাতে আমাদিগকে প্রথমতঃ একেবারে স্তম্ভিত হইতে হয়—সেই আদর্শ এই যে, স্বরূপতঃ আমরা ভগবানের সহিত অভিন্ন। তিনি প্রজাপতির পক্ষের বিচিত্রবর্ণ তিনিই ফুটন্ত গোলাপকলিরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। যিনি আমাদিগকে জীবন দিয়াছেন, তিনিই আমাদের অভ্যন্তরে শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার তেজ হইতেই জীবনের আবির্ভাব আবার কঠোরতম মৃত্যুও তাঁহারই শক্তি। তাঁহার ছায়াই মৃত্যু, আবার তাঁহার ছায়াই অমৃতত্ব। আরও এক উচ্চতর ধারণার কথা বলি। আমরা সকলেই ভয়ানক যাহা কিছু তাহা হইতেই ব্যাধানুসৃত শশকবৎ পলায়ন করিতেছি, তাহাদেরই মত নিজেদের মাথা লুকাইয়া আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিতেছি। সমগ্র জগতই এইরূপ ভয়াবহ যাহা কিছু, তাহা হইতেই পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এক সময়ে আমি কাশীতে এক জায়গা দিয়া যাইতেছিলাম, উহার এক পাশে একটা মস্ত জলাশয় ও অপর পার্শ্বে একটা উচ্চ দেয়াল। ঐ স্থানে অনেকগুলি বানর থাকিত কাশীর বানরগুলা বড় দুষ্ট। এখন ঐ বানরগুলার মাথায় খেয়াল

উঠিল যে, তাহারা আমাকে তাহাদের সেই রাস্তা দিয়া যাইতে দিবে না। তাহারা ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল এবং আমার নিকট আসিয়া আমার পায়ে জড়াইতে লাগিল। যখন তাহারা অতি নিকটে আসিল, তখন আমি দৌড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু আমি যত দ্রুত দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম ততই তাহারা আরও দ্রুত আসিয়া আমাকে কামড়াইতে লাগিল। শেষে সেই বানর-দিগের হাত এড়ান অসম্ভব বোধ হইল—এমন সময় হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিল—'বানরগুলার সম্মুখীন হও।' আমি ফিরিয়া যেমন তাহাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলাম, অমনি তাহারা পাছু হটিয়া গেল, শেষে পলাইল। সমগ্র জীবন আমাদিগকে এই শিক্ষা করিতে হইবে—যাহা কিছু ভয়ানক তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে—সাহসপূর্ব্বক উহার সাম্‌নে দাঁড়াইতে হইবে। যেমন বানরগুলার সম্মুখ হইতে না পলাইয়া তাহাদের সম্মুখীন হওয়াতে তাহারা পলাইয়াছিল, তদ্রূপ আমাদের জীবনের যাহা কিছু কষ্টকর ব্যাপার, তাহাদের সম্মুখীন হইলেই তাহারা পলাইয়া যায়। যদি আমাদিগকে মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হয়, তবে প্রকৃতিকে জয় করিয়াই আমরা উহা লাভ করিব, প্রকৃতি হইতে পলাইয়া নহে। কাপুরুষ কখন জয়লাভ করিতে পারে না। আমাদিগকে ভয়, কষ্ট ও অজ্ঞানের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, এবং আমাদের আশানুযায়ী তাহারা আমাদের সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাইবে।

মৃত্যুটা কি? ভয় কিসের? ঐ সমুদায়ের ভিতর কি ভগবানের প্রেমানন দেখিতেছেন না! দুঃখ, ভয়, কষ্ট হইতে দূরে পলায়ন করুন—দেখিবেন, সেগুলি আপনার অনুসরণ করিতেছে। তাহাদের সম্মুখীন হউন, তাহারা পলাইবে। সমগ্র জগৎ সুখ ও আরামের উপাসক; খুব অল্প লোকেই যাহা কষ্টকর তাহার উপাসনা করিতে সাহস করে। যে মুক্তি চায় তাহাকে এই উভয়ই অতিক্রম করিতে হইবে। মানব এই দুঃখরূপ দ্বারের মধ্য দিয়া

না যাইলে মুক্ত হইতে পারে না। আমাদের সকলকেই এইগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে। আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের দেহ এই প্রকৃতি তাঁহার ও আমাদের মধ্যে উঠিয়া আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়াছে। আমাদিগকে কঠোর বজ্র-মধ্যে, লজ্জামলিনতা, দুঃখদুর্ব্বিপাক, পাপতাপের ভিতর তাঁহাকে উপাসনা করিতে, তাঁহাকে ভাল বাসিতে শিখিতে হইবে। সমগ্র জগৎ ধর্ম্মময় ঈশ্বরকে চিরকাল প্রচার করিয়া আসিতেছে। আমি এমন ঈশ্বর প্রচার করিতে চাই, যিনি একাধারে ধর্ম্মময় ও অধর্ম্মময় উভয়ই বটেন। যদি সাহস হয়, তবে এই ঈশ্বরকে গ্রহণ করুন—ইহাই মুক্তির একমাত্র উপায়—তাহা হইলেই আপনি সেই একত্ব-রূপ চরম সত্যে উপনীত হইতে পারিবেন। তবেই একজন অপর হইতে বড়—এই ধারণা নষ্ট হইবে। যতই আমরা এই মুক্তিতত্ত্বের সন্নিহিত হই, ততই আমরা ঈশ্বরের আশ্রয়ে আসিয়া থাকি, ততই আমাদের দুঃখকষ্ট চলিয়া যায়। তখন আমরা আর নরকের দ্বার হইতে স্বর্গদ্বারকে পৃথকভাবে দেখিব না, তখন আমরা আর মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি করিয়া বলিব না যে, 'আমি জগতের কোন প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ।' যতদিন না আমাদের এমন অবস্থা হয় যে, আমরা—জগতে সেই প্রভুকে ব্যতীত—স্বয়ং সেই প্রভুকে ব্যতীত—আর কাহাকেও দেখি, ততদিন এই সব দুঃখকষ্ট আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিবে, ততদিন আমরা এই সকল ভেদ দেখিব। কারণ, আমরা সেই ভগবানে—সেই আত্মাতেই সকলে অভিন্ন, আর যতদিন না আমরা ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতেছি, ততদিন আমরা সমগ্র জগতের একত্বানুভব করিতে পারিব না।

একই বৃক্ষে দুইটী সুন্দরপক্ষযুক্ত নিত্যসখাস্বরূপ পক্ষী রহিয়াছে—তাহাদের মধ্যে একটী বৃক্ষের অগ্রভাগে, অপরটী নিম্নে রহিয়াছে। নীচের সুন্দর পক্ষীটী বৃক্ষের স্বাদুকটু ফল ভক্ষণ করিতেছে—একবার একটী স্বাদু পর মুহূর্ত্তে আবার কটুফল ভক্ষণ করিতেছে। যে মুহূর্ত্তে সে কটু ফল খাইল, তাহার কষ্ট হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে আর একটী

ফল খাইল—কিন্তু তাহাও যখন কটু লাগিল, তখন সে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল—চাহিয়া সেই অপর পক্ষীটীকে দেখিতে পাইল যে, সে স্বাদু কটু কোন ফলই খাইতেছে না, নিজমহিমায় মগ্ন হইয়া স্থির ধীর ভাবে বসিয়া আছে। কিন্তু সে তাহাকে দেখিয়াও আবার ভুলিয়া গেল, আবার স্বাদুকটু ফল খাইতে লাগিল—অবশেষে এমন একটী ফল খাইল যাহা অতিশয় কটু, তখন সে ফলভক্ষণে বিরত হইয়া আবাব সেই উপরিস্থিত মহিমময় পক্ষীটির দিকে চাহিয়া দেখিল। সে অবশেষে ঐ উপরিস্থ পক্ষীটীর কাছে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইল—যখন সে তাহার খুব সন্নিহিত হইল, তখন সেই উপরিস্থ পক্ষীর অঙ্গজ্যোতিঃ আসিয়া তাহার অঙ্গে লাগিল ও ক্রমে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল—তখন সে দেখিল, সে সেই উপরিস্থ পক্ষীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সে তখন শান্ত, মহিমময় ও মুক্ত হইল—দেখিল—দুটী পক্ষী বৃক্ষে কোন কালেই ছিল না—এক পক্ষীই বরাবর রহিয়াছিল। নিম্নস্থ পক্ষী উপরিস্থ পক্ষীটীর ছায়ামাত্র। এইরূপ আমরা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন; কিন্তু যেমন এক সূর্য্য লক্ষ লক্ষ শিশির-বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূর্য্যরূপে প্রতীত হয়; তদ্রূপ ঈশ্বরও বহু জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হন। যদি আমরা আমাদের প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অভিন্ন হইতে চাই, তবে প্রতিবিম্ব দূর হওয়া আবশ্যক। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ কখনও আমাদের তৃপ্তির সীমা হইতে পারে না। সেই জন্যই কৃপণ অর্থের উপর অর্থসঞ্চয় করিতে থাকে, সেই জন্যই চোরে চুরি করে, পাপী পাপাচরণ করে; সেই জন্যই আপনারা দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন। এই সমুদয় গুলিরই একই উদ্দেশ্য। এই মুক্তিলাভ করা ছাড়া আমাদের জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই পূর্ণতালাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি আর প্রত্যেক ব্যক্তিই উহা একদিন না একদিন লাভ করিবেই করিবে।

যে ব্যক্তি পাপতাপে মগ্ন যে ব্যক্তি নরকের পথ বাছিয়া লইয়াছে,

সেও এই পূর্ণতালাভ করিবে, তবে তাহার কিছু বিলম্ব হইবে। আমরা তাহাকে উহা হইতে উদ্ধার করিতে পারি না। যখন ঐ পথে চলিতে চলিতে সে কতকগুলি শক্ত ঘা খাইবে, তাহাই তাহাকে ভগবানের দিকে ফিরাইবে। পরিশেষে সে ধর্ম্ম, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতা, আধ্যাত্মিকতার পথ খুঁজিয়া পাইবে। আর ধর্ম্মের অর্থ এই যে, সকলে যাহা অজ্ঞাতসারে করিতেছে, আমরা তাহা জ্ঞাতসারে করিবার চেষ্টা করিতেছি। সেণ্টপল্ এই ভাবটী একস্থলে বেশ সুষ্ঠভাবে বলিয়াছেন—"তোমরা যে ঈশ্বরকে অজ্ঞাতসারে উপাসনা করিতেছ, তাঁহাকেই আমি তোমাদের নিকট ঘোষণা করিতেছি।" সমগ্র জগতকে এই শিক্ষা শিখিতে হইবে। এই সব দর্শনশাস্ত্র ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সব মতবাদ লইয়া কি হইবে, যদি উহারা জীবনের এই একমাত্র লক্ষ্যে পৌঁছিতে সাহায্য না করিতে পারে ? আসুন, আমরা বিভিন্ন বস্তুতে ভেদজ্ঞান দূর করিয়া সর্ব্বত্র অভেদদর্শন করি—মানুষ নিজেকে সকল বস্তুতে দেখিতে শিখুক। আমরা যেন আর ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সঙ্কীর্ণ ধারণাবিশিষ্ট ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায়সমূহের উপাসক না থাকিয়া তাঁহাকে জগতের সকলের ভিতর দর্শন করিতে আরম্ভ করি। আপনারা যদি ব্রহ্মজ্ঞ হন; তবে আপনার হৃদয়ে যে দেবতার দর্শন করিতেছেন, সর্ব্বত্রই তাহাকে দেখিবেন।

প্রথমতঃ, সব সঙ্কীর্ণ ধারণাগুলি ত্যাগ করুন, প্রত্যেক ব্যক্তিতে ঈশ্বর দর্শন করুন্—দেখুন, তিনি সকল হাত দিয়া কায করিতেছেন, সকল পা দিয়া চলিতেছেন, সকল মুখ দিয়া খাইতেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিতে তিনি বাস করিতেছেন, সকল মন দিয়া তিনি মনন করিতেছেন, তিনি স্বতঃপ্রমাণ—আমাদের নিজেদের অপেক্ষা তিনি আমাদের নিকটবর্ত্তী। ইহা জানাই ধর্ম্ম—ইহাই বিশ্বাস, প্রভু আমাদিগকে এই বিশ্বাস প্রদান করুন। আমরা যখন সমগ্র জগতের এই অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিব, তখন আমরা অমর হইয়া যাইব। ভৌতিক দৃষ্টিতে দেখিলেও আমরা অমর, সমগ্র জগতের সহিত এক। যত দিন এ জগতে এক জনও শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, আমি

তাহার মধ্যে জীবিত রহিয়াছি। আমি এই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র ব্যষ্টি জীব নহি, আমি সমষ্টিস্বরূপ। অতীতকালে যত প্রাণী হইয়াছিল, আমি তাহাদের সকলের জীবনস্বরূপ; আমিই বুদ্ধ, যীশু ও মহম্মদের আত্মাস্বরূপ। আমি সকল আচার্য্যগণের আত্মাস্বরূপ, আমিই চৌর্য্যবৃত্তিকারী সকল চোরস্বরূপ এবং যত হত্যাকারী ফাঁসি গিযাছে, তাহাদেরও স্বরূপ—আমি সর্ব্বময়। অতএব উঠুন—ইহাই পরা-পূজা—আপনি সমগ্র জগতের সহিত অভিন্ন। ইহাই যথার্থ বিনয়—হামাগুড়ি দিয়া হাতজোড় করিয়া কেবল আমি পাপী, আমি পাপী বলার নাম বিনয় নহে। যখন এই ভেদের আবরণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখনই সর্ব্বোচ্চ উন্নতি হইল বুঝিতে হইবে। সমগ্র জগতের অংশুত্ব—ইহাই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মমত। আমি অমুক—ব্যক্তি-বিশেষ—এত অতি সঙ্কীর্ণভাব—যথার্থ পাকা 'আমি'র পক্ষে ইহা সত্য নহে। আমি সমষ্টিস্বরূপ—এই ধারণার উপর দণ্ডায়মান হউন—সেই পুরুষোত্তমকে উচ্চতম অনুষ্ঠানপ্রণালী সহায়ে উপাসনা করুন; কারণ, ঈশ্বর জড় বস্তু নহেন, তিনি আত্মা ও চৈতন্য পদার্থ, সুতরাং তাঁহাকে ভাবের সাহায্যে যথার্থভাবে উপাসনা করিতে হইবে। প্রথমে উপাসনার নিম্নতর প্রণালী অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিতে করিতে মানবে জড় বিষয়ের চিন্তা হইতে উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া আধ্যাত্মিক উপাসনার রাজ্যে উপনীত হয়, তখনই অবশেষে সেই অখণ্ড অনন্ত সমষ্টিস্বরূপ ঈশ্বরের ভাবসহায়ে উপাসনা সম্ভব হয়। যাহা কিছু সান্ত, তাহা জড়। চৈতন্যই কেবল অনন্ত স্বরূপ। ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া অনন্ত—মানব চৈতন্যস্বরূপ—মানবও অনন্ত—আর অনন্তই কেবল অনন্তের উপাসনায় সমর্থ। আমরা সেই অনন্তের উপাসনা করিব—উহাই সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উপাসনা। এই সকল ভাব উপলব্ধি করিতে পারা খুব বড় কথা—কিন্তু বড় কঠিন। আমি মতমতান্তরের কথা বলিতেছি—দার্শনিক বিচার করিতেছি, কত বকিতেছি—এমন সময় কোন কিছু আমার প্রতিকূলে ঘটিল—আমি অজ্ঞাতসারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। তখন ভুলিয়া

গেলাম যে—এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এই ক্ষুদ্র সসীম আমি ছাড়া আর কিছু আছে। আমি তখন বলিতে ভুলিয়া গেলাম যে, 'আমি চৈতন্য স্বরূপ—এ অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারে আমার কি হইবে—আমি যে চৈতন্ত স্বরূপ।' আমি তখন ভুলিয়া যাই যে, এ সবই আমারই লীলা—আমি ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই, আমি মুক্তির কথা ভুলিয়া যাই।

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যযা দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।'

পণ্ডিতেরা বার বার বলিয়াছেন,—

এই মুক্তির পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ—দীর্ঘ ও কঠিন—ইহা অতিক্রম করা কঠিন। কিন্তু হউক কঠিন—শত শত দুর্ব্বলতা আসুক, শত শত বার উদ্যম বিফল হউক, কিন্তু তাহাতে আপনাকে যেন সেই মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে নিরুৎসাহ না করে। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" উঠ—জাগো, যত দিন না সেই লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ, ততদিন নিশ্চেষ্ট থাকিও না। যদিও ঐ পথ ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম—যদিও উহা দীর্ঘ, দূরবর্ত্তী ও কঠিন, কিন্তু আমরা ঐ পথ অতিক্রম করিবই করিব। মানুষ সাধনাবলে একদিন দেবাসুর উভয়েরই প্রভু হইতে পারে। আমাদের দুঃখের জন্য আমরা ব্যতীত আর কেহই দায়ী নহি। আপনারা কি মনে করেন, মানুষ যদি অমৃতের জন্য চেষ্টা করে, সে তৎ পরিবর্ত্তে বিষ লাভ করিবে? প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

আমরা এ বাণী, জগতের সকল শাস্ত্রই তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে শুনিতে পাই। সেই বাণীই আমাদিগকে বলিতেছে,—

"স্বর্গে যেমন, মর্ত্ত্যেও তদ্রূপ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক; কারণ, সমুদয়ই তোমার রাজত্ব, সবই তোমার শক্তি, তোমারই মহিমা।" কঠিন—বড় কঠিন কথা। এই বলিলাম—"হে প্রভু, আমি এখনই তোমার শরণ লইলাম—প্রেমময় তোমার চরণে সমুদয় সমর্পণ করিলাম—তোমার বেদীতে যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু পুণ্য—সবই স্থাপন

করিলাম। আমার পাপ তাপ, আমার ভাল মন্দ কার্য্য সবই তোমার চরণে সমর্পণ করিতেছি—তুমি সব গ্রহণ কর—আমি আর তোমাকে কখন ভুলিব না।" এই বলিলাম—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক," পর মুহূর্ত্তেই একটা পরীক্ষায় পড়িলাম—তখন আমার সে জ্ঞান লোপ হইল, আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়িলাম। সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক, কিন্তু বিভিন্ন আচার্য্যগণ বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সকলেরই চেষ্টা এই মিথ্য 'আমি' কে—কাঁচা 'আমি' কে মারিয়া ফেলা—তাহা হইলে সত্য 'আমি'—পাকা 'আমি' স্বরূপ সেই প্রভুই একমাত্র বিরাজ করিতে থাকিবেন। হিব্রু শাস্ত্র বলেন,—"তোমাদের প্রভু আমি ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর-তোমরা অন্য কোন ঈশ্বরের উপাসনা করিলে চলিবে না।" আমাদের হৃদয়ে এক মাত্র ঈশ্বরই যেন রাজত্ব করেন। আমাদের বলিতে হইবে—"নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।" তখন কেবল সেই প্রভুকে ব্যতীত আমাদিগকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে; তিনি কেবল তিনিই রাজত্ব করিবেন। হয় ত আমরা খুব কঠোর সাধনা করিলাম—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আমাদের পা পিছ্লাইয়া গেল—আর তখন আমরা মায়ের নিকট হাত বাড়াইতে চেষ্টা করিলাম—বুঝিলাম, নিজ চেষ্টায় অকম্পিতপদে দাঁড়াইবার যো নাই। আমাদের জীবনটা যেন বহু অধ্যায়সমন্বিত গ্রন্থস্বরূপ—তার এক অধ্যায় এই যে—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" কিন্তু যদি ঐ জীবনগ্রন্থের সকল অধ্যায়গুলির মর্ম্মগ্রহণ না করি, তবে সমুদয় জীবনটাকে উপলব্ধি করা হইল না। "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" প্রতি মুহূর্ত্তে বিদ্রোহী মন ঐ ভাবের বিরুদ্ধে উত্থিত হইতেছে, কিন্তু যদি আমাদিগকে ঐ কাঁচা 'আমি' জয় করিতে হয়, তবে বার বার ঐ কথার আবৃত্তি করিতে হইবে। আমরা একজন বিদ্রোহীর সেবা করিব অথচ পরিত্রাণ পাইব—ইহা কখন হইতে পারে না। সকলেরই পরিত্রাণ আছে—কিন্তু বিদ্রোহীর পরিত্রাণ নাই—আর আমাদের অঙ্গে ত বিদ্রোহের ছাপ লাগিয়া রহিয়াছেই—আমরা আমাদের নিজেদের আত্মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, আমরা যখন

আমাদের 'পাকা আমি'র বাণীর অনুসরণ করিতে অসম্মত হই, তখন আমরা সেই জগন্মাতার মহিমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করি। অতএব যাহাই ঘটুক না কেন, আমাদের দেহ মন সেই মহান্ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় মিলাইয়া দিতে হইবে। হিন্দু দার্শনিক ঠিক কথাই বলিয়াছেন যে, যদি মানুষ—'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক' একথা দুবার উচ্চারণ করে, সে পাপাচরণ করে। 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'—আর কি প্রয়োজন? উহা দুবার বলিবার আবশ্যক কি? যাহা ভাল, তাহা ত ভালই। একবার যখন বলিলাম—'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক,' তখন ত ঐ কথা ফিরাইয়া লওয়া চলিবে না। "স্বর্গের ন্যায় মর্ত্ত্যেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, কারণ, তোমারই সমুদয় রাজত্ব, তোমারই সব শক্তি, তোমারই সব মহিমা—চিরদিনের জন্য।"

পত্র।

(স্বামী প্রেমানন্দ)

বেলুড় মঠ

৭।২।১৭

পরম স্নেহভাজনেষু

——,তোমার চিঠি ক'দ্দিন হইল পেয়েছি। স্বামীজির উৎসব বিবরণ শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। ওখানকার আশ্রমটী বদ্ধমূল না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার থাকিবার ইচ্ছা, ইহা অতি সুন্দর সঙ্কল্প। যদি তুমি ইহা করিয়া যাইতে পার তবে তোমার মানব-দেহ-ধারণ সফল।

সর্ব্বদা মনে রাখিয়া চলিও যে, তুমি প্রভুর সন্তান, তাঁর দাস। তোমার মধ্যে যেন হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা স্থান না পায়। সহ্য করাই

যেন তোমাব জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র হয। শ্রীশ্রীঠাকুবের জীবন এই সহ্য গুণের এক অপূর্ব্ব আদর্শ। ঠাকুর তাঁব সহিষ্ণুতার কত কথাই শুনাইযাছেন। শেষে কহিতেন, "শ, ষ, স—যে সয় সে রয় যে না সয় সে নাশ হয। তিনটে শ, ষ, স কেন জানিস?—হে জীব, সহ্য কর, সহ্য কব, সহ্য কর. আর না সইলে নাশ নিশ্চয়।" আমরা ঠাকুরের সংসারে শিখ্‌তে এসেছি। এই,

"বহুরূপে সম্মুখে তোমাব, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম কবে যেই জন. সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

নারাযণ বোধে জীবেব সেবা কত্তে আমাদের জন্ম, এই আমাদেব সাধন. ভজন ত্যাগ, তপস্যা। লোকেব ভাল মন্দ দেখ্‌বাব আমাদের সময কই? উহা আমাদেব ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

সকলেব সুবিধাজনক স্থান একটা চাই। দবিদ্র, দুর্ব্বল, পতিত, মূর্খ—এদেবই আপনাব কত্তে হ'বে। এও বলি. এক দলকে ভাল-বাস্‌তে গিযে অন্য বড লোকদেব ঘৃণা না কবিযা বসি, এদিকেও দৃষ্টি বাখিবে—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময"
——বিবেকানন্দ

সকলের সঙ্গে মিশে গ'যে চল্‌তে হবে বাবা. এই শ্রীশ্রীপ্রভুর ও বিবেকানন্দ স্বামীব শিক্ষা।

স্থায়ী স্থান দেখে যেতে তোমার ইচ্ছা. ইহাব নাম দৃঢ নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা না থাক্‌লে মানুষ নিজেব ও দেশেব উন্নতি কব্‌তে পারে না। আমাদের দেশ কি বকম হবে জান? "স্বদেশোভুবনত্রয়ম্।" এই একটা দেশ আমাদেব নয, সারা পৃথিবীই আমাদেব জান্‌তে হবে। সমস্ত জীবের জন্য প্রার্থনা কত্তে হবে। 'আমি আমার' অজ্ঞান মোহ, ইহা দূর করা চাই। প্রভু তুমি, তোমাব জগৎ, আমি তোমার এক জন সেবক মাত্র!

কথায় উদার নয় কাজে দেখাতে হবে। আবার ঠাকুরের 'পাতকো কাটার' নিষ্ঠা চাই—এক জাযগায।

তুমি সাধনায় সিদ্ধ হও, ইহা আমার অন্তরের প্রার্থনা জানিবে। আধা করে ছাড়া ভাল নয়। তোমাদের দেখে লোকে অবাক হয়ে থাক্‌বে না? তা না হ'লে ঠাকুরের নাম গ্রহণের বিশেষত্ব কি?

যখন ভয় পাবে তখন ঠাকুরকে প্রাণ ভ'রে ডাক্‌বে, তিনিই দয়া করে শক্তি, ভক্তি, সাহস ও বল দিবেন।

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর ঢাকা যাবার এখন সম্ভাবনা নাই। তিনি আছেন মান্দ্রাজে। আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানিবে।

ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমানন্দ

স্মৃতি।

ভৈরবী—একতালা।

আজি　কেন কার তরে　ভাসে আঁখি নীরে,
বাজে হৃদয়ে করুণ বেদনা।
বুঝি,　হারায়েছি তাঁয়, স্মৃতিটুকু হায়!
রয়েছে দিতে সান্ত্বনা॥
কিবা,　দিব্যমধুর প্রেমকান্তি, দরশে জাগিত বিমল শান্তি
মোহিত মন, ভুলিয়া আপন,
যাচিত চরণে করুণা।
করুণার খনি,　সে যে গুণমণি
সমদরশন সবে,

---

* পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দজীর মহাসমাধির পুণ্যস্মৃতি উদ্দীপনার্থে ঢাকা রামকৃষ্ণমঠে ভক্তসম্মিলনে গীত।

হেন মনের মতন আপনার জন,
কে দেখেছে কোথা কবে ?
সদা মাতোয়ারা, "প্রভু"র নামেতে,
ঢল ঢল অঙ্গ প্রেমভরেতে,
পূরব বঙ্গে হেরি' কৃপাঙ্গে
ক'রে নিল সবে আপনা ॥
আজি, আসি নাই শুধু কাঁদিতে কাঁদাতে
জানা'তে বাসিত ভালো,
হবে, নূতন ছাঁচেতে ঢালিতে জীবন,
হৃদে জ্বালিতে প্রেমের আলো ॥
শুন "রামকৃষ্ণ" নামে তাঁহারি আহ্বান
"জাগো বীর্য্যবান্, হও আগুয়ান্"
তাঁরে বাসো যদি ভালো, অনুরাগে চলো,
কেন আছ ব'সে আন্‌মন। '

সৎকথা।

(স্বামী অদ্ভুতানন্দ)

শাস্ত্রে ত বড় বড় কথা আছে, তাতে হবে কি ? জীবনে প্রতিপন্ন করা চাই—ইহাই সাধনা।

সৎসঙ্গের এমনি মাহাত্ম্য যে কীটও নারায়ণের মাথায় উঠে, কারণ সে ফুলের সঙ্গে থাকে। তাই ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন, সৎসঙ্গ কর, সৎসঙ্গে ভগবানের দয়া হয়।

আপন আত্মার কল্যাণ কর ! সৎসঙ্গ, বিগ্রহ দর্শন এ সব কি বৃথা যায় ?

রোগীর সেবা করা, দুস্থকে খেতে পর্‌তে দেওয়া—এই সব হলো ধর্ম্ম। এর চেয়ে আর কি ধর্ম্ম আছে ?

ঠিক ঠিক ডাক্‌লে ভগবান প্রকাশ হন। লোক দেখান যেন না হয়।

গুরুবাক্যই হলো প্রধান, গুরুবাক্য সাধন কর্‌তে কর্‌তে বস্তুর প্রকাশ।

গীতা হলো ভগবানের বাক্য, গীতা পাঠ করা উচিত—

সৎবুদ্ধি চাই, সৎবুদ্ধি হ'লে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নিশ্চয়ই হবে।

যে নিঃসংশয় হয়েছে, সে কত বড় ভাগ্যবান।

ত্যাগী পুরুষের উপদেশ পেয়েও সংযমী না হলে কিছুই বুঝবার সাধ্য নাই।

ভগবানকে ঠিক ঠিক ডাক্‌লে নিঃস্বার্থ ভাব আস্‌বেই।

সাঁচ্চা কাজ কর্‌লে সে কাজ চল্‌বেই চল্‌বে, জুয়াচুরি কোন কালেই চল্‌বে না।

কর্ম্মেতেই জীব হয়, কর্ম্মেতেই দেবতা হয়।

গুরু এবং ইষ্টের প্রতি খুব নিষ্ঠা রাখা চাই। তা না হ'লে নিজেও ভগবানের নাম কর্‌বে না, অপরকেও কর্‌তে দেবে না,—একে বলে জীব ভাব, এভাব তাড়িয়ে দেওয়া ভাল।

সরলতা হ'লে ভগবানের দয়া বুঝ্‌তে পারা যায়। যার সরলতা নেই সেই হায় হায় কর্‌বে। যা জুটলো তাতেই সন্তুষ্ট থাক, যার সরলতা নেই, সেই দুঃখ পাবে ও অপরকে দুঃখ দেবে। ভগবান সরল লোককে ভালবাসেন।

যার প্যাঁচোয়া বুদ্ধি সে একটী কথার উপর বিশটী মানে করে।

জপ ধ্যান করে কি হয়?—সরলতা।

কর্ম্মেতে—রাজা হয়,--কর্ম্মেতে প্রজা হয়।

যে সাধু হবে সে কখন পরনিন্দা পরচর্চ্চা কর্‌বে না।

জগতে কি কেহ ছোট হ'তে চায়?

কার দ্বারা ভগবান কি কর্ম্ম করান তার কি কিছু ঠিক আছে?

ভগবানকে প্রাণ ভরে ডাক্‌লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। বাজে গল্প না করে ভগবৎ চর্চ্চা ও শাস্ত্রালোচনা কর, নিজেরই কল্যাণ হবে।

ভিক্ষা করে কত লোক খাচ্চে সকলেরই কি উন্নতি হয়? সংসারী-দের মধ্যেও অনেক মহৎ লোক আছেন।

কোন বিষয় জোর করে ত্যাগ হয় না।

উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে ডাকা, কিন্তু মান সম্ভ্রম পেয়ে আমরা তাঁকে ভুলে যাই, এই তাঁর মায়া

এ সংসারে কাকেও বিরক্ত করা মহাপাপ।

হিংসা যদি হয়, তবে ভগবানের উপরই হওয়া ভাল।—অমুককে দয়া করিলেন, আমায় কেন করিলেন না—এটা ভাল।

ভগবান যতটুকু শক্তি দিয়াছেন ততটুকু সৎ কাজ কর—কাহারও যেন অনিষ্ট না হয়।

যত দিন বাঁচিতে হইবে, তত দিন কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্ম না করিয়া উপায় নাই। সাধুরা ভগবানের কর্ম্ম করেন, গৃহস্থেরা সংসারের কর্ম্ম করেন, তবে যদি ভগবানে মন থাকে, তা হলেই বাঁচোয়া।

গুরুর কাছে, ভগবানের কাছে, কাম ক্রোধ দমনের জন্য খুব প্রার্থনা করিতে হয়। গুরুকে ভগবান মনে হ'লেই কাজ হইল।

নিজেকে বড় বলিয়া মনে হইলেই যত গোল। যার ছোট বলিয়া মনে ধারণা, তাহার আর কিসের গোল?

পণ্ডিত আর কাহাকে বলে? যে লেখা পড়া শিখে ভগবানের স্তব স্তুতি করে, প্রার্থনা জানায়, দুঃখ জানায়, সেই পণ্ডিত।

ভাগ্যবান কে? যে ভক্ত, যে ভগবানকে বুঝতে পারে।

খালি মন্ত্র নিলে কি হবে? মন্ত্র নিয়ে গুরুর উপদেশমত কাজ করিতে হয়, তবে তো গুরুর মহিমা বুঝা যায়।

এমন কর্ম্ম করিতে হয়, যাহাতে ভগবান খুসী হন।

ঈশ্বরের দাস ভিন্ন আবার কাহার দাস হব? ঈশ্বরের দাস হইলে হিংসা চলে যায়, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব হয়।

জীবের সঙ্গ করিয়া কি হইবে?—দুর্দ্দশা হইবে। নিজেও সাধন ভজন করে না, অন্যকেও করিতে দেয় না।

পরকে কেন মানি? নিজের দুঃখ যায় না বলিয়া, নিজের উপর বিশ্বাস নাই বলিয়া।

দু' রকম বৃত্তি—সাধু বৃত্তি আর ভগবৎ বৃত্তি।

যত দিন ভগবান সাক্ষাৎকার না হন, তত দিন ঠকানো বুদ্ধি যায় না।

ভগবানকে ডাকিলে শক্তি আসিবেই আসিবে।

যে ছোট খাটো একটি সংসারের হিসাব রাখিতে পারে না, সে ভগবানের বিরাট সংসারের হিসাব রাখিবে কি করিয়া?

ভগবান যাঁহাকে বড় করিয়াছেন, তিনিই বড়। লোকের বড় ছোট বলায় কি আসে যায়?

যিনি সৎ—তিনি গুরু। ইষ্টের উপর বিশ্বাস ভক্তি বাড়িয়ে দেন।

শাস্ত্রে মন্ত্র তো অনেক লেখা আছে। তাতে কি হবে? মহা-

পুরুষের নিকট হইতে ঠিক ঠিক উপদেশ গ্রহণ করিলে জীবন মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

মানুষ সবই এক, কেবল কর্ম্মে পৃথক্ করেছে।

ভগবানকে যতটুকু দিবে, ততটুকু পাবে। চারি আনা দেও, চারি আনা পাবে, ষোল আনা দেও, ষোল আনাই পাবে।

ধ্যান জপ কর্‌বার যে ইচ্ছা, সেও তাঁর দয়া বুঝিতে হইবে।

ভগবানই বাপ মা, ভগবানের সন্তানের অন্য কোন বাপ মা নাই।

— —

ঈশার প্রতি মরিয়ম।*

(দয়া)

তাই প্রভু তাই
 জীবনের অতীত দিনের পরে
যতবার
ফিরে ফিরে চাই
শুধু মনে পড়ে সেই সুমধুর প্রফুল্ল বয়ান
 সেই দুটি আঁখি ঢল ঢল
সেই পুণ্য, অনবদ্য, স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, চির দ্যুতিমান
 ভাবে ভোর পাগল বিভোল।
আমি ছিনু প্রমোদে মাতিয়া, অকস্মাৎ
 তোমার বারতা

---

* বাইবেলের New Testamentএ বর্ণিত যীশু খীষ্টের পতিতা নারীর পুনরুদ্ধার ঘটনা অবলম্বনে রচিত; এই নারীরই নাম Mary Magdalene (St)—"the patron saint of penitents."

বিলাসের কলহাস্য হতে, আচম্বিতে
উঠিল দেবতা।
শুধু স্বপনের মত টুটে গেল মোহ
চকিতে জাগিনু আমি চেয়ে
জীর্ণ দল পত্র টুটি ধীরে ধীরে ধীরে
শুভ্র জ্যোতি নেমে এল বেয়ে।
আলোকের পরশনে অসিতের রেখা,
প্রমোদের বিভীষিকা যত
আমারে ঘেরিয়া নিত্য ছিল চিরদিন
শূন্যে মিলি হইল বিরত।
তখনও পাই নাই পরশ তোমার
তখনও বুঝি নাই প্রভু
অভাগীর পাপ তাপ লবে সব হরি
হে দয়াল, বুঝি নাই কভু।
'ফরিসীর' ভোজগৃহমাঝে ছিলে যবে
পতিত-পাবন
লুটাইয়ে পড়িলাম পায়ে দিনু মোর
কুঙ্কুম চন্দন।
বিসর্জ্জিনু অশ্রুবারি পদপ্রান্তে তব
যাচিনু মাগিয়া দুই কর
ওগো সদাশয় প্রভু, দয়া কর আজ
পাপে মোর তনু জর জর।
মুক্ত কেশপাশ দিয়ে সযতনে তব
মুছানু চরণ
হৃদিভোর স্নেহ মোর, দিনু পদে ঢালি
করিয়া বরণ।
তবুও বুঝিনি মনে তুমি কি রতন
হে প্রভু আমার,

শুধু গুণমুগ্ধা নারী —হলো আকর্ষণ,
দিনু উপচার ।
গৃহস্বামী কোপভরে কি ভাবিল মনে
—ঈশা একি ভ্রষ্টাচারী জন !
তাহারে সুধালে বাণী, অমৃত-সিঞ্চিত
মুক্ত হোল অবিশ্বাসী মন—
"দুই ঋণী আছিল একদা, দুই দীন,
উত্তমর্ণ যার
শত মুদ্রা, দ্বিশত অপরে,' দিয়াছিল
পায়নিকো আর ।
তবে সেই ধনী মহাশয়, শান্ত মনে
ডাকিয়া তাদের
শুধালেন—'করিলাম ক্ষমা, এঋণের
নাহি আর ফের ।'
সেই মতো জেন হে শ্রীমান, সেই মতো
এরে আমি করেছি যে ক্ষমা
ঋণ যার গুরুতর তার কৃতজ্ঞতা
হয় নাকি .বহীন উপমা ?
কৃতকৃত্য একেবারে তার প্রেম তাই
উপছি উঠেছে আর সব
হে শ্রীমান্, দেখ চেয়ে, দেখ এর প্রীতি
এর পূজা কিবা অভিনব ।"
ওগো প্রভু, এ কি লজ্জা দিলে তুমি আজ !
পাপীর যে বাড়ালে গরিমা
দীনের এ ক্ষুদ্র অর্ঘ্য ঢেলে দিতে পায়
বরষিলে আপন মহিমা ।
করুণায় সেই দিন করে নিলে মোরে
চিরদাসী পাদপ্রান্তে তব

হে আর্ত্ত-উৎসৃষ্ট প্রাণ, হে দেব-মানব,
হে মহান্, ওহে ভব-ধব ।
জ্বালা ঘুচে গেছে আজ, ভোগ বহ্নি ধুম
প্রসুপ্ত ও নির্ব্বাপিত সব
শুধু তব প্রেম আছে বক্ষ মাঝে জাগি
সুগভীর, নিভৃত, নীরব ।
অলক্ষ্যে পথের পাশে যেথা তুমি আছ
দাঁড়াইয়া, ওহে অপ্রকাশ,
ক্রুশভরে অবনত মাথা, দেহযষ্টি
লুটাইয়া, বহে ঘন শ্বাস ।
অচঞ্চল, অপলক আঁখি, তাই শুধু
হেরি একমনে
বিস্ময়ে হয়েছি আমি হত, ভাবি লীলা
এ ক্রুশ-মরণে !
চিহ্ন তার বক্ষমাঝে লয়ে দ্বারে দ্বারে
ঘুরেছি অশেষ
ফিরে এস প্রভু আজ মোর, ফিরে এস
ওগো পরমেশ ।
ক্ষুব্ধ চিত ব্যগ্র আজি হিয়া, পেতে ঠাঁই
পদসন্নিকটে
আলোকের অবতার প্রভু, ফিরে এস
এস হে সঙ্কটে ।
কোন্ নিশিভোরে পুনঃ মিলিবে হে দেখা
শুনিব সে মধুময় বাণী
"ওগো বাছা, আমি আছি নিতে পাপ তাপ
বহিতে যে জগতের গ্লানি ।"
তাই প্রভু তাই,
জীবনের বিগত দিনের পরে

যতবার
ফিরে ফিরে চাই
শুধু মনে পড়ে তব অতুলন অনুপম রূপ।
—অভাগীর অনন্য সম্বল
সেই ভালবাসা প্রীতি, পরাণের অপার করুণা
রক্তমাখা চরণকমল।

ভারতীয় শিক্ষা।

সাহিত্যের প্রসার।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

The debt which the world owes to our motherland is immense. Taking country with country, there is not one race on this earth to which the world owes so much as to the patient-Hindu.

Hence again must start the wave which is going to spiritualise the material civilisation of the world. Here is the life-giving water with which must be quenched the burning fire of materialism, which is burning the core of the hearts of millions, in other lands.

—Vivekananda.

এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের জগৎ ভ্রমণ সম্বন্ধে আর একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিতে চাই। ইদানীং ভারতবাসীর সাগরপারে গমন করিলে জাতি যায় কিন্তু কৌতুক দেখ, এই ভারতীয়

সাহিত্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভিন্ন দেশীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে এবং পক্ষান্তরে বিদেশীয়েরা তাহা আত্মসাৎ করিয়া নিজ প্রচেষ্টায় তাহার উপর মহিমময় জ্ঞানের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আর অধুনা অস্মদ্দেশীয়েরা কেবল সারা জীবন ধরিয়া পূর্ব্বপুরুষদের নামানুকীর্ত্তন ও চর্ব্বিত চর্ব্বন করিয়া ক্ষান্ত আছেন। তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা কেবল কতকগুলি কুসংস্কার কিম্বা কতকগুলি অসম্বদ্ধ আচারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যস্ত। দুই এক জন চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক ধীরে ধীরে দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ মাত্র। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত-সমাজ যদি একবার ভারতের গ্রামে গ্রামে পরিদর্শন করিয়া বেড়ান তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে ভারতের জনসমাজ কি অন্ধকারাচ্ছন্ন। অনেকেই কলিকাতার বৈদ্যুতিক আলোক দেখিয়া মনে করেন যে গ্রাম সকলও বুঝি ঐ প্রকার আলোকিত। বঙ্গ ও বঙ্গেতর প্রদেশে বহু পণ্ডিত আছেন কিন্তু তাঁহারা হিন্দু দর্শন বিজ্ঞানের কেবল ভাষ্য ও তট্টিকা, তট্টিকা তট্টিকার গিলিত চর্ব্বন করিতেছেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের বাস্তব জীবন তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, কাজে কাজেই কণাদের পরমাণুবাদ, কপিলের ক্রমবিকাশ, আর্য্যভট্টের জ্যোতির্ব্বিদ্যা, বাগভট্টের নরশরীর বিজ্ঞান, নাগার্জ্জুনের রাসায়ণ প্রভৃতির আলোচনায় এবং ভিন্নদেশ হইতে তথ্য সঞ্চয় করিয়া তাহার পুষ্টি সাধন এবং পাশ্চাত্যের সহিত জ্ঞানক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে একেবারে অক্ষম—কেবল ত্ব, তা প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয়, অবচ্ছেদকতা প্রভৃতি কল্পিত শব্দের উপর নির্ভর করিয়া ছল ও বিতণ্ডার অবতারণা করিয়া নিজেদের কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন।

যাহা হউক এখন বিদেশীয় নীতিকথার আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে Æsop's Fableএর কথাই উঠে। কিন্তু ইদানীং বহু পণ্ডিত মণ্ডলীর বিশ্বাস যে ঈশপ নামে প্রকৃত কেহ কখনও ছিল না। কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও ইহা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হইয়াছে, যে সকল গল্প ঈশপ রচিত বলিয়া পরিচিত আছে তাহাদের অধি-

কাংশই জাতকের রূপান্তর মাত্র এবং অপর কতকগুলি বিভিন্ন লোকের রচনা। খৃঃ পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীকদেশে কতকগুলি কথা দেখিতে পাওয়া যায়; উহা ডেমিক্রিটাস বর্ণিত কুক্কুর ও প্রতিবিম্বের এবং Plato বর্ণিত সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের কথা। এই দুইটী গল্পই বৌদ্ধ জাতকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ডেমিক্রিটসের কুক্কুর প্রতিবিম্বকে মাংসখণ্ড মনে করিয়াছিল ইহা কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক। জাতকে এবং পরবর্ত্তী যুগের পঞ্চতন্ত্রে বর্ণিত আছে যে শৃগাল তটভূমে মাংসখণ্ড রাখিয়া মৎস্য ধরিতে গিয়াছিল—ইহাই স্বাভাবিক।—Platoর গর্দ্দভ কি করিয়া সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত হইল?—বরং জাতকে গর্দ্দভস্বামী তাহাকে সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত করিয়া অপরের শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিত—ইহাই খুব স্বাভাবিক। আবার সিংহ যেমন ভারতবাসীর নিকট পরিচিত ছিল, গ্রীকদিগের নিকট তেমন ছিল না। আর এ সকল গল্পের উৎপত্তি, সাধারণ জনসমাজে, সাধারণ ভাষায় এবং সচরাচর যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহা হইতেই হয়। ইহা হইতেই বেশ প্রতীয়মান হয় যে এ সকল কথা ভারতবর্ষ হইতে ঐ সকল দেশে গমন করিয়াছিল। তাহা ছাড়া হেরোডোটাস ও একটি আখ্যায়িকাকে পারস্য হইতে সংগ্রহীত বলিয়া স্বীকারই করিয়াছেন। Solomonএর বিচার সম্বন্ধেও যক্ষিনী জাতকের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র লইয়া মাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা, বালকটীকে দুই ভাগ করা অপেক্ষা বলপূর্ব্বক যে গ্রহণ করিতে পারে তাহারই প্রাপ্য ইহাই স্বাভাবিক।

কথা দুইটি যে জাতক হইতেই গ্রীসে গমন করিয়াছে, এমন নহে। জাতকের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে এ সকল কথা প্রচলিত ছিল—তাহার প্রমাণ মহাভারতাদি বহু প্রাচীন গ্রন্থ। জাতকে সেইগুলি একত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল মাত্র। আর জাতকের গল্পমালা এক সময়ে বা এক পুরুষের দ্বারা সংগৃহীত বা কথিত হয় নাই ইহা ধীরে ধীরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস যে Pythogorus, Socratis, Plato প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকদের ভিতর

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র যেরূপে প্রবেশ লাভ করে ইহারাও সেই ভাবে বৌদ্ধ পূর্ব্ব যুগে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র নামক গ্রন্থখানি খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যরাজ খসরু নসীরবানের রাজত্বকালে পাহ্লবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। পরে উহা খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে সিরিয়ক এবং আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। সিরিয়ক 'কলিলগ ও দমনগ' এবং আরবী 'কলিলা ও দিমনা' ইহা পঞ্চতন্ত্রের 'করটক ও দমনক' নামক শৃগালদ্বয়ের নামের অপভ্রংশ মাত্র। আরবীরা 'কলিলা ও দিমনার' রচয়িতাকে 'বিদপাই' বলিতেন। উহা সংস্কৃত 'বিদ্যাপতি'। এই 'বিদপাই' শেষে 'পিল-পাই' বা 'পিল্প' হইয়া ইউরোপে পঞ্চতন্ত্র 'পিল্পের গল্প' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। কথাসরিৎসাগর নামক অপর একখানি গ্রন্থও ঐরূপ ভাবে পাশ্চাত্য জগতে বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আরব্য উপন্যাস ঠিক ঐ পুস্তকের ধাঁজে লিখা। অধিক কি, আরব্য উপ-ন্যাসের শাহরিয়ার ও শাহজেমানের কথাই সংস্কৃত কথাসরিৎসাগর হইতে গৃহীত। উহা শেষোক্ত গ্রন্থের দুই যুবা ব্রাহ্মণ ও এক যক্ষের উপাখ্যান ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহা ছাড়া সিন্দিয়াবাদ, রাজা, রাজপুত্র, যুবতী ও সপ্তমন্ত্রী এ বিষয় স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে।*

শুধু তাহাই নহে শ্যাম ও ব্রহ্ম দেশীয় ভাষায় রামচরিত্র, সীতা-হরণ, রাবণ যুদ্ধ, অনিরুদ্ধ উপাখ্যান, ভগবতী মাহাত্ম্য কথন, বালী-বৃত্তান্ত, কামধেনু, নাগকন্যা, যক্ষ রাক্ষসাদির বর্ণনা দেখিয়া ঐ সকল দেশে সংস্কৃত শাস্ত্রেরই আধিপত্য নির্দ্দেশ করে। আর ললিত-বিস্তরাদি বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক গ্রন্থ সকল মধ্যআসিয়ায় এবং মহাচীনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা ত সকলেই জানেন।

"ভারতবর্ষীয় গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক বহুতর পুস্তক আরব ও পারসীক দেশের ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সেই সেই দেশে

---

* Jatak Tales Collected by Fousbal as Translated by T W. Rhys David vol 1. Introduction.

British & Foreign Review, No xxi. p 266.

প্রচারিত হয়। উমুন্ অল্ অম্বা ফি তল্ কাতুল্ আত্বা নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা আরবের অন্তর্গত বোগ্দাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও বৈদ্যক শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন। ইহার মধ্যে কাহারও নাম মঙ্কঃ, কাহারও নাম কঙ্কঃ কাহারও নাম বা বাথর বলিয়া লিখিত আছে। মঙ্কঃ মাণিক্য এবং বাথর ভাস্কর (অর্থাৎ ভাস্করাচার্য্য) বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। আরব রাজ্যেশ্বর হারুন্ অল্ রসীদের উৎকট পীড়া হয়। কোনওরূপেই তাহার প্রতীকার না হওয়াতে, তিনি ভারতবর্ষ হইতে ঐ মঙ্কঃকে চিকিৎসার্থ লইয়া যান ও তদীয় চিকিৎসাগুণে সে রোগ হইতে মুক্ত হন। তদ্ভিন্ন ঐ আরবী পুস্তকে দাহর, জবহব, রাহঃ, অঙ্কর, অন্দি, সকঃ, জঙ্গল্, জারি, জওদব্, সানাক্, সনজহল্ এই সমস্ত জ্যোতিষজ্ঞ ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহাদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আরবী ও পারসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। পূর্ব্বোক্ত আরবী গ্রন্থে ঐ নামগুলি বিকৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। উহাতে আরবদেশে নীত সিবক্ত, মসর্দ্দ ও যেদান্ নামে তিনখানি ভারতবর্ষীয় বৈদ্যক গ্রন্থের বৃত্তান্ত আছে; তাহা সংস্কৃত চরক, সুশ্রুত ও নিদান বই আর কিছুই নহে। ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বা কিছু পরে অলমনসুব নামক আরবী নরপতির অনুমতি ক্রমে আরবী ভাষায় একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র অনুবাদিত হয়; উহার আরবী নাম সিন্দ্ হিন্দ্। কোলব্রুক উহাকে সুসংস্কৃত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। যাকুব নামে একটি গ্রন্থকার ঐ সিন্দ্ হিন্দ্ পুস্তক অবলম্বন করিয়া একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। তাহাতে তিনি বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ বারম্বার উদ্ধৃত করিয়াছেন।* অল্-মামূম্ নামক বাদসাহের সময় একখানি সংস্কৃত বীজগণিত আরবীতে অনুবাদিত হয়। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই নয় অঙ্ক মূর্ত্তি এবং একং দশং শতং সহস্রং ইত্যাদি দশগুণোত্তর সংখ্যা গণনায় যেরূপ

* Asiatic Researches, vol xi. pp 161—164.

প্রণালী সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাই তাহা উদ্ভাবন করেন। আরবী ও পারসীক পাটীগণিত প্রণেতারা সকলেই এক বাক্যে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।†। আরবীরা হিন্দুদের নিকট উহা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রকাশ করিয়া দেন ও তদ্বিষয়ক গ্রন্থ রচনা ও বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা বোগদাদ নগর হইতে স্পেনের অন্তর্গত কর্‌ডোবা নগর পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া যান। খুলাসৎ-উল্‌-হিসাব্‌ নামক আরবী পুস্তকের ভূমিকায় ও অন্যান্য পারসীক গ্রন্থে তাঁহাদের ঐ অঙ্ক প্রণালী শিক্ষার বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে। সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস একখানি গ্রন্থে অঙ্ক গণনার যেরূপ পদ্ধতি প্রকাশ করেন এবং বিথিয়সের জ্যামিতি শাস্ত্রে তাহা যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা ঐ ভারতবর্ষীয় অঙ্ক প্রণালীর সহিত একরূপ অভিন্ন। একটী ফরাসী গণিতজ্ঞ পণ্ডিত (Chasles) বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, পশ্চিমাঞ্চলের খৃষ্টানেরা আরবীদের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষীয় অঙ্ক প্রণালী অবগত হইয়াছিলেন। ৭৮৬—৮০৯ খৃষ্টাব্দে আরবী নৃপতি হারুণ-অল-রসীদের আদেশ অনুসারে পূর্ব্বোক্ত সুশ্রুত ও চাণক্য কৃত বিষচিকিৎসাবিষয়ক একখানি গ্রন্থ উল্লিখিত মঙ্কঃ কর্ত্তৃক পারসীক ভাষায় অনুবাদিত হয়। চাণক্য কৃত বলিয়া লিখিত পশু-চিকিৎসা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় এবং চরক নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যকশাস্ত্রও আরবী ও পারসীক উভয় ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়া প্রচলিত হয়। ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে সুশ্রুতগুরু কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া উল্লিখিত পশুচিকিৎসা বিষয়ক অপর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত হয়। আলবীরুণী নামক আরবী পণ্ডিত ৯৭০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং হিন্দুদের সাহিত্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিবরণাত্মক অন্য একখানি পুস্তক রচনা করিয়া যান। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে আবু সালেহ্‌

† A. R. vol. xii, pp 183—184.

রাজগণের শিক্ষা বিষয়ক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সমস্ত গণিত ও চিকিৎসা বিদ্যা আরব হইতে পুনরায় মিশর দেশীয় এলেকজেন্দ্রিয়া নগরের বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত হয়, এবং মুসলমানেরা স্পেন্ দেশ অধিকার করিয়া তথায় বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলে, তাহাতে আরবী ভাষায় বিরচিত ভারতবর্ষীয় ঐ সমস্ত জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত হইয়া ইউরোপে প্রচারিত হইয়া যায়। পীজা নগর নিবাসী লিয়োনার্ড নামে একজন পণ্ডিত বার্ব্বারি দেশে গিয়া আরবী ভাষায় বিরচিত বীজগণিত শিক্ষা করেন এবং ১২০২ খৃষ্টাব্দে তাহা লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বদেশে প্রচার করিয়া যান। জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মেন্ পণ্ডিত হুম্বোল্ট্ বলিয়া গিয়াছেন, আরবীদের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় অঙ্ক প্রণালী এবং গ্রীস ও ভারতবর্ষীয় উভয় দেশীয় বীজগণিত প্রচারিত হইয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণিতাংশের বিশেষরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং জ্যোতিষ, দৃষ্টিবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, তেজোবিজ্ঞান ও চুম্বক-বিজ্ঞানের দুরূহতর ভাগ সমুদয় মনুষ্যের বুদ্ধিগম্য করিয়া দিয়াছে। পশ্চিমের ন্যায় পূর্ব্বদিকেও ভারতবর্ষীয় গণিত বিদ্যা প্রচলিত হয়। শ্রীমান রেনো নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ বিদ্যা ৭২০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। মোগল সম্রাট আকবর রামায়ণ, মহাভারত, অমরকোষ এবং অথর্ব্ববেদ পারসীক ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার প্রপৌত্র দারা ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে পারসীক ভাষায় উপনিষদ সকল অনুবাদ করেন এবং পশ্চাৎ আঁকেতীই দুপেরঁ (Anquetil Duperron) কর্ত্তৃক ঐ পারসীক অনুবাদের লাটিন ও ফারসী অনুবাদ সম্পন্ন হয়।"

---

* উপাসক সম্প্রদায়—H. H. Wilson's remarks in the Journal of the Rayal Asiatic Society, vol 6 pp 105—119—Max Muller's Lectures on the Science of Language, first series, 1862, pp 145—153—Colebrooke's disertation on the Arithmetic and Algebra of the Hindus.

শ্রীযুক্ত আমির আলি তাঁহার History of the Saracenes নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন সে আরবেই প্রথম চিকিৎসাবিদ্যার উন্মেষ হয় এবং এখান হইতেই জগতে উহা ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে ঐ মত বিলুপ্ত হইয়া ভারতেই যে সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রকাশ হয় ইহাই স্থিরিকৃত হইয়াছে। ভারতে খৃষ্টের জন্মিবার বহু পূর্ব্বেই যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমধিক পুষ্টিসাধন হইয়াছিল তাহা যাঁহারা শ্রীবুদ্ধদেবের চিকিৎসক জীবকের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। তক্ষশীলা (Taxila) বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করিতেন। পাঠ শেষ হইলে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন করা হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুঃপার্শ্বে যে সকল বৃক্ষৌষধি গুল্ম প্রভৃতি আছে তাহাতে এমন কোনও বৃক্ষাদি আছে কি না যাহা চিকিৎসাশাস্ত্রে অব্যবহার্য্য। জীবক কিছুকাল অন্বেষণ করিয়া এমন একটিও বৃক্ষ বা ঔষধি বা গুল্ম পান নাই যাহা তৎকালীন চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় না। তখন যে শল্যবিদ্যারও অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল তাহাও তিনি মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে অপূর্ব্ব চিকিৎসানৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন তাহা হইতেই বেশ বোধগম্য হয়। তিনি জাতিতেও যে খুব উচ্চবংশ ছিলেন তাহাও নহে। জীবক বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের ঔরসে এবং শালবতী নাম্নী এক বারবিলাসিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন।*

পরে ভারতবর্ষ হইতে যে কেবল দর্শন বিজ্ঞানাদিই অপর দেশে গমন করিয়াছে এমন নহে। তারী খুল হোকুমা নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে আরবীরা ভারতবর্ষ হইতেই সঙ্গীতশাস্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে তাহার প্রচার ও উৎকর্ষ সাধন করেন। উহার নাম 'বিয়াফর্' অর্থাৎ 'বিদ্যাফল' বলিয়া কথিত হইয়াছে। পারসীক গ্রন্থকারেরা আরও স্বীকার করিয়াছেন যে খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ড হইতে শতরঞ্চ খেলাটি পঞ্চতন্ত্রের সহিত পারস্থানে আগমন করে। উহার সংস্কৃত প্রতি শব্দ চতুরঙ্গ। পার-

* জাতক ১ম খণ্ড পরিশিষ্ট—২৮২ পৃঃ—শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

সীকরা উহাকে চত্রঙ্গ বলিতেন এবং আরবীরা তাঁহাদের ভাষায় ঐ শব্দটির আদ্যন্ত অক্ষর না থাকায় উহাকে শত্রঞ্চ বলিয়া উল্লেখ করেন †। আর আজকাল যাহাকে Lantern Lecture বলে তাহার যে মূল প্রথা অর্থাৎ ছবির দ্বারা উপদেশ ও গল্পগুলি শ্রোতা ও দর্শকদিগকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া ইহাও ভারতবর্ষ হইতে আরবের মধ্য দিয়া ইউরোপে গমন করে। বেরুট স্তূপের ছবিগুলিই ইহার প্রমাণ। পূর্ব্বে আরবীরা বিদপাইয়ের গল্পের সহিত ছবিও ব্যবহার করিতেন। ইউরোপীরা যখন ঐগুলি সংগ্রহ করেন তখন গল্পের সহিত ছবিগুলিও নকল করিয়া লইতেন। Rhys David আর একটি ব্যাপার বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "উষ্মস্নান" ভারতবর্ষ হইতেই বোধ হয় তুরস্কবাসীরা গ্রহণ করেন। কারণ ঐ স্নানের বিষয় বিনয় পিটকের ২য় খণ্ডে ১০৫—১১০, ২৯৭ শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণনা আছে ‡। আর ইদানীং যাহাকে Polo খেলা বলে উহাও ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করে। উহা ভারতবর্ষে "চোগান" নামে পরিচিত ছিল। সম্রাট আকবর উহার সমধিক উন্নতি সাধন করেন ¶।

কিন্তু নবযুগে উদীচ্য খণ্ডে ভারতীয় শিক্ষার প্রথম উদ্বোধন হয় আঁকেতীই দুপের্ঁ কর্ত্তৃক উপনিষদ যেদিন হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। এই বীজ নিক্ষেপের পরেই সে ক্ষেত্রে সোপেনহাওয়ার (Schopenhaur), মক্ষমূলর (Max Muller) ডুসন (Deussen) প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈদান্তিকদের উদ্ভব হইল। এবং ধীরে ধীরে বৌদ্ধ দর্শনও ঐ ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়া উহার সমধিক উর্ব্বরতা সাধন করিয়াছে। ভারতও সে দর্শনোদ্যানের উৎকর্ষ সাধন করিবার

† Asiatic Researches London vol 11 pp. 159—165

‡ Buddhist India p 74—Rhys David

¶ Akbar—Colonal Malleson

জন্য তাহার রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দকে পাঠাইলেন। ধীরে ধীরে উদ্যানটী ফলফুল সমন্বিত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু এখনও উহা বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই ; পক্ষান্তরে প্রায় সমগ্র পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিই হয় উহার পল্লব গ্রহণ করিয়া নিজ চিন্তাগৃহের সৌন্দর্য্য সাধন করিতেছেন, কেহ বা গুপ্ত ভাবে সে উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া উহার স্তবক জন সমাজে বিক্রয় করিতেছেন আর কেহবা গোপনে উহার ফল ভোক্ষণ করিয়া মনের ক্ষুধা মিটাইতেছন।

বেদান্ত প্রচার হইতেছে বটে কিন্তু ইহার এক বিষম অন্তরায় আছে, তাহা ঐ শাস্ত্রান্তর্গত ভোগনিরাসবাদ। এতদিন ধরিয়া যে ভোগরাজ্য নির্ম্মাণ ক'রলাম তাহাতে কত ইন্দ্রপুরী, কত বিদ্যুৎ-বাষ্পের সরঞ্জাম, তাহা এক মুহূর্ত্তে পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইবে, এ কথা স্মরণ করিতেও মহাতঙ্কের সঞ্চার হয়। কিন্তু বল দেখি এত দিন ধরিয়া ত ভোগ করিলে, প্রকৃতিকে ত নানারূপে বশীভূত করিয়া নিজের সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছে কিন্তু ভোগ পিপাসা কি এক বিন্দুও মিটিয়াছে। আমরা ত দেখিতেছি ভোগরাজ কালিয় তাহার সহস্র ফণা উত্তোলন করিয়া তোমায় দংশন করিতেছে ; জড় বিজ্ঞানের নিকট যে, সোডম ফল (Apples of Sodom) লাভ করিয়াছ উহা য ওষ্ঠের নিকট আনিলেই ছাই হইয়া যায়। প্রকৃতিকে মন্থন করিয়া যেমন অমৃত লাভ করিয়াছ সঙ্গে সঙ্গে যে ভীষণ গরল উঠিয়াছে তাহা কণ্ঠে ধারণ করিবার অখিল জীব-জ্বালা নিবারণকারী সর্ব্বত্যাগী, মহাযোগী শঙ্কর তোমাদের মধ্যে এমন কে আছেন ? সর্ব্বধ্বংসী হিংসাদ্বেষের গরলে জগৎ যে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল ! Frederation of the World, One Parliament of Man প্রভৃতি কবি বাক্য কেবল কি কথার কথা থাকিবে ? আধুনিক রাজনীতিসহায় কতকগুলি মানব উহা বাস্তব জীবনে পরিণত করিতে গিয়া Anarchism, Nihilism, Socialism প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কতটুকু

উপকার হইয়াছে ? আমাদের বিশ্বাস রাজনীতি সহায়ে Universal Brotherhood জগতে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। উহা যদি কখনও কোনও প্রকারে সম্ভবপর হয় তাহা ধর্ম্মের দ্বারা। কিন্তু সে ধর্ম্ম কিরূপ ?—যে ধর্ম্ম কখনও মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট না করিয়া প্রত্যেক জীবকে তাহার নিজ নিজ আত্মশক্তি বিকাশের অবসর দেয়—যে ধর্ম্ম ভাব ও বিচারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিধিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদানের বিরোধী—যে ধর্ম্ম নিজ প্রেম ও উদারতা বলে বর্ণ ও জাতির কঠোর শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া পৃথিবীবক্ষ হইতে কাফের, যবন, হিদেন প্রভৃতি অতি জঘন্য কলঙ্ক একেবারে মুছিয়া ফেলিতে সমর্থ—সেরূপ ধর্ম্মের প্রয়োজন। হে মানব! চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখ, ভক্তপ্রাণ শ্রীভগবান তোমাকে তাহার অভাবগ্রস্থ দেখিয়া সকল যুগের সকল ধর্ম্ম কঠোরতার মহোর্ম্মি গঙ্গাধরের ন্যায় তপঃরূপ নিজ জটাকলাপে ধারণ করিয়াছেন—পরে ভগীরথের ন্যায়, নামমাত্র স্মরণে হিংসাদ্বেষ ধ্বংসকারী 'যত মত তত পথ' ধর্ম্মরূপ এক নব মন্দাকিনী ধারা শ্রীবিবেকানন্দ জীব সমক্ষে আনয়ন করিয়া ধরাতল পবিত্র করিয়াছেন। হে অমৃতের সন্তান! নিজ স্বরূপ চিন্তা কর, আলস্য জড়তা ত্যাগ করিয়া সে পুণ্য সলিলে অবগাহন করিয়া শ্রান্তি তৃষ্ণা দূর কর।

(সমাপ্ত)

আমাদের সাধনা।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ)

রাত্রির অবসান হইয়াছে। নবোদিত অরুণের সুবর্ণচ্ছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত। একদিকে বিহঙ্গের কলতান, কল্লোলিনীর সুধামাখা সঙ্গীত আর অন্যদিকে জীবন-সংগ্রামে নিয়োজিত বীর-বৃন্দের বিকট হুঙ্কার ও দুর্ব্বলদিগের কাতর আর্ত্তনাদ—উভয়ের মিলনে এক বিরাট ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে, সর্ব্বত্রই জাগরণের চিত্র পরিস্ফুট, শুধু আমাদের দ্বারে অর্গল রুদ্ধ—গবাক্ষ বদ্ধ—গৃহে অমানিশার গাঢ় অন্ধকার—আমরা কোমল শয্যায় দেহসংরক্ষণ করিয়া স্বপ্নভরে প্রলাপ বকিতেছি! গৃহের চতুর্দ্দিকে আলোক, আর আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। হায়! পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আত্মোন্নতি, দেশোন্নতি, সমাজোন্নতির জীবনপাতী চেষ্টা—আর ভারত নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট জড়প্রায়! সমগ্র জগৎ ক্রমোন্নতির দিকে বিদ্যুদ্বেগে অগ্রসর হইতেছে, দেশপুঞ্জ স্ব স্ব শক্তির যথাযথ পরিচালনা দ্বারা মানবের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, যাহারা এই জ্ঞানভাণ্ডারের ক্রমবর্দ্ধনকল্পে সাহায্য করিতে পারে তাহারাই আধুনিক যুগে সভ্য জাতির সভায় আসন পাইতেছে! ভারতবাসী জড়প্রায় তাই সে মানবের এই মহা সাধনায় ব্রতী হইতে পারে নাই—জ্ঞানার্জ্জনের এই বিপুল চেষ্টায় তাহার শক্তি নিয়োজিত করিতে পারে নাই—যুগযুগান্তসঞ্চিত কুসংস্কারের আবরণে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া এক পাশে পড়িয়া আছে। তাই সভ্যজাতির সভায় তাহার আসন নাই, তাই সে জগতের কাছে অতি হেয়, অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য!

সত্যই কি জগতের এই মহাসাধনায় সাহায্য করিবার আমাদের কোন সামর্থ্য নাই? সত্যই কি জ্ঞানভাণ্ডারে দান করিবার উপ-

যোগী কোন বস্তুই আমাদের নাই? নিশ্চয়ই আছে। আমরা দেখিতেছি, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় জ্ঞানের কিয়দংশ প্রদান করিয়া জগতে এক নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছেন, জড়বাদী পাশ্চাত্যজগৎ আজ এই যুগাচার্য্যের সাহায্যে বেদান্তোক্ত বিশ্ব-ব্যাপী চৈতন্যের সত্ত্বা অবধারণ করিতে উদ্যত। ভারতে যাহা আছে তাহা আর কোথাও নাই—ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ—ভারত বহু শতাব্দি ধরিয়া জগৎকে বহু প্রকারে শিখাইতে পারে। ভারতবাসীর তুলনায় জগতের অন্যান্য জাতি তরুণ। ভারত এক সময়ে জ্ঞান ও সভ্যতার উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিল। কালের অলঙ্ঘ্য আবর্ত্তনে যদিও ভারত আজ গভীর গহ্বরে নিপতিত তথাপি তাহার কষ্টসঞ্চিত জ্ঞানরাশি এখনও তাহার অঞ্চলে রক্ষিত। তাই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের সমাজে আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র উদ্ভিদের চৈতন্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আজ যাহা বলিতে আসিয়াছি- ইহা নূতন কিছুই নহে। এ তত্ত্ব আমার গবেষণার মৌলিক আবিষ্কার নহে। এই তত্ত্ব প্রাচীন ভারতের আর্য্যঋষিগণের উক্তি হইতে আমি সংগ্রহ করিয়াছি। আমি মাত্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে এই তত্ত্বের প্রমাণ করিতে আসিয়াছি, তাই বলিতেছিলাম অতি অপূর্ব্ব অতি অমূল্য রত্নরাশি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিয়াছে, তথাপি সভ্যসমাজে আমরা নগণ্য। ইহার কারণ আমাদের জড়তা। এখন ভারতের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে হইলে চাই প্রত্যেক ভারত-বাসীর অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম। চাই তাহার ত্যাগ, বীর্য্য, সাহস। তাহাকে ভারতীয়জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে, আর উহার সহিত পাশ্চাত্য জ্ঞানের সংমিশ্রণ করিয়া জীবন গঠন করিতে হইবে। শুধু মস্তিষ্কের শক্তির প্রসার দ্বারা জীবন গঠিত হয় না—হৃদয়ের বিস্তার চাই। অর্জ্জিত জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। প্রত্যেকের অক্লান্ত চেষ্টায় ব্যক্তিগত জীবন গঠিত হইলে সমষ্টিগত জীবন স্বতঃই গঠিত হইবে। তখন আমাদের চিন্তা, বাক্য

ও কার্য্যের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি হইবে। আর আমরা সত্য সত্যই জগতে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার অধিকারী হইব।

এই জাতীয় জীবন গঠিত করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেখিতে হইবে, এই জাতির বিশেষত্ব কি। যেরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির একটি বিশেষত্ব আছে সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরও একটি বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের উপরই জাতির সত্ত্বা প্রতিষ্ঠিত। ইহাই জাতির মেরুদণ্ড। ইহা হারাইলে জাতির লোপ হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। একটু বিচার করিলে দেখা যায়, ভারতবাসীর বিশেষত্ব তাহার আধ্যাত্মিকতা। কারণ প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ে ভারতবাসীর জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ। ভারতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেরই ধর্ম্মতত্ত্বে ন্যূনাধিক ব্যুৎপত্তি আছে। ইংলণ্ডে যেরূপ রাজনীতি সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞান-গোচার, ভারতে সেইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব। দ্বিতীয়তঃ ভারতে ধার্ম্মিকেরাই (যথা সাধু, সন্ন্যাসী) সর্ব্বসাধারণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পাইয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, ধর্ম্মের জন্যই ভারতবাসী অধিক ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। চতুর্থতঃ, ভারতের সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সকলই ধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিবাহে, সম্পত্তির অধিকারে—ধর্ম্মগ্রন্থেরই প্রাধান্য। ভারতবাসী সমাজের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য দান করেন না—নিজের পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তাহার দানব্রত অনুষ্ঠিত হয়। যতই বিচার করা যায় ততই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের বিশেষ আদর্শ ধর্ম্ম। ধর্ম্মলাভের জন্যই ভারতবাসীর সমুদায় শক্তি নিয়োজিত। ধর্ম্মানুরাগই ভারতবাসীর বিশেষত্ব। অতএব ভারতে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে ধর্ম্মরূপ ভিত্তি দৃঢ় করিতেই হইবে। ভারতবাসীর ধর্ম্মানুরাগ শিথিল হইলে, তাহার যুগযুগান্তগঠিত বিশেষত্ব লোপ পাইলে সে ক্রমেই জড় হইয়া পড়িবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, ধর্ম্ম কি,—স্থূলতঃ জীবের অনন্ত জীবন, অনন্ত আনন্দ এবং অনন্ত জ্ঞান লাভ করিবার যে চেষ্টা প্রণালী

তাহাই ধর্ম্ম। এই অবস্থালাভ করিবার জন্য তিনটী মৌলিক বাসনার প্রেরণাতেই জীবের সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এই বাসনাত্রয়ই সৃষ্টি সংরক্ষণ করিতেছে, তাই ধর্ম্মের ব্যুৎপত্তি—ধৃ + মন। যাহা হউক উদ্দেশ্য এক হইলেও বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; কেহ আনন্দ লাভ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়সেবায় নিরত, আবার কেহ বা আনন্দ লাভ করিবার জন্য বহির্জগৎ হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া ধ্যানস্থ। বারাঙ্গনা-সঙ্গীত-মুগ্ধ মদিরাসক্ত ভোগী যে বস্তুর অভিলাষী, গিরিগুহাস্থিত কঠোর তপস্যানিরত যোগীও তাহারই অভিলাষী। অভিলাষ এক—আনন্দ লাভ। ইহা সকল জীবের ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত হইতেছে—ইহারই প্রবল আকর্ষণে জীবপ্রবাহ অবিরাম গতিতে ছুটিতেছে। মানব মন স্বভাবতঃ বাহ্যমুখী। তাই সে বহিজগতেই আপনার প্রিয়তম বস্তুর অন্বেষণ করে। কিন্তু ভ্রান্ত মানব একবারও তাহার প্রিয়তমের স্বরূপ চিন্তা করে না। তাহার প্রিয়তম যে অনন্ত। অনন্ত জীবন, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত জ্ঞানকেই যে সে প্রিয়তম বলিয়া পূর্ব্বেই হৃদয়ে আসন পাতিয়া দিয়াছে, কেবল তাহা তাহার স্মরণ নাই; বহির্জগৎ যে অতি সঙ্কীর্ণ উহা মানবের শক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ; মানবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ মাত্র এই পঞ্চেন্দ্রিয় আছে, তাই বহির্জগতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শ ব্যতীত আর কিছুই তাহার জ্ঞানগোচর নহে। তাহার কোটী ইন্দ্রিয় থাকিলেও বহির্জগৎ সসীমই হইত, অনন্ত হইত না। অতএব এই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ-রচিত সসীম জগতে মানুষ কিরূপে অনন্তের সন্ধান পাইবে? ইহা অসম্ভব। সর্ষপের ভিতরে হিমালয়ের সন্ধান যেরূপ ভ্রান্তিমূলক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সঙ্কীর্ণ বহির্জগতে অনন্তের অনুসন্ধান তদপেক্ষাও ভ্রান্তি-মূলক।

উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

'কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।"

অমৃতত্বের অধিকারী দু' একজন মাত্র। বিবেকী ইন্দ্রিয়গুলিকে

বহির্জগৎ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এই অমৃতত্বের স্বাদ যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সন্ধান বলিতে পারেন। যুগে যুগে ভ্রান্ত মানবকে অমৃতের পন্থা দেখাইতে মহাপুরুষ অবতারাদির আবির্ভাব হয়। তাঁহারা জীবের উদ্দেশ্যসিদ্ধি কল্পে যে পন্থা নির্ব্বাচিত করেন, তাহাও ধর্ম্মনামে অভিহিত। বেদের ঋষিগণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট নানক শঙ্কর, চৈতন্য রামকৃষ্ণ ইত্যাদি অবতার ও মহাপুরুষগণ যে পথে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, সেই পথ মানুষকে দেখাইতে গিয়া একটি একটি ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধর্ম্মগুলি বিভিন্ন হইলেও ইহাদের উদ্দেশ্য এক এবং ইহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালীর ভিত্তিও এক। সকল ধর্ম্মেই জীবের মৌলিক বাসনার তৃপ্তির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এবং সকল ধর্ম্মই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে ত্যাগের দ্বারা পূর্ণত্ব লাভ হয় ভোগের দ্বারা নহে। অতএব পূর্ণত্বে জ্বলন্ত বিশ্বাস ও তল্লাভে বৈরাগ্য অভ্যাসই সকল ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ—ইহাই ধর্ম্মানুরাগের চিহ্ন।

বুঝিলাম, বহির্জগতে অনন্তের সন্ধান নিষ্ফল, তবে কোথায় তাহার সন্ধান করিব? যেখানেই আমার প্রিয়তম থাকুক না আমি তাহাকে লাভ করিব কিরূপে? আমার শরীর যে ক্ষুদ্র সসীম, ক্ষণস্থায়ী। এই শরীরের দ্বারা পূর্ণত্ব সম্ভোগ অসম্ভব। আমার মনও পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং অপূর্ণ সসীম,—ইহার দ্বারাও অনন্ত আনন্দ, সত্বা ও জ্ঞানের সম্ভোগ অসম্ভব। অতএব যতক্ষণ শরীর ও মনের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আমার আমিত্ব বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ পূর্ণত্ব সম্ভোগ হইবে না, এই আমিত্ব বোধটি মন ও শরীরের গণ্ডি হইতে সরাইয়া অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ পূর্ণত্বে ডুবাইতে পারিলেই জীবের মৌলিক বাসনা তৃপ্ত হয় নচেৎ নহে। তাই নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হইলে যখন সমুদয় চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, তখনই মানব তাহার চিরবাঞ্ছিত পূর্ণত্বের স্বাদ পায়, অতএব ক্ষুদ্র শরীর ও মনের গণ্ডিমধ্যস্থ "ছোট আমিটি"কে অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিতে হইবে।

এই "ছোট আমি"টিকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে হইবে—শরীর ও মনের ভোগচিন্তা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তবেই অমৃতত্বের অধিকারী হইব, নচেৎ নহে।

কিন্তু আমাদের মন স্বার্থ লইয়া বিব্রত। তাই পরার্থে অনুষ্ঠান অভ্যাস করিয়া এই স্বার্থচিন্তার লয় সাধন করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়াকেই শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মদ্বারা চিত্তশোধন বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রথমে চিত্তশুদ্ধি চাই অর্থাৎ মন হইতে স্বার্থচিন্তার দূরীকরণ আবশ্যক। অন্নদান, প্রাণদান, বিদ্যাদান, জ্ঞানদান ইত্যাদি পরার্থ অনুষ্ঠান দ্বারা হৃদয়ের বিস্তার হইবে। স্বার্থচিন্তা দূরীভূত হইবে। চিত্তশুদ্ধ হইবে আর ক্রমেই জীব সমগ্র বিশ্বকে আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইবে। এইরূপে যখন তাহার প্রেম কোটিকর প্রসার করিয়া বিশ্বকে আকর্ষণ করিবে তখনই এক শুভ মুহূর্ত্তে সে দেখিতে পাইবে যে তাহার "বিশ্ব" ও তাহার "আমি" মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। উহা এক বিরাট আমিত্বের বোধ! এই ক্ষুদ্র শরীরে গণ্ডিবদ্ধ ক্ষুদ্রআমি বিশ্বব্যাপী এক বিরাটআমিতে পরিণত হইয়াছে। এই জীবের পূর্ণাবস্থা, এই জীবের ধর্ম্মলাভ। এই অবস্থা লাভের জন্যই জীবপ্রবাহ ছুটিতেছে—সকল গণ্ডি ভেদ করিয়া আপনাকে এক অসীমের মধ্যে হারাইতে হইবে। ইহাই তাহাদের সাধনা। এই সাধনা যতদিন অপূর্ণ থাকিবে ততদিন তাহাদের বিশ্রাম নাই। ততদিন সীমা লঙ্ঘন করিবার অবিরাম প্রেরণা তাহাদিগকে চালিত করিবে। ক্রম-বিকাশ-বাদ সম্বন্ধে যাঁহারা অবগত তাঁহারা জানেন যে কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত কেবল শক্তিবৃদ্ধি করিবার, সীমা লঙ্ঘন করিবার এক বিরাট চেষ্টা বিদ্যমান। সকলেই বাধা অতিক্রম করিয়া আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে স্ব স্ব শক্তি নিযুক্ত করিতেছে। মানব সমাজে এই চেষ্টা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ খেচর নহে কিন্তু তাহার আকাশ পথে বিচরণ করা চাই। মানুষ জলচর নহে কিন্তু তাহার মধ্যে বাস করা চাই। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় চতুর্দ্দিকে সীমা লঙ্ঘন

করিবার এক বিপুল আয়োজন! আমরা সত্য সত্যই ভাগ্যবান্ যে আমরা এমন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি যে দেশে যুগযুগান্ত পূর্ব্বে এই সীমা লঙ্ঘনের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই চেষ্টার কোথায় পরিণতি তাহা ভারতবাসী স্বতঃই উপলব্ধি করিতে পারে এবং এই চেষ্টা কিরূপে সফল হইবে তাহা ভারতবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। যতই আমরা জড়বাদী সভ্যতার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকি না কেন, আমাদের শরীর, আমাদের হৃদয় ঋষিবাক্য দ্বারা আমূল গঠিত। আর্য্যাবর্ত্তের জলে বায়ুতে এখনও উপনিষদের ভাব লহর তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। আর্য্যাবর্ত্তের আকাশ এখনও প্রণব ধ্বনিতে মুখরিত। আর্য্যাবর্ত্তবাসীর হৃদয় এখনও এই অদ্ভুত সঙ্গীতের সহিত তালে তালে স্পন্দন করিতেছে!

প্রত্যক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য-সমূহ আজ সংস্কারবদ্ধ হইয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে বর্ত্তমান। তাই আমাদের আদর্শও স্থির, উপায়ও নির্দ্দিষ্ট। পূর্ণত্ব-লাভ আমাদের আদর্শ, আর আত্মপ্রসারণ ইহার উপায়।

কিন্তু আমরা যেন উদ্যম হারাইয়াছি, উদ্দেশ্য স্থির থাকিলেও, উপায় নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও আমাদের যেন ঐ উপায় অবলম্বন করিবার শক্তি নাই। আমরা যেন গন্তব্য পথ ভুলিয়া গিয়া "Lotus-eaters" দের মত এক ঐন্দ্রজালিক রাজত্বে মুগ্ধ হইয়া আছি। সমগ্র ভারত যেন এক মোহনিদ্রায় আবিষ্ট, এক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু চাহিয়া দেখ, জাগরণের চিহ্ন যেন লক্ষিত হইতেছে। অমানিশার অন্ধকারে যেন আলোকের ক্ষীণ রশ্মি প্রবেশ করিয়াছে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের শ্রেষ্ঠবীর স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি একবার তাকাও। যেন আমাদের মোহনিদ্রা দূর করিবার জন্য তিনি সততই বলিতেছেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" তিনি যেন আরও বলিতেছেন, "একবার জাগ্রত হইলে, একবার আপনাকে চিনিতে পারিলে এই জাতি সমগ্র জগৎকে আদর্শ দেখাইতে পারিবে। সমগ্র জগৎ আজ জীবনের সমস্যা সমাহিত করিতে সচেষ্ট। তাহারা আদর্শ খুঁজিয়া পাইতেছে না,

তাহারা দিশাহারা হইয়া এক অজ্ঞাত পূর্ণত্ব লাভের ব্যর্থ চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে ভারতের উত্থান প্রয়োজন, ভারতকে তাহার বহুকালসঞ্চিত সর্ব্বোচ্চ আদর্শ জগতের সম্মুখে ধরিতে হইবে। আর ঐ আদর্শলাভের উপায়ও শিখাইতে হইবে। কিন্তু আমরা নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় থাকিলে শিখাইবে কে? জগতের সমস্যা মিটাইবে কে? "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।" এস আমরা কর্ম্মের এই মাহেন্দ্রক্ষণে অনার্য্যোচিত জড়তা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের আদর্শের দিকে অগ্রসর হই। এস আমরা আমাদের "ক্ষুদ্র আমি"কে ভারতসমুদ্রের অতল তলে নিক্ষেপ করি, এস আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে সহস্র দিকে প্রসারিত করি। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত, এস আমরা সেবাধর্ম্মের এক বিরাট অভিনয় করি। ক্ষুদ্র নহে, সব বিরাট। ক্ষুদ্রে আমাদের পিপাসা দূর হয় না, প্রেমের বিস্তার, কলহ ত্যাগ ইহাই আমাদের কর্ম্ম। আত্মপ্রসারণই আমাদের উদ্দেশ্য, সিদ্ধির একমাত্র পন্থা। বৃথা শক্তির অপচয় না করিয়া যাহার যেদিকে রুচি সে সেই দিকে আত্মশক্তির ক্রমবিস্তার করিয়া জগতের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করি। জড়বাদী স্বার্থ লইয়া অপরের সহিত কলহ করুক। আর চৈতন্যবাদী আমরা, স্বার্থ ছাড়িয়া অপরকে প্রেমপাশে আবদ্ধ করিতে অগ্রসর হই। আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, এই এক সর্ব্বজনীন উদার আদর্শে গঠিত করি। জগৎ দেখিয়া স্তম্ভিত হউক। আর একবার আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতালোকে জগৎ উদ্ভাসিত হউক। ভোগ, বিলাস, মানযশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা পরিত্যাগ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধনায় ব্রতী হই। জগতে আর একবার এই সনাতন সত্য ঘোষিত হউক যে, ত্যাগের দ্বারা পূর্ণত্ব লাভ হয়, ভোগের দ্বারা নহে।

— —

মা

(শ্রীবিহারীলাল সরকার, বি এল্)

(১)

যুগযুগান্তর ধোরে মা তোমার পূজা হয়ে আস্‌ছে। যে যে ভাবে ডাক্‌ছে তোমাকেই ডাক্‌ছে। উপাসনা পূজা তোমা ছাড়া হোতে পারে না।

"দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈঃ নিগূঢাম্।"

তুমি পরম ব্রহ্মের শক্তি। বৈদিক ঋষি তোমাকে সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন।

ব্রহ্ম শান্ত শিব অদ্বৈত—অশরীর। তুমি গুণময়ী অলৌকিকী শরীরী।

"পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে
জ্ঞানবল ক্রিয়াত্মিকা।"

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। কিন্তু মা তোমার উর্জ্জিত জ্ঞান, উর্জ্জিত বল, ও উর্জ্জিতা ক্রিয়া।

শ্বেতাশ্বতর ঋষিও দেখেছিলেন,

'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্॥

মা। তুমি উৎপত্তিরহিত ও সত্ত্ব-রজ-তম-ময়ী। স্মৃতিকারও বলেছেন,

"অস্য শক্তিঃ মায়া অগ্নি শক্তিবৎ॥"

ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি।

(২)

চৈতন্যে ত্রিগুণ মিশ্‌লে তবে ব্যবহার হয়। শুধু অনিলে বা শুধু সলিলে তরঙ্গ হয় না। কেবল চৈতন্যে ব্যবহার হয় না, বা কেবল গুণে ব্যবহার হয় না। অভিমানশূন্য সুপ্ত দেহ দিয়া

কোন্ কাজ করা চলে? আবার তুরীয় অবস্থায়, কাকে, কি দিয়ে, কে দেখিবে? সেজন্য,—

"ব্রহ্মণি এষা স্থিতা মায়া সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারিণী॥"

মা, তুমি পরমশিবের অঙ্কস্থা হ'যে সৃষ্টি স্থিতি লয় করছ।

(৩)

তুমি ঈশ্বরী রূপে ভুবন ও জীব নিয়মন করছ। তোমার অন্তর্যামী শক্তি হেতু সমুদ্রবেলা অতিক্রম করে না, চন্দ্র সূর্য্য কক্ষচ্যুত হয় না, জীব জন্মমৃত্যুর হাত এড়াতে পারে না।

তুমি মনমালার মধ্যে সূত্ররূপে বিরাজ কো'রে সূত্রাত্মা হ'যে নানা রসাস্বাদ করছ।

আবার সহস্রশীর্ষা হো'যে নানা মুখে খাচ্ছ।

আমি ক্ষুদ্র, কারণ আমার দেহ ক্ষুদ্র, আমার মন ক্ষুদ্র। তুমি মহান্ কারণ, তোমার দেহ বিরাট, তোমার মন বিরাট্। আমার অভিমান এই ক্ষুদ্র দেহে ক্ষুদ্র মনে। তোমার অভিমান সকলদেহে সকল মনে। অতএব তুমি পূর্ণ, আমি অংশ। তোমার মন শুদ্ধসত্ত্ব আমার মন মলিন। অতএব তোমার শক্তি উৎকৃষ্ট, আমার শক্তি নিকৃষ্ট। সেজন্য তুমি নিয়ামক, আমি নিয়ম। কিন্তু পূর্ণ অংশ, নিয়ামক নিয়ম্য প্রভৃতি ভেদ দেহমনের মধ্য দিয়ে হয় তাই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের সার্থকতা হয় চৈতন্যের দিক হ'তে। যে চৈতন্য সমস্ত ভুবন প্রকাশ করছেন, সেই চৈতন্যই আমার এই ক্ষুদ্র দেহমনও প্রকাশ করছেন। চৈতন্য অশরীর, সেজন্য তাঁর পূর্ণ অংশ নিয়ম নিয়ামক হয় না। তিনি শুদ্ধ প্রকাশস্বভাব।

(৪)

মৈত্রেয়ী উপনিষদে আছে, মা তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র হয়েছ।

"অথ যো হ খলু বাব অস্য রাজসঃ
অংশঃ অসৌ সঃ যোঽয়ং ব্রহ্মা।"

তোমার রাজস্ অংশ হ'তে ব্রহ্মা হয়েছেন।

"অথ যো হ খলু বাব অসৎ তামসঃ
অংশঃ অসৌ সঃ সোঽয়ং রুদ্রঃ"।

তোমার তামস অংশ হ'তে রুদ্র হয়েছেন।

"অথ যো হ খলু বাব অস্য সাত্বিকঃ
অংশঃ অসৌ সঃ যোঽয়ং বিষ্ণুঃ"॥

তোমার সাত্বিক অংশ হ'তে বিষ্ণু হ'য়েছেন। মা! তুমি ব্রহ্মাণী রূপে সৃষ্টি কর, বৈষ্ণবী রূপে পালন কর, আর রুদ্রাণী রূপে সংহার কর।

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র রূপ কবির কল্পনা নহে বা তথাকথিত পৌরাণিক যুগের বিকৃত ধর্ম্মের অঙ্গ নহে।

(৫)

আবার মা, দিক, বায়ু, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনী, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, প্রজাপতি, চন্দ্র, চতুর্ম্মুখ প্রমুখ অধিকারিক দেবতা হ'য়েছ। নরাবতার অর্জ্জুন প্রণাম করে বলেছেন,—

"বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ।
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ॥"
নমোস্তুতে সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমঃ নমস্তে॥"

এঁরা তোমার স্থিতিকাদির সহায় হয়েছেন। তুমি নাগলোক, মানুষলোক, পিতৃলোক, দেবলোক। ঋষিলোক প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজন ক'রে এবং সেই সেই লোকবাসী নানা শরীর সৃজন ক'রে তাদের নানা ভোগ দিতেছ।

(৬)

আবার মা যুগে যুগে অবতাররূপ দিব্য বিগ্রহ ধারণ ক'রে জীবকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছ। কখন বারাহী রূপে, কখন নারসিংহী রূপে, কখন রাম রূপে, কখন কৃষ্ণ রূপে, কখন শিব রূপে, কখন দুর্গা রূপে, কখন কালী রূপে—এইরূপ কত কত রূপে নব নব শিক্ষা দিতেছ। ব্যাসপ্রমুখ পুরাণকারগণ ভক্তিচিত্তে

তোমার সেই সব মহিমা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। সিদ্ধ পুরুষও গিয়েছেন -

"মন ক'রো না দ্বেষাদ্বেষী
কালী কৃষ্ণ শিব রাম
সকল আমার এলোকেশী।"

(৭)

আবার তন্ত্রে আছে, মা তুমি বর্ণময়ী। তুমি বর্ণমালা প'রে আছে।

যত শুন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে বিরাজ করে॥

অকরাদি এক একটী বর্ণ এক একটী শক্তির মূর্ত্তি।

অ কীর্ত্তি, আ কান্তি, ই তুষ্টি, ঈ পুষ্টি, উ ধৃতি, ঊ শান্তি, ঋ ক্রিয়া, ৠ দয়া, ঌ মেধা, ৡ হর্ষা, এ শ্রদ্ধা, ঐ লজ্জা, ও লক্ষ্মী, ঔ স্বরস্বতী, অং প্রীতি অঃ রাত—এই ষোড়শ স্বরশক্তি। ক জয়া, খ দুর্গা, গ প্রভা, ঘ সত্যা, ঙ চণ্ডা, চ বাণী, ছ বিলাসিনী, জ বিজয়া, ঝ বিরজা, ঞ বিশ্বা, ট বিনদা, ঠ সুনন্দা, ড স্মৃতি, ঢ ঋদ্ধি, ণ সমৃদ্ধি, ত শুদ্ধি, থ ভক্তি, দ বুদ্ধি, ধ মতি, ন ক্ষমা, প রমা, ফ উমা, ব ক্লেদিনী ভ ক্লিন্না, ম বাযুদা য ধাবা, র পরায়ণা, ল সন্ধ্যা, ব সন্ধ্যা, শ প্রজ্ঞা, ষ প্রভা, স নিশা, হ অমোঘা, ক্ষ বিদ্যুতা, এই ৩৪টী হল শক্তি—সমুদায়ে পঞ্চাশৎ শক্তি। এই সব মূর্ত্তি সর্ব্বকামফলপ্রদা। এই সমস্ত শক্তি মার সঙ্গিনী। মা এই সব শক্তিসমন্বিতা হ'য়ে বিরাজ করুছেন।

(৮)

যোগশাস্ত্রে আছে, মা তুমি কুণ্ডলিনী শক্তি। তুমি গুহে শাকিনী-শক্তি, লিঙ্গমূলে কাকিনী শক্তি, নাভিতে রাকিনী শক্তি, হৃদয়ে লাকিনী শক্তি, কণ্ঠে ডাকিনী শক্তি, ভ্রূমধ্যে হাকিনী শক্তি। এই ষট্‌চক্রের উপর শিবচক্রে হংস শক্তি। অজপা 'হংস' সঙ্গে মা হংসীরূপে বিহার করুছেন। তার উপর বোধিনীচক্রে মা সোঽহং শক্তি। তার উপর ওঁ বা বিন্দু চক্রে মা বিন্দুশক্তি। কোথায় বা

নিরাকারা বিন্দুবাসিনী ব্রহ্মরূপিণী হ'য়ে রয়েছেন। মহাপুরুষ গেয়েছেন—"মনের বাসনা জননি ভাবি,—

ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হ'লো মা—ব্রহ্মরূপিণী ॥"

(৯)

মা সকল কালেই তোমার পূজা চলে আস্‌ছে। আদি গুরু ব্রহ্মা তোমার পূজা করেছিলেন। জগৎগুরু অবতার শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ তোমার পূজা করেছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে বলেছিলেন "মা আজ আমি রাজ্যভ্রষ্ট, আমাকে রক্ষা কর"। সুরথ রাজা প্রভৃতির পূজা পুরাণে বিখ্যাত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজ, শ্রীচৈতন্যদেব তোমার পূজা কর্‌তেন। তুমি নিজ মুখেও বলেছ "যে আমাকে অবজ্ঞা করে সে হীন হয়ে যায়"। "অজানন্তঃ মাং হীয়ন্তে।"

অতএব যদি শোকদুঃখের হাত থেকে বাচ্‌তে চাও তো মায়ের শরণ লও।

"কালিকা জগতাং মাতা শোক দুঃখ বিনাশিনী।"

ইহা গল্প নয়, বাজে কথা নয়, ইহা প্রমাণবাক্য।—ভাবিও না কুসংস্কার। বেদ পুরাণ তন্ত্রের প্রামাণ্যে বিশ্বাস সুসংস্কার বল্‌ব। শিশ্নোদর পরিতৃপ্তির জন্য যা তা লৌকিক উপায় অবলম্বন কুসংস্কার, সুসংস্কারের ফল নিশ্চয় নহে।

(১০)

"কিং কিং দুঃখং সকল জননি।

ক্ষীযতে ন স্মৃতায়াম্" ॥

হে বিশ্বজননি! এমন কি দুঃখ আছে, তোমাকে স্মরণ কর্‌লে নাশ হয় না।

কা কা কীর্ত্তিঃ কুলকমলিনি!

প্রাপ্যতে নার্চ্চিতায়াম্ ॥

হে কুলকমলিনি, এমন কি কীর্ত্তি আছে তোমাকে অর্চ্চনা করিলে পাওয়া যায় না।

"কিং কিং সৌখ্যং সুর বর নুতে।
প্রাপ্যতে ন স্তুতায়াম্ ॥"

হে সুরবর নুতে? এমন কি সুখ আছে, তোমাকে স্তুতি করলে লাভ হয় না।

"কং কং যোগং ত্বয়ি ন তনুতে চিত্তমালম্বিতায়াম্।"

এমন কি যোগসিদ্ধি আছে, তোমাকে চিত্তে অবলম্বন করলে পাওয়া যায় না!

"স্মৃতা ভবভয়ং হংসি।"

মা! তোমাকে স্মরণ করলে তুমি ভবভয় নাশ কর।

"পূজিতাসি শুভঙ্করি!"

তোমার পূজা করলে মঙ্গল কর।

"স্তুতা ত্বং বাঞ্ছিতং দেবি দদাসি করুণাকরে।"

করুণাকরে। দেবি! তোমাকে বন্দনা করলে তুমি মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

"অনুগ্রহায় ভূতানাম্ গৃহীত দিব্য বিগ্রহে।
তাপত্রয় পরিম্লান ভাজনং ত্রাহি মাং শিবে ॥"

জীবের অনুগ্রহ কামনায় মা "দিব্য বিগ্রহ" ধারণ করেছ। শিবে! আমি তাপত্রয়ে তাপিত, আমাকে রক্ষা কর।

"নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি।
নান্যং স্মরামি ন ভজামি নচ আশ্রয়ামি ॥
ত্যক্ত্বা ত্বদীয় চরণাম্বুজমাদরেণ।
ত্রাহি মাং দেবি কৃপয়া ময়ি দেহিসিদ্ধিম্ ॥

আমি অন্য কিছু বলতে চাই না, শুনতে চাই না, ভাবতে চাই না, মনে করতে চাই না, ভজতে চাই না, তোমার পাদপদ্ম ছেড়ে, আর কিছু আশ্রয় করতে চাই না।

দেবি! আমাকে রক্ষা কর কৃপা কোরে আমাকে সিদ্ধি দাও।

দ্রব্যহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রদ্ধামাত্রবিবর্জ্জিতম্ ॥
তৎ সর্ব্বং কৃপযা দেবি ক্ষমস্ব ত্বং দয়ানিধে।

সত্য বটে আমার পূজা দ্রব্যহীন, ক্রিয়াহীন, ও শ্রদ্ধা মাত্র বিবর্জ্জিত, কিন্তু দেবি! তুমি দয়ানিধি! সে সব অপরাধ ক্ষমা কর।

"যন্ময়া ক্রিয়তে কর্ম্ম তন্মহৎ স্বল্পমেব বা
তৎ সর্ব্বং চ জগদ্ধাত্রিঃ ক্ষন্তব্যময়মঞ্জলি॥"

মা! আমি তোমার কর্ম্ম করে যাচ্ছি, যদি ঠিক ঠিক্ না হোয়ে কম হয়ে পড়ে, কি বেশী হয়ে পড়ে, জগদ্ধাত্রি! তার অপরাধ নিও না, ক্ষমা কর, ইহাই আমার অঞ্জলি!!!

বেদ-কথা।

[মর্ত্ত্যে সোমরস আবির্ভাব]

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত)

ঋষিগণ সোমের স্তব করিতেছেন, যজ্ঞে আহ্বান করিতেছেন। সোমরস বলবীর্য্যবিধায়ক। ইন্দ্র এই সোমরস পান করিয়া বীর্য্যশালী হইয়া বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলেন।

আদিতে এই সোমরস মর্ত্ত্যে দেবগণপ্রিয় মনুষ্যকুলমধ্যে ছিল না। এই সোমরস বৃহৎ দ্যুলোকের উপরিভাগে ছিল।

অসুরগণ মনুষ্যকুলের বিরোধী, উহারা মর্ত্ত্যে মনুষ্যগণের শত্রু। মনুষ্যগণ দেবপ্রিয় হইয়াও অসুরগণের বলবীর্য্যের নিকট পরাভূত। অসুরগণ মনুষ্যগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদের ধন, রত্ন, অশ্ব, গো, নারী—সকল সম্পদ কাড়িয়া লইত।

মনুষ্যকুলে যাঁহারা প্রধান, যাঁহারা মনীষী, তাঁহারাই ঋষি। এই ঋষিগণ শত্রুদিগকে পরাভূত করিবার মানসে দেবতাদিগের আরাধনা করিতেন, তাহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিতেন। দেবতারা প্রসন্ন হইলে সহজেই শত্রু-বিনাশ হইতে পারিবে।

তাই ঋষিগণের উপর অসুরকুলের অতিশয় ক্রোধ। একদা শত্রু অসুরগণ বামদেব নামক ঋষিকে শত লৌহময় 'শরীরে' অবরুদ্ধ করিয়াছিল। অসুরদিগের কবলে লৌহময় গর্ভে ঋষি অবরুদ্ধ হইয়া অতীব ক্লেশ অনুভব করিতেছিলেন। বামদেবের এই দুর্গতিতে অন্যান্য ঋষিগণ সাতিশয় ম্রিয়মান হইলেন, লৌহময় গর্ভ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে অবশেষে দেবতাদিগের শরণাপন্ন হইলেন. এবং তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার মানসে নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। দেবগণ প্রীত হইলেন।

দেবতা এবং ঋষিগণ অসুরকুলের বিরুদ্ধে সমবেত হইলেন। যে উপায়ে হউক, অসুরগণকে পরাভূত করিয়া লৌহময় গর্ভ হইতে ঋষি বামদেবকে উদ্ধার করিতেই হইবে। কিন্তু দেব এবং ঋষিগণের প্রযত্ন বিফল হইল।

অতঃপর তাঁহারা দেবী গায়ত্রীর শরণাপন্ন হইলেন তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ঋষিগণ ছন্দ গান করিয়াছিলেন। ছন্দের যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই গায়ত্রী। এই গায়ত্রী ছন্দ সকলের মাতা। ঋষিগণের ছন্দগানে ছন্দমাতা গায়ত্রী প্রীতা হইয়া ঋষিগণ-সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন! দেবী গায়ত্রী ঋষিগণকে বলিলেন,

"বৎসগণ, আমি প্রীত হইয়াছি। আমি তোমাদিগকে এক অভিনব বার্ত্তা শ্রবণ করাইতেছি। এ সংবাদ পূর্ব্বে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে কেহই অবগত ছিল না আমি সেই অভিনব বস্তুর সন্ধান বলিয়া দিতেছি।

"ঐ যে বৃহৎ অন্তরীক্ষ অবলোকন করিতেছ, উহা গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাগণের আবাস। অপ্সরাগণ গন্ধর্ব্বগণের স্ত্রী। ঐ গন্ধর্ব্বগণ সূর্য্যরশ্মিসম অন্তরীক্ষে বিচরণ করে। তাই, অন্তরীক্ষ গন্ধর্ব্বলোক

বলিয়াও কীর্ত্তিত হইতে পারে। ঐ বৃহৎ অন্তরীক্ষেরও উপরিভাগে সেই বাঞ্ছিত দিব্য বস্তু অবস্থান করিতেছে। সেই দিব্য বস্তু সোমরস নামে অভিহিত। এই সোম আলোকস্বরূপ, তেজোময়। এই সোম লোহিতমূর্ত্তি—বিচিত্রবর্ণ। সোম মদকর ও ইষ্টযুক্ত। সোমরস পান করিলে বিপুল বলবিক্রম লাভ হয়। সোমরসপায়ী ভুবনে অজেয়। তাঁহার শত্রু অচিরেই নিহত হয়।"

এইরূপে ছন্দমাতা গায়ত্রী সোমরস-মহিমা কীর্ত্তন করিলে ঋষিগণ উহা লাভ করিবার জন্য সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু সেই দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে সোমরস মর্ত্ত্যে আনয়ন করা অসম্ভব ভাবিয়া অতীব চিন্তিত এবং দুঃখিত হইলেন। ঋষিগণ পুনর্বার গায়ত্রী দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। যিনি সোমের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন, তিনিই দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে উহা আনয়ন করিয়া মর্ত্ত্যে আমাদিগকে প্রদান করুন। দেবী গায়ত্রী এই দুষ্কর কার্য্যে অস্বীকৃতা হইলেন, কিন্তু ঋষিগণের ব্যাকুল প্রার্থনায় সন্দিগ্ধমনে অবশেষে আশ্বাস প্রদান করিলেন।

মর্ত্ত্যে সোমরস আনয়ন করিতে হইবে। দেবী গায়ত্রী শ্যেন-পক্ষীর রূপ ধারণ করতঃ আকাশে উড্ডীন হইলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের আবাস বৃহৎ দ্যুলোক অতিক্রম করিয়া শ্যেন তদুপরি আরোহণ করতঃ সোম-সমীপে উপনীত হইল।

ঋষিগণ-অভীষ্ট সোমরস গ্রহণকরতঃ শ্যেন অবতরণ করিতে লাগিল। ক্রমে গন্ধর্ব্বলোক অন্তরীক্ষে উপনীত হইলে গন্ধর্ব্বগণ শ্যেনকে সোমরস গ্রহণকরতঃ মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতেছে দর্শন করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। অন্তরীক্ষে শ্যেন ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। সংগ্রামকালে শ্যেন দ্যুলোক হইতে অধোমুখ হইয়া শব্দ করিতে লাগিল। সে শব্দে মর্ত্ত্যে মনুষ্যকুল ভীত ও চমকিত হইল। শ্যেন গন্ধর্ব্বযুদ্ধে অতীব কাতর হইয়া পড়িল। তাহার একটি পক্ষ প্রহৃত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে মর্ত্ত্যে পতিত হইল।

এইরূপ যুদ্ধে পরাভূত শ্যেন সোমরস রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলে

গন্ধর্ব্বগণ সোমরস কাড়িয়া লইল। দেব ও মানবগণ শ্যেনের পরাজয়ে অতীব ম্রিয়মান হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ সোমরস অপহরণ করিয়াছে, এই সোমরস উদ্ধারে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

যুদ্ধে গন্ধর্ব্বগণকে পরাভূত করা দুঃসাধ্য। কোনরূপে উহাদিগকে মোহ উৎপন্ন করিয়া কৌশলে সোম উদ্ধার করিতে হইবে। গন্ধর্ব্বগণ অতীব নারীপ্রিয়। দেবগণ স্থির করিলেন, এই নারীর মোহেই উহা-দিগকে মোহিত করিয়া সোম উদ্ধার করিতে হইবে।

এইরূপ স্থির করিয়া দেবগণ বাগ্দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। বাগ্দেবী সোম উদ্ধারে সম্মতা হইলেন।

সোম উদ্ধারার্থ বাগ্দেবী অন্তরীক্ষে গন্ধর্ব্বগণ সমীপে উপনীত হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ বাগ্দেবীর সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সমবেত হইল। গন্ধর্ব্বগণ সমবেত হইলে বাগ্দেবী অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আপন দেব-পরিচ্ছদ স্বীয় দেবশরীর হইতে উন্মোচন করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ বাগ্দেবীর নগ্নসৌন্দর্য্য দর্শনে মোহাভিভূত হইল। মোহমুগ্ধ গন্ধর্ব্বগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কে তাঁহাকে লাভ করিবে এই লইয়া পরস্পরের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। এই সুযোগে দেবী মোহাভিভূত পরস্পর পরস্পরের হিংসায় রত, গন্ধর্ব্বগণের কবল হইতে সোমরস কৌশলে হস্তগত করিয়া অন্তরীক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবগণ-সমীপে উপনীত হইলেন।

সোমরস উদ্ধার হইল। দেবগণ মন্ত্রে ঋষিগণকে সেই সোমরস প্রদান করিলেন। দেব ও ঋষিগণ এই সোমরস পানে বীর্য্যশালী হইয়া অসুরদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করতঃ ঋষি বামদেবকে শত লৌহময় কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

শিখগুরু।

গুরুগোবিন্দ।

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র)

এইরূপ অলৌকিক দৈবশক্তিতে মন-প্রাণ পূর্ণ করিয়া শ্রীগুরু কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং শিখদিগকে বলেন যে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে তাহারাই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রকৃষ্ট সেবার অধিকার পাইবে এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের জীবন দেবী চণ্ডিকা বলিরূপে গ্রহণ করিবেন। গোবিন্দ সিংহের চরিত্র সমালোচন করিতে গিয়া অনেকেই একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট হইয়া থাকেন। কেহ কেহ তাঁহাকে কেবল একজন কায়িক বলশালী বা অসামান্য যোদ্ধপুরুষ বলিয়াই ক্ষান্ত হন—তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব কতদূর ছিল সে সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারেই উদাসীন থাকেন। তাঁহারা এই দেবোপম চরিত্রের একটি দিক দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন, সুতরাং সুবিচারে উপনীত হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে অনেক সময়েই অসম্ভব হইয়া উঠে। গুরু নানকের অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিকতার তুলনায় গোবিন্দ সিংহের স্থান হয় ত' বহু নিম্নে স্থাপিত হইবে কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে একজন 'গোঁয়ার' বা 'গুণ্ডা' এই বিগর্হিত বিশেষণে বিশেষিত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

যজ্ঞ শেষ হইয়া গেলে গুরু স্বীয় আবাসে ফিরিয়া দেখিলেন মসন্দ জাতি বড় অত্যাচার করিতেছে। তিনি অবিলম্বে উহাদিগকে বিদ্রোহিতার জন্য সমুচিত শাস্তি প্রদান করিলেন এবং শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

অতঃপর আমরা তাঁহার সংস্কারকার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মানবজীবনের ত্রিংশ বৎসর অতিবাহিত হইতে দেখিয়া গুরু আর কালবিলম্ব করা বিবেচনা বোধ করিলেন না। সেই জন্য চির-

পোষিত সংস্কারগুলি একে একে কার্য্যে পরিণত করিতে লাগিলেন। তিনি আনন্দপুরে এক সুবৃহৎ বৈশাখী মেলা আহ্বান করেন। ঐ উপলক্ষে পাঞ্জাব প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুসংখ্যক শিখভক্ত সমবেত হয়। শিখদিগের গুরুভক্তি মৌখিক মাত্র বা সত্য সত্যই আন্তরিক,স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল সাধনের জন্য তাহারা কিরূপ উদ্‌গ্রীব ও একনিষ্ঠ তাহার সঠিক নিদর্শন গ্রহণ করিবার জন্যই গুরু স্বেচ্ছায় উহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। শিখদিগের জাতীয় জীবনে উহা এক বিশিষ্ট দিবস—যে দিন তাহাদিগের সত্যসঙ্কল্প ও স্বজাতি-নিষ্ঠা কষ্টিপাথরে সম্যক্‌রূপে পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং কাহার কতদূর মূল্য তাহা শ্রীগুরু অনায়াসেই নিরূপণ করিয়াছিলেন।

সকলে সমবেত হইবার পূর্ব্বদিবসেই গুরু সেই স্থানের একাংশ কাষ্ঠ ইত্যাদির সাহায্যে উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন—বাহির হইতে উহার ভিতরে কি হইতেছে তাহা যেন কাহারও দৃষ্টি গোচর না হয়। তিনি তৎপরে একজন ভক্তকে পাঁচটী ছাগ ক্রয় করিয়া উহার মধ্যে রাখিতে আদেশ দিলেন।

আজ বৈশাখী মেলার স্মরণীয় দিবস। অতি প্রত্যুষে শ্রীগুরুর নিমন্ত্রণে আহূত হইযা চতুর্দ্দিক হইতে শত শত ভক্ত আসিয়া সমবেত হইল। তৎপরে যখন সেই বিশাল জনতা স্থিরভাব ধারণ করিল, সেই সময় শ্রীগুরু হস্তে একখানি উন্মুক্ত অসি ধারণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব বাণী শুনাইতে লাগিলেন। তদীয় উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল আজ এক স্বর্গীয় শোভায় সুশোভিত। জলদগম্ভীরস্বরে শ্রীগুরু ডাকিলেন—“কয়েকজন বিশিষ্ট শিখভক্তের মস্তক আবশ্যক হইয়াছে। স্বেচ্ছায় গুরুর কার্য্যোদ্ধারের জন্য আত্মবলিদানে তোমাদের মধ্যে কয়জন প্রস্তুত আছ-আমি তাহাদিগকে সাদরে মৎসকাশে আহ্বান করিতেছি।” গুরুর মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই ত্রস্ত ও চকিত হইল—আজ তাহাদের সমক্ষে জীবন-মরণের মহাসমস্যা উপস্থিত! প্রথম আবেদনে বিশেষ ফললাভ হইল না। গুরু দ্বিতীয়বার ডাকিলেন—বুঝি বা শিখ আত্মত্যাগে অনিচ্ছুক! সকলেই অপ্রতিভ হইয়া অপেক্ষা করিতে

লাগিল। তৃতীয় আবেদনের পর কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে উত্তর আসিল। সেই জনসমুদ্রের এক প্রান্ত হইতে একজন উন্নতমনা নির্ভীক ভক্ত হৃদয়ের আবেগভরে গর্জ্জিয়া উঠিল—"ওয়া গুরুজী কী ফতে! প্রভো! এই দীনহীন অকিঞ্চনের মস্তক অর্পিত হইল।" নিস্তব্ধমণ্ডপে কোলাহল উঠিল—চতুর্দ্দিক হইতে প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হইতে লাগিল—'ধন্য দয়াসিং! হে লাহোরনিবাসী ক্ষত্রিয়াগ্রগণ্য! তুমি আজ আমাদের মখোজ্জ্বল করিলে!' ইহার পর গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শ্রীগুরু সেই পুরুষপ্রবরকে সানন্দে অভিবাদন করিয়া বেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করিলেন—শিখ সেই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিয়ৎকাল পরে শ্রীগুরু সবেগে রুধিরহস্তে সভায় ফিরিয়া আসিলেন—সকলে স্থির জানিল দয়াসিং নিহত হইয়াছেন। উহার পর গুরু আবার আহ্বান করিলেন। প্রথমে সকলেই দ্বিধা করিতে লাগিল কিন্তু তৎপরে হস্তিনাপুরনিবাসী ধর্ম্মসিং নামক জনৈক জাঠ শ্রীগুরুর মহাকার্য্যে আত্মবলিদান করিলেন। সভাক্ষেত্রে পুনরায় কলরব উত্থিত হইল। গুরু এবারও পূর্ব্ববৎ আচরণ করিলেন। ইহার পরে একে একে অপর তিন জন সাহসী শিখ আপনাদিগকে শ্রীগুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া ধন্য হইল—বিদর্ভপুর নিবাসী সাহেবসিং নামক নায়েন (নাপিত) শিখ—দ্বারকানিবাসী মহকম সিং নামক জনৈক ছীপা (যাহারা কাপড়ে ছাপ দেয়) শিখ এবং তৎপরে উড়িষ্যা জগন্নাথপুরী নিবাসী হিম্মৎ সিং নামক জনৈক ঝিবর (কাহার। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে স্তিমিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল শ্রীগুরু উক্ত পাঁচজন শিখ পরিবেষ্টিত হইয়া বীরদর্পে সেই বেষ্টিত স্থান হইতে বহির্গত হইতেছেন। তবে কি উঁহারা কেহই নিহত হন নাই?—না। শ্রীগুরু তাঁহাদিগকে উহার ভিতর বসাইয়া রাখিয়া প্রতিবারে এক একটী ছাগ হত্যা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইতেছিলেন।

তৎপরে গোবিন্দসিংহ ঐ পাঁচজন শিখকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উহাদিগের অদ্ভুত বীর্য্য ও গুরুগতপ্রাণতার ভূরি

ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উহাদিগকে বহুবিধ মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া বলিলেন—"হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা আজ হইতে আমার আপনার হইলে। তোমরাই 'খালসা' (খাঁটী) বা শিখনামের উপযুক্ত—খালসা গুরুসে আউর গুরু খালসাসে হোই এক, দুস্‌রে যো তাঁবিদার হোই। শ্রীগুরু নানকের সময় একজন মাত্র খাঁটী লোক পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু আমার পরম সৌভাগ্য আমি পাঁচজন সহৃদয় ব্যক্তি পাইয়াছি—ইহারাই আমার প্রধান সহায়।" এই বলিয়া গুরু উহাদিগকে মন্ত্রপূত করিয়া লই-লেন—একটী লৌহপাত্রে কিয়ৎপরিমাণ জল আনাইয়া দেবীদত্ত করদ তরবারি ডুবাইয়া দিলেন; উহা অমৃতরূপে সকলে পান করিয়া ধন্য হইল। এই উপলক্ষে প্রায় বিংশ সহস্রের উপর শিখ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীগুরু ঐ পাঁচজন দীক্ষিত শিষ্যকে বহুবিধ উপদেশ দেন। উহার সারাংশ শ্রীযুত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিলাম—"মীনা, মসন্দিরা ধীরমলিয়া এবং রামরিয়া দলভুক্তদিগের সহিত এবং কন্যাহত্যাকারিদিগের সহিত মিশিবে না। বেশ্যাগমন বা দ্যূতক্রীড়া করিবে না। গুরুবাণী নিত্য পাঠ করিবে, 'সেবা, ভক্তি প্রেম মন ধারণা' অর্থাৎ মনে সেবা ভক্তি প্রেম ধারণা করিবে। জপজী (নানকের কৃত প্রধান মন্ত্র) জাপজী (গোবিন্দকৃত প্রধান মন্ত্র) আনন্দজী, রহরাস, আরতি এবং কীর্ত্তন এই ছয়টী প্রত্যহ পাঠ করিবে। কাম, ক্রোধ, মিথ্যা, কুতর্ক এবং জবাই-করা মাংস ত্যাগ করিবে। তামাক এবং যবনের হাতের মদ্য ও মাংস নিষেধ জানিবে; পাঁচ কক অর্থাৎ কেশ, কৃপাণ, কাঙ্গা (চিরুণী) কচ্ছ (ছোট টিলে ইজের) এবং কড়া (লোহার বালা) সর্ব্বদা নিজ নিজ অঙ্গে রাখিবে। সৎপথে ব্যবসায়াদি করিবে। পরস্পর সহোদর ভ্রাতার ন্যায় প্রীতি রাখিবে। গুরু-নিন্দুককে মারিয়া ফেলিবে। গুরুগ্রন্থ প্রত্যহ পাঠ করিবে এবং উহাকে গুরু স্বরূপ জানিবে। প্রত্যহ শস্ত্রাভ্যাস রাখিবে। তুর্ককে বিশ্বাস করিও না।

কোন শিখকে অর্দ্ধেক নামে ডাকিবে না, মন হইতে কাতরতা ত্যাগ করিবে। যোদ্ধার বাহুবলের উপর ইহ পরলোকের সুখ নির্ভর করে জানিবে। মত বা মনের আদর্শ উচ্চ, কিন্তু মন নম্র রাখিবে। কবরাদির পূজা করিবে না। তরবারিই প্রধান সহায় জানিবে।"

অনেকে বলেন গুরুগোবিন্দ জাতিভেদ প্রথার একান্ত বিরোধী এবং হিন্দু দেবদেবীতে একান্ত আস্থাহীন ছিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটীর মীমাংসা আমরা ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছি সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইবার প্রথম উক্তিটী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। গোবিন্দসিংহের কার্য্যাবলীর আলোচনা করিয়া ইহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি যে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল - একটী সামরিক জাতি গঠন করা; সুতরাং ঐ কার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি সামাজিক জাতিভেদের কঠোরতা একটু শিথিল করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পহল বা সংস্কারের সময় জাতিভেদের কোন কথাই উঠে নাই। পরবর্ত্তী একটী ঘটনা হইতে ঐ প্রশ্ন উত্থিত হয়; এক সময়ে গোবিন্দসিংহের তরবারির কোষবন্ধনের নিমিত্ত সূতার প্রয়োজন হইলে গুরু নানা অনুসন্ধানের পর উহা না পাইয়া বড় ব্যস্ত হন। তাঁহার সম্মুখে দয়াসিং দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি গুরুর অসুবিধা বুঝিয়া আপন যজ্ঞসূত্র ছেদন করিয়া ঐ কার্য্যের জন্য প্রদান করেন। তৎপরে অন্য কর্ত্তৃক যজ্ঞসূত্র পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে তিনি বলেন—যাহা শ্রীগুরুকে সমর্পণ করিয়াছি তাহা আর ফিরাইয়া লইব কিরূপে? ইহা হইতে কথঞ্চিৎ বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রীগুরু দয়াসিংহের অসামান্য ভক্তি ও অনুরাগ দেখিয়া উহাতে কোনরূপ দ্বিরুক্তি করেন নাই। প্রধান কথা এই—তিনি সর্ব্বদা অধিকারীভেদ মানিয়া চলিতেন। দয়াসিংহের ন্যায় পুরুষপ্রবরের জাতিভেদ মানিয়া চলার কোনই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিতে কখনও উপদেশ দেন নাই। এমন কি ম্যালকম প্রভৃতি

ঐতিহাসিকগণের মতে শ্রীগুরুর পুত্রগণ সর্ব্বদাই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকিতেন—পিতা উহাতে কোনদিনই আপত্তি তুলেন নাই। যাহা হউক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে তিনি শিষ্যনির্ব্বাচনে জাতিবিচার মানিয়া চলিতেন না।

'দশম বাদ্শা কী গ্রন্থ্' পুস্তকে শ্রীগুরুর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অভিমত এবং আত্মজীবনের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা পূর্ব্ব-পুস্তকের ন্যায় ছন্দে লিখিত হয়। দুই তিন রকম ভাষার সংমিশ্রণে ইহা রচিত; প্রথমাংশ হিন্দীতে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশ যথাক্রমে,—পারশী ও গুরুমুখীতে। এই গ্রন্থ সর্ব্বশুদ্ধ ষোড়শ ভাগে সম্পূর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া গোবিন্দসিংহ বাল ও শ্যাম নামক তদীয় শিষ্যদ্বয় হইতে সাহায্য পান।

শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি বাবুর পুস্তক হইতে উহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইল।

(১ম) প্রথমাংশেই 'জাপজী'—ইহা প্রাতে ভক্তগণ প্রত্যহ শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন। ইহার প্রথম শ্লোকটী এই—

জাপ শ্রীমুখ বাক্ পাদশাহী দশ। ছপে ছন্দ। তৎপ্রসাদ।
চক্র চিহ্ন অর বরণজাত আরপাত নহিন যেঃ।
রূপ রঙ্গ অররেক ভেক কোউ কহ ন শকৎ কেঃ।
অচল মুরত অনুভত প্রকাশ অমিতোজী কহৎ যেঃ।
কোটি ইন্দ্র ইন্দ্রান সাহ সাহান গনিজ্জে।
ত্রিভুবন মহীপ সুর নর অসুর নেত নেত বণতৃণ কহৎ।
তব সর্ব্বনাম কথে কোন কম্মনাম বর্ণাৎ সুমৎ॥ *

* "দশম গুরু শ্রীমুখ-নিঃসৃত জাপ। ইহার ছন্দ ছপে। (হে ভগবান) তব কৃপা। যাহাতে চক্র চিহ্ন বর্ণ জাতি অথবা শ্রেণী নাই, রূপ রং নির্দ্দিষ্ট রেখা ও শ্রেণী যাহার কেহ বলিতে পারে না, (যাঁহার মূর্ত্তি) নির্ব্বিকার, (যিনি) অনুভব দ্বারা প্রকাশ, (যাঁহার) বল পরিমাণ করা যায় না, কোটি ইন্দ্রের ইন্দ্র, সম্রাটের সম্রাট যাঁহার গুণ গান করে, ত্রিভুবনের ঈশ্বর দেব, মানব, অসুর, বন, তৃণ (অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম) যাঁহার গুণ-গান করিতেছে,—আর বলিতেছে কিছুই জানি না—তোমার কি কর্ম্ম কি বর্ণ বলিবার ক্ষমতা নাই।"

(২য়) 'অকালস্তুতি' অর্থাৎ ভগবানের স্তব। প্রাতে পাঠ্য—
ইহার প্রথমাংশ এইরূপ—

"প্রণমো আদি এক ও কারা! জল স্থল মই অল কিও পসারা॥
আদি পুরুখ অবগৎ অবনাশী। লোক চতুর্দ্দশ জ্যোৎপ্রকাশি॥
হস্তি কীটকে বিচ সমানা। রাও রঙ্ক যেহ একসব জানা॥
অদৈ অলখ পুরুখ অবগামী। সব ঘট ঘটকে অন্তরজামী॥
অলক্ষ্য রূপ অচ্ছ অনভেখা। রাগ রঙ্গ জেহ রূপ না রেখা॥
আদি পুরুখ অদৈ অবিকারা। বরণ চিহন সভহুতে নিযারা॥
বরণ চিহন জিহ জাত না পাতা। শক্র মিত্র জিহ তাত ন মাতা॥
সভতে দূর সভন তে নেরা। জল থল মহি অল জাহে বসেরা॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু অন্ত নহি পাএও। নেত নেত মুখ চার বতাএও॥" +

(৩য়) "বিচিত্র নাটক" (বা অদ্ভুত কথা)—ইহা চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। দুষ্ট দমনের জন্যই গুরুর আবির্ভাব—এই সঙ্গে আত্ম-পরিচয় সঙ্ক্ষেপে দিযাছেন। চতুর্থ হইতে একাদশ,—এই আট অংশে পুরাণোক্ত প্রধান কথাগুলি শ্রীগুরু সহজ, সরল গুরুমুখী ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।

(৪র্থ) "চণ্ডী চরিত্র"—ইহার দুই ভাগ। প্রথমভাগ প্রায় মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসারেই লিখিত। ইহাতে মধুকৈটভ, ময়াক্ষুর, ধূম্র-লোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ, শুম্ভ, তিতান প্রভৃতি দৈত্যবধের

+ "আদিতে আমি সেই এক ওঁকাররূপী ব্রহ্মকে নমস্কার করি, যিনি জল স্থল ত্রিভুবন ব্যাপিয়া আছেন, চতুর্দ্দশ লোকে যাঁহার জ্যোতি প্রকাশ করিতেছে; সেই অনাদি পুরুষ যাঁহার গতি বুঝা যায় না। হস্তী কীটমধ্যে যিনি একরূপে বিরাজমান আছেন, এবং প্রতি জীবের অন্তরের ভাব যাঁহার অবিদিত নাই। যাঁহার রূপ দৃষ্টি-গোচর হয় না, কেবল অনুভব দ্বারা কল্পনা করা যায়। যিনি বর্ণ চিহ্ন জাতি বা শ্রেণী রহিত এবং যাঁহার কেহ মাতা বা পিতা নাই, যিনি সকলের অতি দূরবর্ত্তী আবার নিকটেরও নিকট জল স্থল স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন; ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁহার অন্ত পান না, চতুর্মুখে ব্রহ্মা নানাপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন" ইত্যাদি।

"শিখেরা বলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তিনি কেবল নামের মহিমা দ্বারাই এই কলিযুগে জীবের উদ্ধারের কর্ত্তা বলিয়া নিজ শিষ্যগণকে প্রেমভক্তিযুক্ত মনে পর-ব্রহ্মের উপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন।"

কথাও আছে। (৫ম) "চণ্ডীচরিত্র"—প্রধানতঃ প্রথম ভাগেরই কথা—কেবল ছন্দের পার্থক্য। (৬ষ্ঠ) "চণ্ডী কি বার"—চণ্ডীর কথার শেষ ভাগ। ইহাও ভগবতী স্তুতি। (৭ম) "জ্ঞান প্রবোধ"—শ্রীভগবানের স্তব। (৮ম) "চৌপাইন চৌবিষ অবতারন্ কীয়ান্"—অন্যান্য অংশের তুলনায় ইহার কলেবর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বলিতে হইবে। তৎশিষ্য শ্যাম লিখিত। ইহাতে ভগবানের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি চতুর্বিংশতি অবতার-লীলা বর্ণিত আছে। (৯ম) ইহাতে মেহেদী মীরের কথা আছে—ইনি কল্কি অবতারের সহিত আবির্ভূত হইবেন বলিয়া বর্ণিত। কাহারও মতে আখ্যান-ভাগ শিয়া মুসলমানদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত। (১০ম) ইহাতে ব্রহ্মার বাল্মীকি, ব্যাস কুলদাস, যড়ঋষি, কচ্ছপ, শূকর, বাচেস এই সাত অবতারের এবং মনু, পৃথু, সগর, বেন, মান্ধাতা, দিলীপ, রঘু এবং উজ এই আটজন প্রাচীন নৃপতিদিগের বিবরণ পাওয়া যায়। (১১শ) রুদ্রের দত্ত এবং পরেশনাথ এই দুই অবতারের কথা। (১২শ) "শস্ত্রমালা"—বিভিন্ন অস্ত্রগুলির নাম ও তাহাদিগের প্রত্যেকের গুণকীর্ত্তন। (১৩শ) "শ্রীমুখ বাক্য সওয়া বত্রিশ"—ইহা বেদ, পুরাণ ও কোরাণ সম্বন্ধে লিখিত। তিনি ইহাতে আপাত ঐ সকল ধর্ম্মপুস্তক-গুলির নিন্দাবাদ করিতেছেন বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ অহঙ্কারি-দিগেরই নিন্দা করিয়াছেন। (১৪শ) "হাজারে শব্দ"—এক সহস্র শব্দের ছন্দ। প্রধানতঃ শ্রীভগবানের ও তাঁহার অদ্ভুত সৃষ্টি-চাতুর্য্যেরই গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। (১৫শ) "স্ত্রীচরিত্র"—৪০৪টী গল্পের সমষ্টি। স্ত্রীচরিত্র বুঝাইবার জন্যই ইহা লিখিত হয়। একটী গল্প এইরূপ—এক রাজার দুই বিবাহ হয়। প্রথম পত্নী সপত্নীপুত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পুর্ণ না হওয়াতে তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা গ্লানি ও কুৎসা প্রচার করিয়া রাজার মনহরণ করেন। অবশেষে রাজাজ্ঞায় সেই নির্দ্দোষ যুবক নিহত হন। শিখেরা বলেন গোবিন্দসিংহ এই উপন্যাস লক্ষ্য করিয়া শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দেন—যে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও চরিত্র

বুঝিয়া উঠা ভার। তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেন যেন স্ত্রীশক্তির কুহকে তাহারা কখনও না পড়ে। এবং বলেন স্ত্রীসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। (১৬শ) শেষাংশের নাম "হিকায়ৎ"—পারস্য ভাষায় গুরুমুখী অক্ষরে বারটী গল্পের সমষ্টি। এগুলি সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতি বিদ্রূপোক্তি।

যাহা হউক, সংস্কারকার্য্য শেষ করিয়া অতঃপর শ্রীগুরু শক্তিসঞ্চয়ে মনঃসংযোগ করিলেন। তিনি একটী আদেশ প্রচার করেন যে পাঞ্জাবপ্রদেশের কোন গৃহে চারিজন কর্ম্মপটু বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকিলে অন্ততঃ দুইটীকে তদীয় সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। এইরূপে প্রায় আশিহাজার সৈন্য সমবেত হয়। তিনি উহাদিগের সমুচিত শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেন—তাহাদিগের দৈহিক উন্নতিবিধান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। নৈতিক উৎকর্ষলাভের উপযুক্ত শিক্ষাও উহার সহিত প্রদান করেন। শ্রীভগবানের উপর যাহাতে তাহাদিগের প্রগাঢ় ভক্তি থাকে, যাহাতে তাহারা আপনা-দিগকে তাঁহার যন্ত্র-স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই জন্য বিশেষ উপদেশ দেন। অধিকন্তু খালসার উপর যাহাতে তাহাদিগের আস্থা বলবতী থাকে তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন লন। খালসার প্রতি তাঁহার এইরূপ উপদেশ ছিল—

খানা খাওয়ে ধরমকো করে সাবনে মেল।
তবে খালসা জাপে সোজানে ভারত পেল॥

অর্থাৎ ধর্ম্মপথে থাকিয়া পরিবার পোষণ করিবে এবং সারবান লোকের সহিত মিলিবে; তবে খালসার উন্নতি ভারতে প্রকাশ হইবে। এইভাবে তাঁহার সংস্কারের ফলে সমগ্র শিখজাতি এক অচ্ছেদ্য সাম্য ও মৈত্রীর সূত্রে আবদ্ধ হয় অবিলম্বে শিখসমাজে নূতন উদ্যম ও সাহসিকতা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তাহারা চরিত্রবলে বলীয়ান হইয়া অনেক অদ্ভুত ও অসামান্য কার্য্যসাধনে কৃতকার্য্য হইল। মধ্যযুগে নবোদ্ভূত ইউরোপীয় বীরসঙ্ঘের (Knights) ন্যায় ইহারাও অসহায় ও বলহীনের একমাত্র সহায় ও অবলম্বন হইয়া সর্ব্বত্র আপনাদিগের মহিমা প্রচার করিতে লাগিল।

এইবার মোগলদিগের সহিত সাক্ষাৎভাবে শিখগুরুর বিবাদ বাধিল। এতদিন মোগল-সম্রাট্ পার্ব্বত্য নৃপতিবৃন্দকে গোপনে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন কিন্তু অধুনা গুরুর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সন্দর্শনে আওরঙ্গজেবের হৃদয় ঈর্ষাভিভূত হইল—তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রথম প্রয়াসে বাদ্‌সা, সৈয়দখাঁ নামক জনৈক ব্যক্তির সেনাপত্যে একটী বিশাল বাহিণী প্রেরণ করিলেন কিন্তু ঐ ব্যক্তি সম্রাটের সহিত বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় আচরণ করিল; সৈয়দখাঁ অবশেষে তাহার সাহায্যদাতাকে প্রতারিত করিয়া শিখদিগের দলভুক্ত হইয়া গেল। তর্দ্দশনে বিশেষ কুপিত হইয়া সম্রাট দ্বিতীয়বার সুদক্ষ সেনাপতি উজীর খাঁকে আনন্দপুর অধিকার এবং গুরুকে পরাজিত করিতে প্রেরণ করিলেন। উক্ত আদেশ মত উজীর খাঁর সৈন্য আসিয়া অবিলম্বে আনন্দপুর অবরোধ করিল। এবার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া দ্বাবিংশসংখ্যক পার্ব্বত্যরাজ স্ব স্ব সৈন্য লইয়া মোগলদিগের সহিত যোগদান করিল। গোবিন্দসিংহ উহা দেখিয়া অবিলম্বে আপন সৈন্যসমাবেশ করিলেন। অবরোধ কার্য্য বহুদিন চলিল—উভয় পক্ষই সবিশেষ বীরত্ব ও সহিষ্ণুতা দেখাইল—কাহারা জয়বান হইবে তাহা প্রথমে কেহই নিরূপণ করিতে পারিল না। মোগলদিগের বিপুল বাহিনী প্রভূত অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ লইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। একপক্ষে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের সমবেত-শক্তি এবং অপর পক্ষে সামান্য একটী প্রদেশের ক্ষুদ্র শক্তি— উভয়ের তুলনা করিলে বহু পার্থক্য মিলিবে। অল্পসংখ্যক শিখসৈন্য অধিক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না, অবশেষে শক্র কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া আনন্দপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। গোবিন্দসিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া অনুচরদিগের সহিত কীর্ত্তিপুর ছাড়াইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তদীয় জননী ও অবশিষ্ট সন্তানদ্বয় একাকী পরিত্যক্ত হইয়া সিরহিন্দ সহরেই এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় লন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে

বিপদ-সঙ্কুল সর্পগৃহে আশ্রয় লইয়া তাঁহাদিগকে প্রাণ হারাইতে হইবে ; ঐ নীচ স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি উহাদিগের সহিত যাহা কিছু অর্থাদি ছিল তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইল অধিকন্তু মোগলের হস্তে উহাদিগকে সমর্পণ করিয়া দিল। তৎপরে যাহা হইবার—মুসলমান-দিগের হস্তে যুবকদ্বয়ের অপমৃত্যুর বিবরণ সকলেরই বিদিত আছে,—কিরূপে মুসলমানগণ বালকদিগকে মৃত্যুভয় দেখাইয়া স্বধর্ম্মত্যাগ করিতে বলিল এবং তাহারা কিরূপ সাহসভরে ঘোর অসম্মতি প্রকাশ করিল এবং পিতার খ্যাতি অকলঙ্ক রাখিয়া সহাস্যবদনে মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া লইল।

সিরহিন্দের এই লোমহর্ষক সংবাদ শ্রবণে গুরুর হৃদয় ঈর্ষ্যানলে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তখন জাঠপুর নামক গ্রামে বসবাস করিতে-ছিলেন ; তৎপরে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া দিনা নামক গ্রামে যান। তথায় বহুদিবস যাপন করেন। এইখানেই তিনি সম্রাট আও-রঙ্গজেব লিখিত 'পরওয়ানা' প্রাপ্ত হন—তাহার অনুবাদ স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। - "কোরাণের দিব্য লইয়া বলিতেছি, এই পরওয়ানা দেখিয়া সত্বর আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে। নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে। আমি সজোরে তোমায় ধরিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইব। যখন ধরিব তখন জিজিয়া দ্বিগুণ করিয়া বসাইব। তখন হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া আমার ধর্ম্ম ধরিবে এবং ইহলোকের মধ্যে কলমা পরিবে। যে কোরাণ পড়িবে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব। তাহার সাক্ষী দেখ কাশ্মীরের পণ্ডিতগণের কি দশা করিয়াছি। আমি এমন এক বাজপক্ষী পাঠাইব যে তুমি তাহার নিকট চড়াইপক্ষী হইয়া যাইবে।"

ঐ অবজ্ঞা-জ্ঞাপক পত্রের কিরূপ উপযুক্ত উত্তর গোবিন্দসিংহ দিয়া-ছিলেন তাহা পাঠ করিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ের অবধি থাকে না। শ্রীগুরু লিখিতেছেন—

সৎগুরু সচে পাদশা পড়েয়া পরোয়ানা।
লিখে জবাব এহে ভেজেয়া যো'ব সব নামা॥
লিখিয়া সব হকিকত্তা যে সমন নিদানা।
তৈ কসম যো কিতি দাণোদীম দিলে দি জানা॥

তুকর হুঙ্কার যো বোলেয়া নাপাগ জবানা।
যে সাহেব কিড়ি বলধরে ফিল উসদা খানা ॥
মত্র পাকৃড়ি ওট অকালদি কোই হোয়না জানা।
যে আয়া হুকুম অকালদা হাত বন্ধা গানা ॥
মত্র পাস্থ করা খালসা বিচ দোহা জাহানা।
সাধা গমে আকিয়া হাকিম সুলতানা ॥
ছন্দ পবেগা মুলুক বিচ কেয়া আপন বেগানা।
আন্দাগে চলেন্‌গে মারা মোগল পাঠানা ॥
দোহাই দেন অশনদি মোহে যায় নিধানা।
মার দুর কারঙ্গা সরান্ন যায় সুন্নত এ মানা ॥
চিড়িয়া মারণ গজনু কর খাভুন তামা। ইত্যাদি।

অর্থাৎ—"সৎগুরু সচ্‌বাদসা গুরুগোবিন্দসিং উক্ত পরওয়ানা পাঠ করিয়া যথাযথ উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, যথা—তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা বুঝিয়াছি। তুমি যে শঠতা করিবার মানসে দিব্য গালিয়াছ, তোমার সে মনও জানিতে পারিয়াছি। তুমি অহঙ্কার-বশতঃ যে সকল বৃথা কথা বলিয়াছ, সে বিষয়ে জানিও, যদি ভগবান কীটকে বল দেন, তবে সে হাতীকে খাইতে পারে। আমি একমাত্র অকাল পুরুষের আশ্রয় লইয়াছি আর কিছু জানি না। যখন অকাল পুরুষের হুকুমে আসিয়াছি, তখন যুদ্ধের তাগা হাতে বাঁধিয়াই বসিয়া আছি। (তুমি যেমন ইহপরকালের মধ্যে কলমা পরাইতে চাও তেমনিই) আমি ইহপরলোকের জন্য খালসা পন্থ চালাইয়াছি। ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে বৈরীদিগকে দণ্ড দিব। তখন আপন পরের মধ্যে সমস্ত দেশে একটা ধূম পড়িয়া যাইবে। তখন বারুদ না গাদিতেই গোলা চলিয়া মোগল-পাঠান মারিবে। তখন উহারা (মোগল পাঠানেরা) অকাল পুরুষের দোহাই দিবে। আমি তোমার সুন্নত কোরাণের ধর্ম্ম মারিয়া দুর করিব। তখন চড়াই বাজকে আপন ভক্ষ্য জানিয়া মারিবে।"

এই পত্রপাঠ করিলেই আমরা গোবিন্দসিংহের অপূর্ব্ব চরিত্রের অনেকটা আভাষ পাইতে পারি। তাঁহার অসীম সাহসিকতা ও

আত্মবলের ইহাই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যাহা হউক, ঐ পত্র প্রেরণের পর বেশীদিন আর গুরু ঐ স্থানে সুস্থির ভাবে থাকিতে পারেন নাই। মোগলসৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। উহা দেখিয়া তিনি আরও পূর্ব্বাভিমুখে সরিয়া যাইলেন। বাঘুর নামক স্থানে পৌঁছিবামাত্র তিনি শুনিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হইয়াছে। উহার পর তিনি কিয়ৎকাল নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে সম্রাটের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণ সিংহাসন লাভের আশায় পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে জ্যেষ্ঠপুত্র বাহাদুর শাহই ভারত-সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন। হিন্দু মুসলমানে এতদিন যাবৎ যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছিল তাহা আওরঙ্গজেবের মৃত্যুতে এবং বাহাদুরের পদপ্রাপ্তিতে অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। নূতন নবাব দেখিলেন তিনি পিতৃ-পন্থা অনুসরণ করিলে বিপদ্গ্রস্ত হইবেন, সুতরাং উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

বাহাদুরশাহ শিখগুরুর সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রথমে উহাতে গোবিন্দসিংহ কোন প্রকার দ্বিধা বোধ না করিয়া সম্মতিদান করেন কারণ তিনি বাহাদুরশাহ কিরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন তাহা জানিতেন। উহার পর বাদশা দাক্ষিণাত্যে শত্রু দমনার্থ প্রায় পঞ্চসহস্র অশ্বসৈন্যসহ গোবিন্দসিংহকে সেনাপত্যে বরণ করিয়া লইয়া যান। তৎপরে গোদাবরী তীরস্থ নান্দোর গ্রামে পৌঁছিলে একজন পাঠান দস্যুকর্তৃক গুরু ভীষণভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন। উহাই অবশেষে তাঁহার জীবননাশ করে।

এইভাবে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জীবনের সকল আশা ভরসা পরিত্যাগ করতঃ শ্রীগুরু সবিশেষ মনক্ষোভে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বংশীয়দিগের মধ্যে সকলেই ইতঃপূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—তিনিই কেবলমাত্র দীপাধারের শেষশিখার ন্যায় নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। তদীয় মৃত্যুর পর কে আবার শিখদিগের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবে, 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'রূপ মহামন্ত্র সাধনের সুযোগ্য ব্যক্তি কোথা হইতে মিলিবে, এই

সকল চিন্তায় তিনি একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, অবশেষে মাধবদাস বা বৈরাগী বান্দা নামক এক ব্যক্তি ঐ কার্য্যভার লইয়া তাঁহার নিরাশমনে কতকটা আশার সঞ্চার করিল। এই বান্দার প্রকৃত জীবনেতিহাস সম্বন্ধীয় সকল তথ্য অবগত হওয়া যায় না; প্রায় সকলেই ইঁহার জীবনের সহিত কতকগুলি অলৌকিক ঘটনাবলী সংশ্লিষ্ট কবিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন ইনি পূর্ব্বে আচার্য্য শ্রীরামানুজের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, যাহা হউক উহার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা একান্ত অজ্ঞ। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে বান্দা এক জন যোদ্ধনিপুণ প্রকৃত বীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীগুরুর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি আপনার জীবন সার্থক জ্ঞান করিলেন কিন্তু গোবিন্দাসিংহের ন্যায় অসীম প্রভুত্বশক্তি না থাকাতে তিনি শিখ-জাতির পূর্ব্বতন ঐক্যতা রক্ষা করিতে পারেন নাই সেই জন্যই তাঁহার সময়ে শিখজাতি কয়েকটী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইযা যায় এবং উহা-দিগেব মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর একান্ত অভাব হইযা উঠে। যাহা হউক, শ্রীগুরুর জীবদ্দশায় তিনি প্রথম প্রথম মোগলদিগের বহু গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করিয়া এবং অন্যান্য উপাযে উহাদিগকে নানাভাবে নির্য্যাতন করিলেন। সিধোরা, সিরহিন্দ প্রভৃতি স্থানে তাঁহার অত্যাচারে সকলেই বিপর্য্যস্ত হইল। সকলে মিলিযা সম্রাট বাহাদুরশাহের নিকট ঐ বিষয় উত্থাপন করিলে তিনি স্বযং উহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া গুরুর নিকট তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। যাহা হউক এ বিষয়ে যখন আন্দোলন চলিতেছিল তখন শ্রীগুরুর জীবনীশক্তি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। তিনি মৃত্যুশয্যায় শিষ্যদিগকে যে সকল অমূল্য উপদেশাবলী দান করেন তাহা শিখ ধর্ম্মগ্রন্থাবলীতে লিখিত আছে।

আজ ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি। বোধ হইল যেন চারিদিক ঘোর তমসাবৃত, সকলই নিরর্থক, নিরানন্দময়। শ্রীগুরুর জ্বালা যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়িতে দেখিযা শিষ্যগণ বুঝিল তাঁহার মৃত্যু আসন্ন। তজ্জন্য তাহারা একান্ত শোকাভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল—শিশু যেমন মাকে মারতে দেখিলে আপনাকে

হতভাগ্য ভাবিয়া অনুক্ষণ ক্রন্দন করিতে থাকে—তাহার শোকাবেগ কিছুতেই উপশমিত হয় না, শিখভক্তগণও তদবস্থ প্রাপ্ত হইল। শ্রীগুরু ধরাধাম হইতে চলিয়া যাইতেছেন—তাহাদিগের ভাগ্যে কি হইবে? কাহার অমিয়-মাখা সান্ত্বনাবাক্যে তাহারা আশ্বস্ত হইবে? কে তাহাদিগকে বিপদে প্রফুল্লতা, কর্ত্তব্যে একাগ্রতা এবং দৈন্যে আত্মবিশ্বাস শিক্ষা দিবে? শ্রীগুরু বলিলেন—

শ্রীগুরু গোবিন্দ সিং উপরে। শুন খালসা তুম মম প্যারে।
নেত রচি পরমেশর যৈ সে। ভূত ভবিখ্য মিটে সো কৈসে॥

—শুন খালসা। তোমরা আমার অতি প্রিয়; পরমেশ্বর যেরূপ নীতি রচিয়া ভূত ভবিষ্যত চালাইতেছেন সেইরূপ চলিবে।

যাহা হউক, মধ্যরাত্রে চিতাগ্নি প্রজ্জলিত হইলে—শ্রীগুরু চিতারোহণ করিলেন; অবিলম্বে তদীয় স্থূলদেহ ভস্মাবশেষে পরিণত হইল। ভক্তগণ সমস্বরে—"ওয়া গুরু জীকা খালসা।"

ওয়া গুরু জীকা ফতে"—ধ্বনিতে নভস্তল বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। ভারতজননীর শ্রেষ্ঠ সন্তান ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু মাতা সন্তানকে ভুলেন নাই—তাই তাঁহার গৌরব-স্মৃতি আজিও আপন অঙ্গভূষণ করিয়া রাখিয়াছেন।

দশম গুরু শ্রীগোবিন্দসিংহের দেহাবসানের সহিত সেই যুগ যুগ স্থায়ী গুরুপদ চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইল। প্রথম কারণ—তাঁহার বংশলোপ; দ্বিতীয় কারণ সুযোগ্য, শক্তিশালী ব্যক্তির অভাব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অতঃপর শিখজাতি কয়েক জন নেতার অধীনে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইহার ফলে পূর্ব্বের সেই সংহত, অতুল শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়—গৃহবিবাদ ও ভ্রাতৃবিদ্বেষ তাহাদিগের পতনের মূল কারণ। এইভাবে বহুবর্ষ যাপনের পর তাহারা আর একবার পাঞ্জাবকেশরী মহামান্য রণজিৎ সিংহের অধীনে আবার সেই লুপ্ত-সৌভাগ্য ফিরিয়া পাইয়াছিল কিন্তু ইহাও বহুকাল স্থায়ী হয় নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই, আসুন পাঠক! আমরা সভক্তিহৃদয়ে প্রাচীন ভারতের এই দশ জন গুরুর শ্রীচরণে প্রণত হই, ইঁহাদিগের

অপূর্ব্ব জীবনী ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা বিস্ময়াপ্লুত হইয়াছি। ধর্ম্মপ্রাণ জাতি ক্রমশঃ কালের গতিতে কিরূপে সৈনিক জীবন আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহার বিবরণ যুগে যুগে ভারতেতিহাসের একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনারূপে সর্ব্বত্র পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। অধুনা এই বিষয়টী আলোচনা করিতে যাইয়া ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম পন্থীরা বলিয়া থাকেন গুরু গোবিন্দসিংহ সামরিক শিক্ষার উপর অত্যধিক প্রাধান্য স্থাপন করিয়া শিখজাতির প্রবল অনিষ্টসাধন করিয়াছেন—তাহাদিগের মহাপতন হইয়াছে অপর দল বলেন—"তোমরা ভুল বুঝিতেছ। গোবিন্দসিংহ শিখদিগকে নৈতিকশিক্ষাও দান করিয়াছিলেন, ইহা ভুলিও না। তবে তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা কতকটা সত্য। তিনি শিখজাতিকে সামরিকশিক্ষাই মুখ্যতঃ দেন, তবে এটা মানিব না যে, এতদ্দ্বারা তিনি কোনরূপ দূষণীয় কার্য্য করিয়াছেন,—শিখজাতির পতন হয় নাই" এ বিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে একটী কথা পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি—এ বিবাদ মিটিবার নহে। এতৎ সম্বন্ধে কোন মতামত দান করা বিচার সাপেক্ষ। তবে আমরা এইটুকু বলিতে ইচ্ছা করি যে গুরু নানকের অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিকতারূপ মাপকাটী দিয়া বিচার করিতে হইলে বলিতে হইবে—শিখজাতির ক্রমোন্নতি না হইয়া ক্রমাবনতিই হইয়াছিল। পাঠক দেখিয়াছেন গুরু অর্জ্জুনের সময়েই উহার প্রথম ইঙ্গিত হয়। তৎপরে ক্রমশঃ কিরূপ আকার ধারণ করিল তাহাও আলোচিত হইয়াছে। ইহা বলিলে কেহ যেন না বুঝেন যে পরবর্ত্তী গুরুগণ সকলেই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি একান্ত উদাসীন ছিলেন, তবে আমাদের বক্তব্য এই যে তাঁহারা পূর্ব্বের সেই উচ্চাদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই—উহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই মাত্র। গুরু গোবিন্দসিংহের নৈতিক ও সামরিক উভয় উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে, আবার বলি, বিধাতার নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিবে কে? শিখজাতি গোবিন্দসিংহের নেতৃত্বে সামরিক শিক্ষায় সবিশেষ অভ্যস্ত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়, বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে তাহারা বৃটিশপতাকার অধীনে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া আপনাদিগের সেই অতীত সাহস ও পরাক্রম, তেজস্বিতা ও পারদর্শিতার পরিচয় প্রদানে সমগ্র ভারতের মুখোজ্জ্বল করিতেছে। (সমাপ্ত)

উত্তরবঙ্গে বন্যা।

কার্য্যবিবরণী ও আবেদন।

আত্রেয়ী নদীর প্লাবনে রাজসাহী ও বগুড়া জেলার জনসমূহ যে দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রত্যহই সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের মিশনের যে সকল সেবকগণ তথায় সেবা করিতে গিয়াছেন তাঁহারা যে সংবাদ আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন তাহা আরও হৃদয়-বিদারক। রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমা ও পার্শ্ববর্ত্তী বগুড়া জেলার কতক অংশ এই আকস্মিক বন্যা দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সমস্ত প্রদেশ প্রায় একরূপ জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামগুলি এইরূপ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহাদের পূর্ব্বসংস্থান নিরূপণ করা এখন অসম্ভব। শতকরা ৮৫ খানির উপর বসতবাড়ী বন্যার প্রকোপে জলমগ্ন হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এখনও ৩।৪ ফুটের উপর জল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নৌকা ব্যতীত গমনাগমন করা যায় না—অথচ নৌকাও মেলে না। গ্রামবাসিগণ গৃহ গ্রামাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিবার পরিজন, গরু বাছুর ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া নিকটবর্ত্তী উচ্চভূমি ও রেল লাইনের উপর আশ্রয় লইয়াছে। তথায় ঘাস প্রভৃতির চালা প্রস্তুত করিয়া কোনরূপে মাথা গুজিয়া দিনযাপন করিতেছে। স্থানীয় রিলিফ কমিটির জনৈক সেবক একস্থানে বিঘাপরিমাণ স্থানের উপর ৩০০ শত জন হিন্দু ও মুসলমানকে ১০০ শত গরুসহ আশ্রয় লইতে দেখিয়াছেন। ইহার উপর বস্ত্রাভাবে নগ্ন ও আচ্ছাদনবিহীন ব্যক্তিও চারিদিকে দেখা যাইতেছে। গরু মহিষ ইত্যাদি গৃহপালিত পশুগণও খাদ্যাভাবে মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকল ব্যক্তিকেই খাদ্য ও বস্ত্র সাহায্য করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নওগাঁ থানা ব্যতীত আমরা ইতিপূর্ব্বে নওগাঁ মহকুমার রাণীনগর ও নন্দনালী নামক থানা দুইটীতে সাহায্য করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি। রাণীনগরে ৪টী কেন্দ্র খোলা

হইয়াছে। উক্ত কেন্দ্র চাবিটী হইতে ও নন্দনালী থানার কেন্দ্র হইতে দুএকদিনের মধ্যেই চাউল ও বস্ত্র বিতরিত হইবে। নওগাঁ থানায়ও শীঘ্র বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। বিতরণের বিস্তারিত বিবরণ আমরা সত্বর সাধারণের গোচর করিব। সর্ব্বসমেত আমাদিগকে ৭০০ শত খানি গ্রামের অধিবাসিগণকে সাহায্যদান করিতে হইবে। আমাদের সেবকগণ অনুমান করেন ইহাতে কমপক্ষে মাসিক ৬০০\ হাজার টাকা খরচ পড়িবে। আমরা আশা করি সাধারণের সহানুভূতিতে অর্থের অনটন হইবে না।

বন্যাক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা ৯০ জন মুসলমান, বাকি হিন্দু। আমরা বরাবর জাতিবর্ণ ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই সেবা করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণেও উহার কোনও বিরুদ্ধাচরণ হইবে না। কিন্তু বন্যাক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অবস্থা এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে যদি তাহাদিগকে আশু সাহায্যদান না করা যায় তাহা হইলে পরিণামে যে অতি শোচনীয় হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেইজন্য আমরা সহৃদয় সাধারণের নিকট বিশেষতঃ মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। সকলের নিকট আমাদের সানুনয় অনুরোধ তাঁহারা যেন সাহায্যদানে কালবিলম্ব না করেন। যে কোনরূপ সাহায্য অর্থ বা বস্ত্র নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

(১ সেক্রেটারী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

(২) প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, মঠ বেলুড়, পোঃ আঃ বেলুড়, হাওড়া।

(স্বাঃ), সারদানন্দ

সেক্রেটারী শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন।

৩১শে ভাদ্র, ১৩২৫ কলিকাতা।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

বস্ত্রসাহায্য কার্য্য।

বেলুড় মঠে প্রাপ্ত।

(৩রা আগষ্ট হইতে)

ধ্রুবলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	৩৲
নরেন্দ্রভূষণ দত্ত, চট্টগ্রাম	৩৲
শ্রীমতী প্রমোদাবালা দাস গুপ্তা, সন্দীপ	৩৫৲
অনুপম রায়, কলিকাতা	৫৲
কুমুদবন্ধু দত্ত, শ্রীহট্ট	২৲
ভূপেন্দ্র কুমার বসু, কলিকাতা	৫৲
A Friend, কলিকাতা	৫৲
সতীশ চন্দ্র সেন, বগুড়া	১৭৲
চারুচন্দ্র দাস, কলিকাতা	২৲
ফকির চন্দ্র নাগ, কলিকাতা	১০৲
প্রসন্নকুমার ঘোষ, ময়মনসিংহ	২৫৲
এম, এস, এন, পিলে, কাইকালাটু	১০৲
তারাপদ ব্যানার্জী, ধুবড়ী	৩৲

উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত।

(১৩—৮—১৮ হইতে)

পি, বসু, কলিকাতা	২০৲
এককড়ি ঘোষ, কলিকাতা	১৲
নিত্যলাল মুখার্জ্জী, কলিকাতা	২৲
প্রফুল্লনাথ রুদ্র, বিলাসপুর	৫৲
তারাপদ রায়, পুরী	২৲
উপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, কলসকাটি	২৲
শ্যামাপদ মুখার্জী, কলিকাতা	১৲
A Friend, কলিকাতা	১৷৹
ব্রহ্মচারী গুরুদাস, মায়াবতী	৫৲
শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসী, কলিকাতা	২৫৲
প্রফুল্লকুমার সরকার, ঢেংকানল	৫৲
জি, আর, কৃষ্ণ, মাইদকার	২৲
বেঙ্কট সুব্বা রাও, মান্দ্রাজ	১০৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা	৩০৲
পি, চাটার্জ্জী, কলিকাতা	১০০৲
কানাইয়ালাল কোং, কলিকাতা	১১৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী, কলিকাতা	১০৲
রাধারমণ সেন, গোরক্ষপুর	১৫৲
গোলচাঁদ জৈনা, লাহোর	৫৲
বসন্তকুমার চাটার্জ্জী, লাহোর	১০৲
এল, এম, ঘোষ, কলিকাতা	১৲
ডাঃ অনিলাক্ষ ব্যানার্জ্জী, কলিকাতা	৫৲
গিরিশচন্দ্র চন্দ্রের স্ত্রী, কলিকাতা	২৫৲
নৃত্যলাল মুখার্জ্জী, আলিপুর	৮৲
সিদ্ধেশ্বর মুখার্জ্জী, কলিকাতা	৫৲
ত্রিগুণাচরণ চক্রবর্ত্তী, দীনহাটা	১৲
শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী, মেদিনীপুর	৪
আত্মারাম, সিমলা	৫
শ্রীরাম, ব্যাঙ্গালোর	২৫
এস, পি, নিযোগী, ঘারোয়াল	৪
বালমুকুন্দ, কলিকাতা	২৫৲
লক্ষ্মীনারায়ণ, কলিকাতা	১০০
বি, কে, বোস, নাগপুর	১৫৲
সতীশচন্দ্র সরকার, রেঙ্গুন	২৲
শ্রীমতী নুটু, কলিকাতা	৫৲
রজনীকুমার দে, জলপাইগুড়ি	১০৲
বিজয়কৃষ্ণ পাল, কলিকাতা	৪০০৲
শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী, পাংসা	১০৲
মুডিয়ন, রেঙ্গুন	১৫৲

বেলুড় মঠে প্রাপ্ত।

মাঃ ভূষণচন্দ্র পাল	কাপড়	১০০খানা

উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত।

মেসার্স্ বিজয়রাজ হুকুমচাঁদ	৩৪০খানা
চুণিলাল চাটার্জ্জী, ত্রিপুরা রাজ	১খানা
অজ্ঞাত	২খানা
মধু, কলিকাতা	১খানা
বাবু, কলিকাতা	১খানা
দেবীপ্রসাদ শীল, কলিকাতা	৪০খানা
শুকদেও দাস শিউনাথ, কলিকাতা	৪০খানা
জহরমল সুন্দরমল, কলিকাতা	৬০খানা
হাবি ঝি, ভাটপাড়া	২০খানা

উত্তরবঙ্গে বন্যা কার্য্য।

বেলুড়মঠে প্রাপ্ত।

(১০ই নবেম্বর হইতে)

শ্রীমতী ত্রৈলক্যতারিণী দাসী, ভবানীপুর	১০
কিঙ্করবতী, অনাথআশ্রম	২৷৷০
গোকুল ভাণ্ডার, বালি	৫
সুবোধ চন্দ্র ঘোষ, হাসারা	২৫
মিসেস্ নোভা ফেন উইক ক্রাইষ্ট চার্চ নিউজিল্যাণ্ড	৬৬'৵০
জিতেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলি, কলিকাতা	২৸৶০
কপাটি ক্রীড়ক মণ্ডলী, বালি	৬/০
আর, এন্, পালিত, কলিকাতা	১০৲
আর এন্ সেন, রেঙ্গুন	৯
অনারারি ট্রেজারার ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল, ফ্লাড রিলিফ্ কমিটি কলিকাতা	৬০
অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ সেণ্ট কলাম্বাস কলেজ, হাজারিবাগ	১৪০
হরিহর ভট্টাচার্য্য, বারাসাত	৩১
নির্ম্মলচন্দ্র ব্যানার্জি, কলিকাতা	৪
মোক্ষদা রঞ্জন বিশ্বাস, চাটগাঁ	৩
সুরেন্দ্র নাথ মণ্ডল, দার্জিলিং	২
হরিপদ চৌধুরী, ফরিদপুর	১
টম্সন্ হাই ইস্কুলের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (বালি)	৬৷৷৵০

উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত।

(১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে)

সুরেশচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা	২
হ্যারিসন্ ক্রস্ফিল্ড কোংর কর্ম্মচারিবৃন্দ	২৫
এস পি, চৌধুরী, কলিকাতা	১০৲
মাঃ কে সি, মিত্র কলিকাতা	২৷০
এস, এস, ইস্কুলের ছাত্র ভবানীপুর	১২৩৲
মেসার্স্ বি, কে পাল (ঔষধ বাবদ)	৫০৲
বামনাথ খাচরা, বৈদ্যনাথ	১/০
ঠাকুরলাল কেশবলাল, কলিকাতা	৫৲
টেম্পেল স্কুল অব মেডিসিন, পাটনা	৫০৲
একস, ওয়াই	২৲
গোবিন্দচাঁদ ঘোষ, ভবানীপুর	৫৲
টি্কম দাস, কলিকাতা	৫
নরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা	২
মাঃ বি মৈত্র	১২৷৷৵৫
প্রাণনাথ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহেবগঞ্জ	৫৷/০
উপেন্দ্র নাথ সেন, বরিশাল	২
এ সিমপ্যাথাইজার	২
বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রবৃন্দ, কলিকাতা	১৭৫
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা	২০০০
নটবর মণ্ডল কোঃ	১৮
বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা	১৭৮
প্রভাত চন্দ্র দাস গুপ্ত, ঢাকা	২
এস, রহমান, বাঁকুড়া	১
টি, আহামাদ, বাঁকুড়া	১
শরৎচন্দ্র ব্যানার্জি, রাঁচি	২
শরৎচন্দ্র দত্ত, রাঁচি	২
শশীভূষণ বসাক, কলিকাতা	২০
মাঃ নৃত্যলাল মুখার্জি, বার লাইব্রেরি আলিপুর	৬০
এ সিম্প্যাথাইজার, ভবানীপুর	৫
বেঙ্গল ব্রাদারহুড, ঢাকা	১৪৮০
বি, বি, এইচ ই স্কুল ছাত্রবৃন্দ একবার	১০
পি কে সেন, কলিকাতা	২০
অরবিন্দ চৌধুরী, পেইল গাঁ	১০
নরেন্দ্র নাথ রায়, রাঁচি	২৫
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, মাঃ বঙ্গীয় জনসভা (প্রথম কিস্তি)	১০০০
রাণী ভবানীর স্কুলের ছাত্রবৃন্দ	১০০

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মলাভের উপায়।*

(স্বামী বিবেকানন্দ)

যে অনুসন্ধানের ফলে আমরা ভগবানের নিকট হইতে আলোক প্রাপ্ত হই, মনুষ্যহৃদয়ের নিকট তদপেক্ষা প্রিয়তর অনুসন্ধান আর নাই। কি অতীতকালে, কি বর্ত্তমান কালে মানব 'আত্মা', 'ঈশ্বর' 'অদৃষ্ট' সম্বন্ধীয় আলোচনায় যত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে অন্য কোন আলোচনায় তত করে নাই। আমরা আমাদের দৈনিক কাজ কর্ম্ম, আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমাদের কর্ত্তব্য প্রভৃতি লইয়া যতই ডুবিয়া থাকি না কেন আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যে কখন কখন একটী স্থির মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়—তখন মন সহসা থামিয়া যায় এবং এই জগৎপ্রপঞ্চের পারে কি আছে তাহা জানিতে চায়। কখন কখন সে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কিছু কিছু আভাষ পায়, এবং তাহার ফলে তল্লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকে। সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশেই এইরূপ ঘটিয়াছে। মানুষ অতীন্দ্রিয় দর্শনলাভ করিতে চাহিয়াছে, আপনাকে বিস্তার করিতে চাহিয়াছে; এবং যাহাকে আমরা উন্নতি, ক্রমাভিব্যক্তি বলি তাহা সর্ব্বকালেই মানবজীবনের চরম গতি বা ঈশ্বরানুসন্ধান-রূপ একমাত্র অনুসন্ধানের দ্বারাই পরিমিত হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতিসকলের বিভিন্ন প্রকারের সমাজগঠন হইতে যেমন আমাদের সামাজিক জীবনসংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহই মানবের আধ্যাত্মিক

---

* ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারী তারিখে কালিফোর্ণিয়ার প্যাসেডোনা নগরস্থ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মমন্দিরে স্বামিজী কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

জীবনসংগ্রামের পরিচয় প্রদান করে, এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজ যেরূপ সর্ব্বদাই পরস্পরের সহিত কলহ ও সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ এই ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলিও সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত কলহ ও সংগ্রামে রত রহিয়াছে। কোন এক বিশেষ সমাজভুক্ত লোকসকল দাবী করেন যে একমাত্র তাঁহাদেরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, এবং তাঁহারা যতক্ষণ পারেন, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া সেই অধিকার বজায় রাখেন। আমরা জানি যে, এইরূপ একটী ভীষণ সংগ্রাম বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিতেছে। সেইরূপ প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ও কেবলমাত্র তাহারই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে এইরূপ দাবী করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, যদিও ধর্ম্মই মানবজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তি আনয়ন করিয়াছে, তথাপি ধর্ম্ম আবার যেরূপ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে এখন আর কিছুই নহে। ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তি ও প্রেমের বিস্তার করিয়াছে, আবার ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্ম্মই মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আবার ধর্ম্মই মানুষে মানুষে সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক শত্রুতা বা বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়াছে। ধর্ম্মই মানুষের, এমন কি পশুর জন্য পর্য্যন্ত, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছে, আবার ধর্ম্মই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রক্তবন্যা প্রবাহিত করিয়াছে। আবার আমরা ইহাও জানি যে সব সময়েই ভিতরে ভিতরে একটা চিন্তাস্রোত চলিয়াছে;—সব সময়েই বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনায় রত কতকগুলি তত্ত্বান্বেষী বা দার্শনিক রহিয়াছেন, যাঁহারা এই সকল বিবদমান ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ভিতর শান্তি স্থাপন করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও চেষ্টা করিতেছেন। ব্যষ্টিভাবে কোন কোন দেশে এই চেষ্টা সফলও হইয়াছে কিন্তু সমষ্টি ভাবে, সমস্ত পৃথিবীর দিক হইতে দেখিতে গেলে, উহা ব্যর্থ হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে কতকগুলি ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে এই ভাবটী ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে যে, সকল সম্প্রদায়ই বাঁচিয়া থাকুক, কারণ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী উদ্দেশ্য, একটী মহান্ ভাব নিহিত আছে, যাহা জগতের কল্যাণের জন্য আবশ্যক এবং এই হেতুই উহাকে পোষণ করা উচিত। বর্ত্তমান কালেও এই ধারণাটী আধিপত্য লাভ করিতেছে এবং ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে চেষ্টাও চলিতেছে। এই সকল চেষ্টা সকল সময়ে আশানুরূপ ফলপ্রসূ হওয়া দূরে থাকুক, বরং বড়ই ক্ষোভের বিষয়, আমরা দেখি যে আমরা আরও অধিক ঝগড়াবিবাদের সূত্রপাত করিতেছি।

এক্ষণে, ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ না করিয়া সাধারণ বিচার-বুদ্ধির দৃষ্টিতে বিষয়টী দেখিলে প্রথমেই দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান ধর্ম্মে একটা প্রবল জীবনীশক্তি রহিয়াছে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু জানেন না, কিন্তু অজ্ঞতা ত আর একটা আপত্তি নহে। যদি কোন লোক বলে, "বহি-র্জগতে কি হইতেছে না হইতেছে আমি কিছুই জানি না, অতএব বহির্জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে সকলই মিথ্যা।" তাহা হইলে তাহাকে মার্জ্জনা করা চলে না। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সমগ্র জগতে ধর্ম্মভাবের বিস্তার লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, পৃথিবীর একটীও মুখ্য ধর্ম্ম মরে নাই; শুধু তাহাই নহে, তাহাদের প্রত্যেক-টীই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাই-তেছে, মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, হিন্দুরা বিস্তার লাভ করি-তেছে এবং য়িহুদীগণও সংখ্যায় অধিক হইতেছে, এবং তাহারা দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ায় য়িহুদীধর্ম্মের গণ্ডী দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

কেবল একটীমাত্র ধর্ম্ম—একটী প্রধান প্রাচীন ধর্ম্ম—ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়াছে। তাহা প্রাচীন পারসিকদিগের ধর্ম্ম—জরথুষ্ট্র ধর্ম্ম।

মুসলমানগণের পারস্যবিজয় কালে প্রায় লক্ষ পারস্যবাসী ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং কতকগুলি প্রাচীন পারস্য-দেশেই রহিয়া গিয়াছিল। যাহারা পারস্যে ছিল, তাহারা ক্রমাগত মুসলমানদিগের নির্য্যাতনের ফলে ক্ষয় পাইতে লাগিল—এক্ষণে বড় জোর দশ হাজারে দাঁড়াইয়াছে; ভারতে তাহাদের সংখ্যা প্রায় আট হাজার কিন্তু তাহারা আর বাড়িতেছে না। অবশ্য তাহাদিগের গোড়া হইতেই একটী অসুবিধা রহিয়াছে—তাহারা অপর কাহাকেও তাহাদের ধর্ম্মভুক্ত করে না। আবার ভারতবাসী এই মুষ্টিমেয় লোকও, তাহাদের মধ্যে সোদর ব্যতিরিক্ত ভ্রাতাভগিনীগণের মধ্যে বিবাহরূপ ঘোরতর অনিষ্টকর প্রথা প্রচলিত থাকায়, বৃদ্ধি পাইতেছে না। এই একটীমাত্র ধর্ম্ম ব্যতীত অপর সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মই জীবিত রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্টিলাভ করিতেছে। আর আমাদের মনে রাখা উচিত যে পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্ম্মগুলিই অতি পুরাতন, তাহাদের একটীও বর্ত্তমান কালে গঠিত হয় নাই এবং পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্মই গঙ্গা ও ইউফ্রেটাস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; একটীও প্রধান ধর্ম্ম ইউরোপ বা আমেরিকায় উদ্ভূত হয় নাই—একটীও নয়; প্রত্যেক ধর্ম্মই এসিয়া-সম্ভূত এবং তাহাও আবার পৃথিবীর ঐ অংশটুকুর মধ্যে। 'যোগ্যতম ব্যক্তি বা বস্তুই বাঁচিয়া থাকিবে'—আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণের এই মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই সকল ধর্ম্ম যে এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এখনও তাহারা কতকগুলি লোকের পক্ষে উপযোগী; তাহারা যে কেন বাঁচিয়া থাকিবে তাহার কারণ আছে—তাহারা বহুলোকের উপকার করিতেছে। মুসলমানদিগকে দেখ, তাহারা দক্ষিণ এশিয়ার কতকগুলি স্থানে কেমন বিস্তার লাভ করিতেছে, এবং আফ্রিকায় আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। বৌদ্ধগণ মধ্য এসিয়ায় বরাবর বিস্তার লাভ করিতেছে। য়িহুদীদিগের ন্যায় হিন্দুগণও অপরকে নিজধর্ম্মে গ্রহণ করে না, তথাপি ধীরে ধীরে অন্যান্য জাতিসকল হিন্দুধর্ম্মের

ভিতর আসিয়া পড়িতেছে এবং হিন্দুদিগের আচারব্যবহার গ্রহণ করিয়া তাহাদের সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্মও যে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে তাহা আপনারা সকলেই জানেন;—তবে আমার যেন মনে হয়, চেষ্টানুরূপ ফল হইতেছে না। খ্রীষ্টানগণের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে একটী ভয়ানক দোষ রহিয়াছে এবং পাশ্চাত্য সম্প্রদায় মাত্রেই এই দোষ বিদ্যমান। শতকরা নব্বই ভাগ শক্তি কলকব্জাতেই ব্যয়িত হইয়া যায়, কারণ কলকব্জা বড় বেশী। প্রচার কার্য্যটা প্রাচ্য লোকেরাই বরাবর করিয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্য লোকেরা সংঘবদ্ধভাবে কার্য্য, সামাজিক অনুষ্ঠান, যুদ্ধসজ্জা, রাজ্য-শাসন প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে করিবে কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার ক্ষেত্রে তাহারা প্রাচ্যদিগের কাছেও ঘেঁসিতে পারে না। কারণ, ইহা বরাবর তাহাদেরই কাজ ছিল বলিয়া তাহারা ইহাতে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং তাহারা অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে না।

অতএব মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান ইতিহাসে ইহা একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা যে, পূর্ব্বোক্ত সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলিই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্টি লাভ করিতেছে। এই যে ঘটনা, ইহার নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে; এবং সর্ব্বজ্ঞ, পরম কারুণিক সৃষ্টিকর্ত্তার যদি ইহাই ইচ্ছা হইত যে ইহাদের একটা মাত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকুক এবং অবশিষ্ট সকলগুলিই বিনষ্ট হউক, তাহা হইলে উহা বহু পূর্ব্বেই সংসাধিত হইত। আর যদি এই সকল ধর্ম্মের মধ্যে একটী মাত্র ধর্ম্মই সত্য এবং অপরগুলি মিথ্যা হইত তাহা হইলে উহা এতদিনে সমুদয় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিত। কিন্তু ঘটনা এরূপ নহে; উহাদের একটীও সমস্ত পৃথিবী অধিকার করে নাই। সকল ধর্ম্মই এক সময়ে উন্নতির দিকে, আবার অন্য সময়ে অবনতির দিকে যায়। আর ইহাও ভাবিয়া দেখ যে, তোমাদের দেশে ছয়কোটী লোক আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র দুই কোটী দশ লক্ষ কোন না কোন প্রকার ধর্ম্মভুক্ত। সুতরাং সব সময়েই ধর্ম্মের উন্নতি হয় না। সম্ভবতঃ সকল দেশেই, গণনা করিলে দেখিতে পাইবে, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কখনও উন্নতি, আবার কখনও

অবনতি হইতেছে। আবার দেখা যায়, জগতে সম্প্রদায়ের সংখ্যা সব সময়েই বাড়িতেছে। ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষের এই দাবি যদি সত্য হইত যে, সমুদয় সত্য উহাতেই নিহিত এবং ঈশ্বর তাহাকে সেই নিখিল সত্য কোন গ্রন্থবিশেষে নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন—তাহা হইলে জগতে এত সম্প্রদায় কেন? পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতে একই পুস্তকবিশেষকে ভিত্তি করিয়া কুড়িটী নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে। ঈশ্বর যদি কয়েকখানি পুস্তকেই সমস্ত সত্য নিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনই সেগুলি আমাদিগকে তাহাদের শব্দার্থ লইয়া ঝগড়া করিবার জন্য দেন নাই। কিন্তু ঘটনা এইরূপই মনে হইতেছে। কেন এরূপ হয়, যদি ঈশ্বর বাস্তবিকই ধর্ম্মবিষয়ক সমস্ত সত্য একখানি পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে দিতেন তাহা হইলেও কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না, কারণ কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাইবেল এবং খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত সম্প্রদায় সমূহের কথা ধরুন; প্রত্যেক সম্প্রদায় ঐ একই গ্রন্থ তাহার নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছে যে, কেবল সেই উহা ঠিক ঠিক বুঝিয়াছে আর অপর সকলে ভ্রান্ত। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্বন্ধেই এই কথা। মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে, হিন্দুদের মধ্যে ত শত শত। এক্ষণে আমি যে সমস্ত ঘটনা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি তাহার উদ্দেশ্য, আমি দেখাইতে চাই যে, ধর্ম্মবিষয়ে যতবারই সমুদয় মনুষ্যজাতিকে এক প্রকার চিন্তার মধ্য দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে ততবারই উহা বিফল হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে। এমন কি বর্ত্তমান কালেও নূতন মতপ্রবর্ত্তকমাত্রেই দেখিতে পান যে তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের নিকট হইতে কুড়ি মাইল দূরে সরিয়া যাইতে না যাইতে তাহারা কুড়িটী দল গঠন করিয়া বসিয়াছে। আপনারা সব সময়েই এইরূপ ঘটিতেছে দেখিতে পান। কথা হইতেছে এই যে, সকল লোককে একই প্রকার ভাব গ্রহণ করান চলে না এবং আমি ইহার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি কোন সম্প্রদায়ের বিরোধী

নহি। বরং নানা সম্প্রদায় রহিয়াছে বলিয়া আমি খুসী এবং আমার বিশেষ ইচ্ছা তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাউক। ইহার কারণ কি? কারণ শুধু ইহাই যে, যদি আপনি, আমি এবং এখানে উপস্থিত আর আর সকলে ঠিক একই প্রকার ভাবরাশি চিন্তা করি, তাহা হইলে আমাদের চিন্তা করিবার বিষয়ই থাকিবে না। দুই বা ততোধিক শক্তির সঙ্ঘর্ষ হইলেই যে গতি সম্ভব হয়, ইহা সকলেই জানেন। সেইরূপ চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাত হইতেই—চিন্তার বৈচিত্র্য হইতেই নূতন চিন্তার উদ্ভব হয়। এখন, আমরা সকলেই যদি একই প্রকার চিন্তা করিতাম তাহা হইলে আমরা যাদুঘরের মিশর দেশীয় 'মামি'গুলার (Mummies) মত পরস্পরের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতাম,—তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই হইত না! বেগবতী সজীব নদীতেই ঘূর্ণাবর্ত্ত বিদ্যমান থাকে, বদ্ধ ও মরা জলে আবর্ত্ত হয় না। যখন ধর্ম্মসকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে তখন আর সম্প্রদায়ও থাকিবে না; তখন শ্মশানের পূর্ণ শান্তি ও সাম্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত মানুষ চিন্তা করিবে ততদিন সম্প্রদায়ও থাকিবে। বৈষম্যই জীবনের চিহ্ন এবং উহা থাকিবেই থাকিবে। আমি প্রার্থনা করিতেছি যে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে হইতে অবশেষে জগতে যত মনুষ্য আছে ততগুলি সম্প্রদায় গঠিত হউক, যেন ধর্ম্মরাজ্যে প্রত্যেকে তাহার নিজের পথে—তাহার ব্যক্তিগত চিন্তা-প্রণালী অনুসারে চলিতে পারে।

কিন্তু এই ব্যাপারটী পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ ভাবে চিন্তা করিতেছে, কিন্তু এই স্বাভাবিক গতিটা বরাবরই বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখনও হই-তেছে। সাক্ষাৎপক্ষে তরবারি ব্যবহৃত না হইলেও অন্য উপায় গ্রহণ করা হইয়া থাকে। নিউইয়র্কের একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক কি বলিতে-ছেন শুনুন—তিনি প্রচার করিতেছেন যে ফিলিপাইনবাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে হইবে, কারণ তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিবার উহাই একমাত্র উপায়! তাহারা ইতিপূর্ব্বেই ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত

হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রেস্‌বিটেরিয়ান করিতে চান এবং ইহার জন্য তিনি এই রক্তপাতজনিত ঘোর পাপরাশি স্বজাতির স্কন্ধে চাপাইতে উদ্যত! কি ভয়ানক! আবার এই ব্যক্তিই তাঁহার দেশের একজন সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রচারক এবং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ লোক। যখন এইরূপ একজন লোক সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রকার কদর্য্য প্রলাপবাক্য বলিয়া যাইতে লজ্জাবোধ করিতেছে না তখন জগতের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখুন, বিশেষতঃ, যখন আবার তাহার শ্রোতৃবৃন্দ তাহাকে উৎসাহ দিতেছে। ইহাই কি সভ্যতা? ইহা ব্যাঘ্র, নরখাদক ও অসভ্য বন্যজাতির সেই চিরাভ্যস্ত রক্তপিপাসা বই আর কিছুই নহে—কেবল নূতন নাম ও নূতন অবস্থাচক্রের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে মাত্র। এতদ্ব্যতীত উহা আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান কালেই যদি ঘটনা এইরূপ হয়, তবে ভাবিয়া দেখুন, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায় সকলকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত, সেই প্রাচীনকালে জগৎকে কি ভয়ানক নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমাদের শার্দ্দূলসুলভ বৃত্তিনিচয় সুপ্ত রহিয়াছে মাত্র—ইহা একেবারে মরে নাই। সুযোগ উপস্থিত হইলেই উহারা লাফাইয়া উঠে এবং পূর্ব্বের ন্যায় হিংস্রভাবে আক্রমণ করে। তরবারি অপেক্ষাও, জড় পদার্থনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রাপেক্ষাও ভীষণতর অস্ত্র-শস্ত্র আছে—অবজ্ঞা, সামাজিক ঘৃণা ও সমাজ হইতে বহিষ্করণ; এখন এই সকল ভীষণ মর্ম্মভেদী অস্ত্রই যাহারা ঠিক আমাদের ন্যায় চিন্তা করে না তাহাদের প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে। আর কেনই বা সকলে ঠিক আমার মত চিন্তা করিবে? আমি ত ইহার কোন কারণ দেখিতে পাই না। আমি যদি বিচারশীল মানুষ হই, তাহা হইলে সকলে যে ঠিক আমার ভাবে ভাবিত নয় ইহাতে আমার আনন্দিতই হওয়া উচিত। আমি প্রেতভূমিসদৃশ দেশে বাস করিতে চাহি না; আমি মানবের জগতে থাকিতে চাই—মানুষের মধ্যে থাকিয়া মানুষ হইতে চাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মতভেদ থাকিবে; কারণ,

পার্থক্যই চিন্তার প্রথম লক্ষণ। আমি যদি চিন্তাশীল লোক হই তাহা হইলে আমার অবশ্যই চিন্তাশীল লোকদিগের মধ্যে বাস করিবার ইচ্ছা হওয়া উচিত,—যেখানে মতের পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিবে।

তার পর প্রশ্ন উঠিবে, এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তু কি করিয়া সত্য হইতে পারে? একটী জিনিস সত্য হইলে তাহার বিপরীত জিনিসটা মিথ্যা হইবে। একই সময়ে দুইটী বিরুদ্ধ মত কি করিয়া সত্য হইবে? আমি এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চাই। কিন্তু আমি প্রথমে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর ধর্ম্মগুলি কি বাস্তবিকই একান্ত বিরোধী? যে সকল বাহ্য আচারের আবরণে বড় বড় চিন্তা সকল প্রকাশ পায় আমি সে সকলের কথা বলিতেছি না, নানা ধর্ম্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন মন্দির, ভাষা, ক্রিয়াকাণ্ড, শাস্ত্র প্রভৃতির কথা বলিতেছি না, আমি প্রত্যেক ধর্ম্মের ভিতরকার প্রাণবস্তুর কথা বলিতেছি। প্রত্যেক ধর্ম্মের পশ্চাতে একটি করিয়া প্রাণবস্তু বা আত্মা আছে; এবং এক ধর্ম্মের আত্মা অন্য ধর্ম্মের আত্মা হইতে পৃথক হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কি একান্ত বিরোধী? তাহারা পরস্পরকে খণ্ডন করে, না, একে অপরের পূর্ণতা সম্পাদন করে?—ইহাই প্রশ্ন। আমি যখন নিতান্ত বালক ছিলাম তখন হইতে এই প্রশ্নটী বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং সারা জীবন ধরিয়া উহার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। আমার সিদ্ধান্ত হয় ত আপনাদের কোন উপকারে আসিতে পারে এই মনে করিয়া উহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। আমার বিশ্বাস, তাহারা পরস্পরের বিরোধী নহে, পরস্পরের পূর্ণতাসাধক। প্রত্যেক ধর্ম্ম যেন মহান্ সার্ব্বভৌমিক সত্যের এক একটী অংশ লইয়া তাহাকে মূর্ত্তিমান করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য উহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতেছে। সুতরাং ইহা যোগদানের ব্যাপার—বর্জ্জনের নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। এক একটী বড় বড় ভাব লইয়া সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে; এক্ষণে আদর্শের সহিত আদর্শের সম্মিলন করিতে হইবে। এইরূপেই মানবজাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে।

মানুষ কখনও ভ্রম হইতে সত্যে উপনীত হয় না, পরন্তু সত্য হইতেই সত্যে গমন করিয়া থাকে ; নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরূঢ় হইয়া থাকে - কিন্তু কখনও ভ্রম হইতে সত্যে নহে। পুত্র হয় ত পিতা অপেক্ষা সমধিক গুণশালী হইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া পিতা যে কিছু নন তাহা ত নহে। পুত্রের মধ্যে পিতা ত আছেনই অধিকন্তু আরও কিছু আছে। আপনার বর্ত্তমান জ্ঞান যদি আপনার বাল্যাবস্থার জ্ঞান হইতে অনেক বেশী হয়, তাহা হইলে কি আপনি এক্ষণে সেই বাল্যাবস্থাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন ? আপনি কি সেই অতীতাবস্থার দিকে তাকাইয়া উহাকে কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিবেন ? বুঝিতে-ছেন না, আপনার বর্ত্তমান অবস্থা সেই বাল্যকালের জ্ঞানই আরও কিছু অভিজ্ঞতা দ্বারা পুষ্ট, এই মাত্র ?

আবার ইহা ত সকলেই জানেন যে, একই জিনিসকে বিভিন্ন দিক হইতে দেখিয়া প্রায় বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে কিন্তু সকল সিদ্ধান্ত একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। মনে করুন, এক ব্যক্তি সূর্য্যের দিকে গমন করিতেছে এবং সে যেমন অগ্রসর হইতেছে অমনি বিভিন্ন স্থান হইতে সূর্য্যের এক একটী ফটোগ্রাফ লইতেছে। যখন সে ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে তখন তাহার নিকট সূর্য্যের অনেকগুলি ফটোগ্রাফ থাকিবে যদি সে সেগুলি আমাদের সম্মুখে রাখে তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে তাহাদের কোন দুইখানি ঠিক এক রকমের নহে, কিন্তু এ কথা কে অস্বীকার করিবে যে এগুলি একই সূর্য্যের ফটোগ্রাফ—শুধু ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে গৃহীত। চারিটী কোণ হইতে এই গির্জ্জাটীর চারিখানি ফটোগ্রাফ লইয়া দেখুন, তাহারা কত পৃথক দেখাইবে, তথাপি তাহারা এই গির্জ্জারই প্রতিকৃতি। এইরূপে আমরা একই সত্যকে আমাদের জন্ম, শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখিতেছি। আমরা সত্যকেই দেখিতেছি, তবে এই সমুদয় অবস্থার মধ্য দিয়া সেই সত্যের যতটা দর্শন পাওয়া সম্ভব ততটাই পাই-তেছি—তাহাকে আমাদের নিজ নিজ হৃদয়ের দ্বারা রঞ্জিত করিতেছি,

আমাদের নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতেছি এবং নিজ নিজ মন দ্বারা ধারণা করিতেছি। আমাদের সহিত সত্যের যতটুকু সম্বন্ধ, আমরা উহার যতটুকু গ্রহণ করিতে সক্ষম ততটুকুই গ্রহণ করিতেছি মাত্র। এই হেতুই মানুষে মানুষে প্রভেদ, এমন কি, কখন কখন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে; তথাপি সকলেই সেই সর্ব্বজনীন সত্যের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব আমার ধারণা এই যে, এই সমস্ত ধর্ম্ম ঈশ্বরের অনন্ত-শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র এবং তাহারা মানবের কল্যাণ সাধন করিতেছে; তাহাদের একটীও মরে না—একটীকেও বিনষ্ট করিতে পারা যায় না। যেমন কোন প্রাকৃতিক শক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারা যায় না, সেইরূপ এই আধ্যাত্মিক শক্তিনিচয়ের কোন একটীরও বিনাশ সাধন করিতে পারা যায় না। আপনারা দেখিবেন, প্রত্যেক ধর্ম্মই জীবিত রহিয়াছে। সময়ে সময়ে ইহা হয় ত উন্নতি বা অবনতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। কোন সময়ে হয় ত ইহার সাজসজ্জার অনেকটা হ্রাস হইতে পারে, কখনও উহা রাশীকৃত সাজ-সজ্জায় মণ্ডিত হইতে পারে; কিন্তু তথাপি উহার প্রাণবস্তু বা আত্মা সর্ব্বদাই উহার পশ্চাতে রহিয়াছে; উহা কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যেক ধর্ম্মের যাহা চরম আদর্শ তাহা কখনই নষ্ট হয় না, সুতরাং প্রত্যেক ধর্ম্মই জ্ঞাতসারে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

আর সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, যাহার সম্বন্ধে সকল দেশের দার্শ-নিকগণ ও অপর ব্যক্তি সকল কত কল্পনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা এখানেও রহিয়াছে। সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব যেমন পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে, সেইরূপ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মও রহিয়াছে। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই 'ভ্রাতা' 'ভগিনী' দেখিতে পান নাই? আমি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগকে দেখিয়াছি। ভ্রাতৃ-ভাব পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল কতকগুলি লোক আছে যাহারা ইহা দেখিতে না পাইয়া ভ্রাতৃভাবের নূতন নূতন

সম্প্রদায়ের জন্য চীৎকার করিয়া উহাকে বিশৃঙ্খল করিয়া দেয়। সার্ব্ব-ভৌমিক ধর্ম্মও বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুরোহিতকুল এবং অপরাপর লোকেরা, যাঁহারা বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার আপনা হইতে ঘাড়ে লইয়াছেন, তাঁহারা যদি দয়া করিয়া একবার কিছুক্ষণের জন্য প্রচারকার্য্য বন্ধ রাখেন, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, ঐ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। তাঁহারা বরাবরই উহার প্রকাশে বাধা দিয়া আসিতেছেন, কারণ, উহাতে তাঁহাদের স্বার্থ আছে। আপনারা দেখিতে পান, সকল দেশের পুরোহিতেরাই অতিশয় গোঁড়া। ইহার কারণ কি? খুব কম পুরোহিতই আছে যাহারা নেতা হইয়া জনসাধারণকে চালিত করে, তাহাদের অধি-কাংশই জনসাধারণ দ্বারা চালিত হয় এবং তাহাদের ভৃত্য ও ক্রীত-দাস হয়। যদি কেহ বলে ইহা শুষ্ক, ত তাহারাও বলিবে, হাঁ, শুষ্ক; যদি কেহ বলে, ইহা কাল, ত তাহারাও বলিবে, হা, ইহা কাল। যদি জনসাধারণ উন্নত হয় তাহা হইলে পুরোহিতেরা উন্নত হইতে বাধ্য। তাহারা পিছাইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং পুরোহিতদিগকে গালি দিবার অগ্রে পুরোহিতগণকে গালি দেওয়া আজ কাল একটা ধারা হইয়াছে—আপনাদের নিজেদেরই গালি দেওয়া উচিত। আপ-নারা আপনাদের যোগ্য ব্যবহারই পাইতেছেন। যদি কোন পুরোহিত আপনাদিগকে নূতন নূতন উন্নত ভাব দিয়া আপনাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতে চান, তাহা হইলে তাঁহার দশা কি হইবে? হয় ত তাঁহার পুত্রকন্যা অনাহারে মারা যাইবে এবং তাঁহাকে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতে হইবে। আপনারা যে সকল সাংসারিক আইন মানিয়া চলেন, তাঁহারাও তাহাই মানিয়া চলেন। তিনি বলেন, "আপনারা যদি অগ্রসর হন তাহা হইলে আমরাও হইব।" অবশ্য এমনও দুই চারি জন উচ্চ আধারসম্পন্ন লোক আছেন, যাঁহারা লোকমতকে ভয় করেন না। তাঁহারা সত্যের প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন এবং এক মাত্র সত্যকেই সার জ্ঞান করেন। সত্য তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে—যেন তাঁহাদিগকে অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং

তাঁহাদের অগ্রসর হওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। তাঁহারা কখনও পশ্চাতে চাহেন না, ফলে তাঁহাদিগের লোকও জুটে না। ভগবানই এক মাত্র তাঁহাদের সহায়, তিনিই তাঁহাদের পথপ্রদর্শক জ্যোতি এবং তাঁহারা সেই জ্যোতিরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার বি, এল)

(১৩)

ধ্যান যোগ।

উদ্ধব বলিলেন, আমার ধ্যানে প্রয়োজন নাই। ধ্যান কি? তা আমার জানিবার বাসনাও নাই। আমি তোমার উচ্ছিষ্ট-ভোজী দাস, ইহাতেই আমি সম্পূর্ণ চরিতার্থ, অন্য আর কিছু আমি চাহি না। তবে তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, আমাকে আচার্য্য করিয়া রাখিয়া যাইতেছ। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, ধ্যান কি? তাহাকে কি বলিব? ভগবান্ উদ্ধবকে যোগাঙ্গ আসন ও সগভ প্রাণায়াম উপদেশ দিলেন ও ধ্যানের ক্রম অর্থাৎ কিরূপে সবিশেষ ধ্যান হইতে নির্ব্বিশেষ ধ্যানে উপনীত হইতে হয়, শিখাইলেন।

সর্ব্বাঙ্গে মন ধারণা।

প্রথমে ইষ্ট মূর্ত্তি ধ্যান করাই বিধি।

সুকুমারং অভিধ্যায়েৎ সর্ব্বাঙ্গেষু মনো দধৎ॥

প্রথমে সর্ব্বাঙ্গে মন ধারণা করিয়া সুকুমার মূর্ত্তি ধ্যান করিবে।

মাত্র মুখে ধারণা।

তৎ সর্ব্বব্যাপকং চিত্তম্ আকৃষ্য একত্র ধারয়েৎ
নান্যানি চিন্তয়েৎ ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েৎ মুখম্।

সেই সর্ব্বব্যাপক চিত্তকে কুড়াইয়া এক জায়গায় ধারণা করিবে, আর অন্য অঙ্গ চিন্তা করিবে না। কেবল সহাস্য মুখ চিন্তা করিবে।

আকাশে ধারণা।

তত্র লব্ধপদং চিত্তং আকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।

মুখে লগ্নচিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আকাশে ধারণা করিবে।

কিছুই চিন্তা করিবে না।

তৎ চ ত্যক্ত্বা মদারোহঃ ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।

আকাশও ত্যাগ করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না, মাত্র শুদ্ধব্রহ্মে অবস্থিত রহিবে।

আত্মা ও পরমাত্মা যোগ কিরূপ।

জ্যোতিতে জ্যোতি সংযোগের ন্যায় আত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ হইবে।

এইরূপ ধ্যান অভ্যাস করিলে মনের ত্রিপুটী অর্থাৎ ধ্যাতা, ধ্যেয়, ধ্যান বা দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন—এই বিভাগ লয় হইয়া মন নির্ব্বাণ—অর্থাৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়।

(১০)

সিদ্ধি।

সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার। আটটী সিদ্ধি ঈশ্বরপ্রধান। আর দশটী সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইতে হয়।

আটটী ঈশ্বরপ্রধান সিদ্ধি।

(১) অণিমা—অণু হওয়া, প্রস্তর প্রবেশ।

(২) মহিমা—মহান্ হওয়া, সমস্ত ব্যাপিয়া থাকা।

(৩) লঘিমা—মরীচি অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোকে যাওয়া।

(৪) প্রাপ্তি—অঙ্গুলির অগ্রদ্বারা চন্দ্রস্পর্শ।

(৫) প্রাকাম্য—ভূমিতে ভাসা ডুবা যেরূপ জলে।

(৬) ঈশিতা—শক্তি প্রেরণ।

(৭) বশিতা—বিষয়ে অনাসক্তি।

(৮) কামাবসায়িতা—সুখের সীমা প্রাপ্তি।

দশটী গুণজ সিদ্ধি।

(১) অনূর্ম্মিমত্ত—ক্ষুৎ পিপাসা, জরা মৃত্যু, শোক মোহ রহিত হওয়া।

(২) দূর শ্রবণ।

(৩) দূর দর্শন।

(৪) মনোজব—যেখানে মন যায় সেখানে দেহ যায়।

(৫) কামরূপ—যেরূপ হইতে ইচ্ছা হয় সেইরূপ ধরা।

(৬) পরকায়া প্রবেশ।

(৭) স্বেচ্ছামৃত্যু।

(৮) সুরক্রীড়া ভোগ।

(৯) সত্য সংকল্প—যাহা সংকল্প করে তাহা পায়।

(১০) অপ্রতিহত আজ্ঞা।

ক্ষুদ্রসিদ্ধি

এই আঠারটী ছাড়া ক্ষুদ্র সিদ্ধি পাঁচটী।

(১) ত্রিকালজ্ঞত্ব—ত্রিকালদর্শিত্ব।

(২) অদ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণাদিতে অভিভূত না হওয়া।

(৩) পরচিত্তাভিজ্ঞতা।

(৪) স্তম্ভন—অগ্নি অর্ক, অম্বু, বিষ অস্ত্রাদি প্রভৃতির বেগ নিরোধ করিবার ক্ষমতা।

(৫) অপরাজয়—সর্ব্বত্র জয়লাভ।

এই সব সিদ্ধি বিবিধ ধারণা হেতু হয়।

(৮)

সহজে সিদ্ধি লাভ।

সত্য বটে বিভিন্ন ধারণা হেতু এই সব সিদ্ধিলাভ হয় কিন্তু ভগবানে মন ধারণা করিলে সব সিদ্ধি লাভ হয়।

মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্ল্লভা।

আমাতে ধারণা করিলে এমন কি সিদ্ধি আছে, যাহা লাভ হয় না?

সিদ্ধি-অন্তরায়। বৃথা সময় নষ্ট।

অন্তরায়ান্ বদন্তি এতাঃ যুঞ্জতঃ যোগম্ উত্তমম্।

ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ।

কিন্তু উত্তম যোগাভ্যাসকারীরা এই সব সিদ্ধিকে অন্তরায় বলে। আর আমাকে যে লাভ করিতে ইচ্ছা করে তার এ সবে বৃথা সময় নষ্ট হয়।

বিশেষতঃ নিষ্ফল।

মৎস্যজন্ম হেতু উদকস্তম্ভ করিতে পারে, পক্ষিজন্ম হেতু আকাশে গমন করিতে পারে। একটা মাছ বা একটা পাখী সহসা যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই সিদ্ধি পাইবার জন্য যোগধারণা করিতে হইবে? যে করে, তার মত নির্ব্বোধ বিরল।

(১৯)

ভগবৎ বিভূতি।

সকলেই ধ্যান করিতে পারে না। কারণ সংযত পুরুষ ছাড়া ধ্যান হয় না। কিন্তু একটা উর্জ্জিত শক্তিবিশিষ্ট বস্তু বা পুরুষ দেখিলে মনে হয়, এই বুঝি ভগবান্ এবং তাহাতে মন আকৃষ্ট হয় এবং তাহা চিন্তা করা সোজা হয়। উর্জ্জিত শক্তি ভগবানের অংশ বটে।

তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিঃ ঐশ্বর্য্যং হ্রীঃ ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।

বীর্য্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মে অংশকঃ॥

যেখানে যেখানে তেজ, শ্রী, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, লজ্জা, ত্যাগ, সৌন্দর্য্য, ভগ, বীর্য্য, তিতিক্ষা, বিজ্ঞান, সেখানে সেখানে আমার আবির্ভাব জানিবে।

এইরূপ আবির্ভাব মানিলে মন আকৃষ্ট হইবে এবং অসংযতচিত্ত সংযত হইবে, তারপর ধ্যানের উপযুক্ত হইবে।

(২০)

বিভূতি মনোবিকার মাত্র।

কিন্তু ইহা বুঝা উচিত ভগবানের আবির্ভাব কেবল বস্তুবিশেষে বা পুরুষবিশেষে নহে। ভগবান্ সর্ব্ববস্তুতে সর্ব্বপুরুষে বিদ্যমান। যেরূপ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, সেইরূপ উদ্ধবকে ভগবান্ নানা বিভূতি বলিয়া পরিশেষে বলিতেছেন

মনোবিকারা এব এতে যথা বাচা অভিধীয়তে।

যেমন আকাশকুসুম বাক্যে বলা যায়, কিন্তু ঐরূপ বস্তু নাই, সেইরূপ এই সব বিভূতি মনোবিকার মাত্র।

ইহাদের পারমার্থিকতা কিছুই নাই, অতএব বিভূতিতে অভিনিবেশ করিবে না।

সংযমের প্রয়োজন

বাচং যচ্ছ মনঃ যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছ ইন্দ্রিয়াণি চ।

আত্মানম্ আত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে।

অতএব উদ্ধব। বাক সংযম কর, মন সংযম কর, প্রাণ সংযম কর ইন্দ্রিয় সংযম কর, সত্ত্বাশ্রয় করিয়া বুদ্ধি সংযম কর, তাহা হইলেই সংসারমার্গে আর ফিরিবে না।

অসংযত যতির তপস্যা কাঁচা ঘটের জল।

যঃ বৈ বাক মনসী সম্যক্ অসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ

তস্য ব্রতং তপঃ দানং স্রবতি আমঘটাম্বুবৎ।

যে যতি বাক্ মন সম্পূর্ণরূপে সংযত করে না, তার ব্রত, তপস্যা, দান সব নষ্ট হইয়া যায়, যেমন কাঁচা ঘটে জল রাখিলে হয়।

(২১)

বর্ণাশ্রম।

ভগবান্ চতুর্ব্বর্ণের ও চতুরাশ্রমের উপদেশ দিলেন। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সাধারণ বালকের শিক্ষা বিস্তার জন্য সেইরূপ চতুরাশ্রমের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষ তৈয়ার করা।

সত্য ও ত্রেতা।

সত্যযুগে অবতারবিশেষের অভাবহেতু শুদ্ধ নির্ব্বিকল্প বেদান্ত-বেদ্য ব্রহ্মকে ধ্যান করিত। ত্রেতাতে হৌত্র, অধ্বর্য্যব, উদ্গাত্র—ত্রিবিধ যজ্ঞই ধর্ম্ম ছিল।

সর্ব্ব বর্ণাশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম।

অহিংসা সত্যম্ অস্তেয়ম্ অকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্ম অয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অকাম, অক্রোধ, অলোভ, সর্ব্বভূতের হিত ও প্রিয়বাঞ্ছা—এইগুলি সার্ব্ববর্ণিকের ধর্ম্ম।

গৃহস্থেরও নিবৃত্তিনিষ্ঠা থাকা উচিত।

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্তি এতে স্বপ্নো নিদ্রানুগঃ যথা।

পুত্র, দারা, আপ্তজন, বন্ধু, ইহাদের সঙ্গম পান্থশালাস্থ ব্যক্তিগণের সঙ্গমের তুল্য, কারণ স্বপ্ন নিদ্রাবসানে যেরূপ নষ্ট হয়, সেইরূপ পুত্র-দারাদিও পতিদেহে নাশ প্রাপ্ত হয়।

নিজগৃহে অতিথির ন্যায় বাস করিবে।

ইত্থং পরিমৃশন্ মুক্তঃ গৃহেষু অতিথিবৎ বসন্।
ন গৃহৈঃ অনুবধ্যেত নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কৃতঃ।

মুক্ত পুরুষ এইরূপ বিচার করিয়া নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইয়া অতিথির ন্যায় উদাসীন হইয়া বাস করিবে, বদ্ধ হইবে না।

ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে ভগবান্ জ্ঞান করিবে।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ ন অবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা অসূয়েত সর্ব্বদেবময়ঃ গুরুঃ॥

আচার্য্যকে ভগবান্ জ্ঞান করিবে। কখন অবমাননা করিবে না। মনুষ্যজ্ঞানে কখন অসূয়া করিবে না, কারণ গুরু সর্ব্বদেবময়।

বানপ্রস্থী সকাম হওয়া উচিত নহে।

যঃ তু এতৎ কৃচ্ছ্রতঃ চীর্ণং তপঃ নিঃশ্রেয়সং মহৎ।
কামায় অল্পীয়সে যুঞ্জ্যাৎ বালিশঃ কঃ অপরঃ ততঃ॥

যে এই কষ্টসম্পাদিত মোক্ষকর তপস্যা, ব্রহ্মলোকাদি তুচ্ছ কামেতে সংযুক্ত করে সেই সকাম তাপস অপেক্ষা মূর্খ আর কে?

সন্ন্যাসীর বিঘ্ন কামিনী।

বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যসতঃ দেবাঃ দারাদিরূপিণঃ।
বিঘ্নান্ কুর্ব্বন্তি অয়ং হি অস্মান্ আক্রম্য সমিয়াৎ পরম্।

ইনি আমাদের অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের নিকট যাইবেন এই আশঙ্কায় দেবগণ কামিনীরূপে সন্ন্যাসীর বিঘ্ন করেন।

(২২

অনাশ্রমী।

ভগবান্ চতুরাশ্রম বলিয়া এইবার অনাশ্রমীর কথা বলিতেছেন। সন্ন্যাস দ্বিবিধ—বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎ সন্ন্যাস। বিবিদিষা সন্ন্যাস আশ্রমভুক্ত। বিদ্বৎ সন্ন্যাস আশ্রমভুক্ত নহে।

অনাশ্রমী কে?

জ্ঞাননিষ্ঠঃ বিরক্তঃ বা মদ্ভক্তঃ বা অনপেক্ষকঃ
সলিঙ্গান্ আশ্রমান্ ত্যক্ত্বা চরেৎ অবিধিগোচরঃ।

বৈরাগ্যবান্ জ্ঞাননিষ্ঠ বা নিরপেক্ষ মদ্ভক্ত আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিচরণ করিবে, কিন্তু বিধি কিঙ্কর অর্থাৎ বিধির দাস হইবে না।

বিদ্বৎ সন্ন্যাসের লক্ষণ।

বুধঃ বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলঃ জড়বৎ চরেৎ।
বদেৎ উন্মত্তবৎ বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমঃ চরেৎ।

তিনি যদিচ বিবেকী কিন্তু বালকের ন্যায় মানাপমান শূন্য হইয়া খেলা করেন, যদিচ নিপুণ কিন্তু জড়ের ন্যায় থাকেন, যদিচ পণ্ডিত কিন্তু উন্মত্তের ন্যায় কথা বলেন। যদিচ বেদার্থজ্ঞ কিন্তু গরুর ন্যায় অনিয়তাচার করেন।

তাঁর অভেদ জ্ঞান।

নাহ তস্য বিকল্পাখ্যা যা চ মদ্বীক্ষয়া হতা।

এরূপ জ্ঞানীর ভেদপ্রতীতি থাকে না। যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানহেতু নষ্ট হইয়াছে।

আদান-প্রদান।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

পৃথিবীর চিন্তা আজ পাশ্চাত্য দেশগামিনী—যেখানে লোকক্ষয়-করী মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা দেশকালকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে দেশ ভোগ ও সভ্যতার লীলাভূমি এবং বিদ্যার আদর্শ নিকেতন বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ চারি বৎসরের যুদ্ধে সে আদর্শ কল্পনা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। জড়শক্তির উদ্দাম নৃত্যে পাশ্চাত্য ভূমি "ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ খণ্ড প্রলয় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রতি শতাব্দীতেই সঙ্ঘটিত হইতে দেখা যায়। ঐহিক ভোগেচ্ছায় পরিচালিত সঙ্ঘ ও জাতিমাত্রেরই এই ভয়াবহ পরিণাম,—ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান।

পাশ্চাত্য বীরগণ বলেন, যুদ্ধই দেশের সঞ্চিত মল অপহরণ করিয়া জাতিকে নবীন জীবন প্রদান করে; সুতরাং ইহা প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম—অবশ্যম্ভাবী। যে দেশের চিন্তা শুধু ইহ-ভোগ-সমুখ আকাঙ্ক্ষার আপূরণে ধাবমানা মানবজীবন যথায় সংগ্রামময় বলিয়া পরিগণিত—সংগ্রামসক্ষমতা যথায় জীবনধারণের মুখ্য শক্তি বলিয়া বিবেচিত, সে দেশের পণ্ডিতগণ যে উক্তরূপ সিদ্ধান্তবাদী হইবেন, ইহা বিচিত্র কি? অখণ্ড রাজ্যলিপ্সা, বাণিজ্যের অবাধ সম্প্রসারণ—অজস্র ধনাগমের অযুত পন্থা আবিষ্করণ—পার্থিব সুখের অনন্ত উৎস প্রকটন যে দেশের উচ্চাদর্শ বলিয়া পরিগণিত, সে দেশে হিংসা দ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাসমুখ শারীরিক ও যান্ত্রিক বলের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্য জাতির আদর্শই এই সঙ্ঘর্ষের জন্য দায়ী।

ভগবান্ যীশুর সাম্যবাদ—দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে বামগণ্ড ফিরাইয়া দেওয়া, অগ্রে ভ্রাতার সঙ্গে মনোমালিন্য দূর করিয়া পরে ঈশ্বরোদ্দেশে বলি আহরণ ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ আদর্শবাক্য পাশ্চাত্য

দেশের জন্যই যথার্থ কথিত হইয়াছে। যে দেশে রজস্তম শক্তির প্রবল অভ্যুদয়, সে দেশে তথাকথিত সাম্য ভাবের আদর্শ স্থাপন ও গ্রহণ না করিলে জাতি ও সঙ্ঘের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্য দেশ সেই সাম্যবাদ গ্রহণ না করিয়া ধ্বংসমুখে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ভারতের আদর্শ অন্যরূপ। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই দ্বন্দ্বময় জীবনের সমরসংঘর্ষই এ দেশের প্রকৃত আদর্শ নহে। ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবনের মধ্যেও শান্তির প্রতিষ্ঠা আছে। স্বামিজী যেমন বলিতেন, "ভারতের জাতিমাত্রেই বাস্তব জীবনকে আদর্শ জীবন বলিয়া গ্রহণ করে; একমাত্র ভারতবর্ষই আদর্শ জীবনকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। (We take ideal for the real , other nations, the real for ideal.) ভারতের উচ্চ আদর্শ আত্মজ্ঞান লাভ জীবনরহস্যের উদ্ঘাটন—ঐহিক জীবনে অনাসক্তি মোক্ষার্থে ও পরহিতার্থে সর্ব্ব ত্যাগ। এই দেশের ত্যাগ-ধর্ম্ম অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বেদবোধিত এই আত্মজ্ঞানলাভ-দ্যোতক ত্যাগধর্ম্ম কালক্রমে কর্ম্মহীনতায় -জড়তায় পরিণত হওয়ায় এবং কর্ম্মহীনতায় সামান্য জীবনসংস্থানেরও সম্ভাবনা না থাকায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে অর্জ্জুনকে অকর্ম্মরূপ কাপুরুষতাকে নিন্দা করতঃ বলিয়াছেন, "ক্লৈব্যং মা স্ম গম পার্থ —হে পার্থ, ক্লীবতা পরি-ত্যাগ কর। মীমাংসাশাস্ত্রের পূর্ব্ব ও উত্তরকাণ্ডে কর্ম্মপরতা ও কর্ম্মত্যাগরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সামঞ্জস্যকল্পে গীতোক্ত ধর্ম্ম কথিত হইলেও বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মহীনতারূপ ক্লীবতার বিরুদ্ধেই উহার ইঙ্গিত। গীতাশাস্ত্রও ত্যাগকেই সর্ব্বোচ্চাদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ঘোর তমসাচ্ছন্ন জীবকুলকে অগ্রে কর্ম্মতৎপর হইতে বলিয়া পরে কর্ম্মত্যাগরূপ জ্ঞাননিষ্ঠায় উপস্থাপিত করাই গীতাশাস্ত্রের মুখ্য প্রয়াস বলিয়া অনুমিত হয়। কর্ম্মহীনতায় জীবকুল পাছে জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে—যাহাতে লোকহিতকর সৎকর্ম্মসহায়ে জীবকুল ত্যাগের উচ্চাদর্শে প্রতিষ্ঠিত

হইতে পারে, গীতাশাস্ত্রের ইহাই মুখ্য অভিপ্রায়। অনেকে মনে করেন, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ফকিরী পাইলেই আত্মজ্ঞানলাভে চরিতার্থ হওয়া যায়। কিন্তু গীতার সামঞ্জস্য-নীতি এইরূপ কর্ম্ম-হীনতাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে উপহাস করিয়াছেন। সত্ত্বমাত্র ভাণ, তমোগ্রস্ত জনগণকে সম্বোধন করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন, "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং" সর্ব্বদা কর্ম্ম কর। কর্ম্মহীনতার চেয়ে কর্ম্ম করাই ভাল। একেবারে কর্ম্মহীন হইলে জীব জড়ত্বে পরিণত হয়—সত্ত্বপ্রধান ত্যাগের আদর্শ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। ত্যাগের উচ্চাদর্শের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা-কল্পে এই জন্য ভগবান্ কর্ম্মনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়াছেন। পরন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া জীবকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়—জন্মমৃত্যু প্রবাহে বার বার যাতায়াত করিতে হয়। এই জন্য ভগবচ্চরণে কর্ম্মের ফলাফল অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ। স্বার্থজড়িত থাকিলে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না—বাদবিসম্বাদে জীবন উদ্বেলিত হয়। ত্যাগের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। ঈশ্বরোদ্দেশে কৃত কর্ম্মফলে জীব কদাপি বদ্ধ হইতে পারে না। ত্যাগের উচ্চাদর্শে শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। এই জন্যই নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা ত্যাগের আদর্শ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

স্বামিজী একদা বলিয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গীতোক্ত সকাম ধর্ম্মের উদ্বেল প্রবাহে ইদানীং পাশ্চাত্য দেশ প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। আর প্রভু যীশুর সাম্যবাদ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। উভয়ের সামঞ্জস্য হওয়াই ইদানীং প্রয়োজন হইয়াছে। কর্ম্মহীনতার পরাকাষ্ঠায় উপনীত জনগণকে এদেশে গীতার ধর্ম্ম-গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দেশবাসী জনগণকে যীশুর সাম্যবাদ গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই জগৎ উন্নতির পথে—ত্যাগের আদর্শ পন্থায় অগ্রসর হইতে পারিবে।

স্বামিজীর কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। ব্যবহারিক জগতের সুখ দুঃখ ভালমন্দ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাবের পরিমাণ সমভাবেই বিদ্যমান আছে ও থাকিবে। দেশকালবিশেষে কোথায়

কখন বা এই সকল দ্বন্দ্বভাবের উচ্চাবচ ভাব পরিলক্ষিত হয়। কোথাও রজস্তমের আধিক্য, কোথাও বা সত্ত্বরজের প্রাবল্য ইত্যাদি। সকল দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়ম রক্ষার্থ দেশ ও কালবিশেষে মহাপুরুষগণের অভ্যুদয় হয় যাঁহারা প্রকৃতির সাম্য বজায় করিতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জীব ও জগতের হিতার্থে কর্ম্ম করেন। যে দেশে ঘোর রজস্তমোভাবের দিগ্‌দেশ-গ্রাসী ব্যাদান, সে দেশে সত্ত্বপ্রধান সাম্যবাদের প্রকটনকল্পে প্রভু যীশুর অভ্যুদয়। যেখানে সত্ত্ব ভাণে আচ্ছাদিত পরন্তু জড়তার ক্রোড়ে নিদ্রিত জীবকুল ঘোরতামসভাবাপন্ন, সে দেশ ক্লীবতানিন্দা-কারী শ্রীকৃষ্ণের গীতানির্ঘোষে মুখরিত। এই সকল মহাপুরুষগণের পবর্ত্তিত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জীবকুল ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়।

ঘোরতমসাচ্ছন্ন, দাসসুলভ হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরিত এদেশবাসীকে কথঞ্চিৎ রজোভাবে অনুপ্রাণিত করিতে মহাশক্তির ইচ্ছায় পাশ্চাত্য-গণ এদেশের ভাগ্যবিধাতারূপে বর্ত্তমান। পরন্তু তাঁহারা আবার প্রবল রজস্তমোভাবের আদর্শে প্র ৬।• অযুতশতাব্দী-সঞ্চিত ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তিবলে অনুপ্রাণিত হইবে বলিয়া তাঁহারা এদেশে আসিয়াছেন। এ দেশবাসিগণ রজঃপ্রধান রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক সহজাত তামসভাব অতিক্রম করিবে বলিয়া তাঁহাদের শাসনাধীন রহিয়াছে। এই আদান প্রদান পরিসমাপ্ত হইলেই হিংসাদ্বেষ, শাস্য শাসক ভাব জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইবে। ইহাই প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়। এই আদান প্রদানে পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতি অপেক্ষা করিতেছে। সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞলোক বুঝিয়াছেন, এই ত্রিলোক-সংক্ষোভী সংগ্রামাবসানে ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবল বন্যায় পাশ্চাত্য ভূখণ্ড প্লাবিত হইবে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সুখের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবে। পক্ষান্তরে প্রাচ্য ভূখণ্ডও রজঃশক্তি-সহায়ে জীবনসংগ্রামোপযোগী প্রভাব বিস্তারে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখিবে। এই আদান-প্রদানে জীবকুল ধন্য হইবে— জগতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, হে রজঃপ্রধান পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ তোমরা রজোভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া জড়ভাবাপন্ন ভারতকে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার উপযুক্ত কর। কথঞ্চিৎ কর্ম্মপ্রবণ সঙ্ঘ ও জাতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া তাহাদের উৎসাহের বাধা দিও না। আমাদিগকে তোমাদের প্রবল রজঃশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত কর। দেশে শান্তির বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে তোমরাও ভারতের প্রবল আধ্যাত্মিকতা লাভে প্রস্তুত হও; তোমাদের লোকক্ষয়কারী পাণ্ডবলীলার অবসান হইবে! আমরা সত্ত্বপ্রবল ত্যাগের আদর্শ লইয়া তোমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান। উভয়ের আদান-প্রদানে উভয় ভূখণ্ড উপকৃত হইবার দিন আসিয়াছে।

সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত আছে, প্রকৃতি জড় কিন্তু চলৎস্বভাবা। পুরুষ অচল কিন্তু চক্ষুষ্মান্। ইহাকেই অন্ধপঙ্গু ন্যায় বলে। এই উভয়ের অপূর্ব্ব সংযোগেই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে। প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে। প্রাচ্যদেশও তেমনি পুরুষ স্থানীয় চক্ষুষ্মান্—আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বলে বলীয়ান্। পাশ্চাত্য দেশ আবার প্রকৃতিস্থানীয়—কেবলই চলৎস্বভাব। জগতের শান্তি সংস্থাপন কল্পে প্রকৃতিস্থানীয় পাশ্চাত্য দেশকে আমাদের দৃষ্টিশক্তির—আধ্যাত্মিকতার সাহায্য লইতে হইবে। পক্ষান্তরে প্রকৃতিস্থানীয় পাশ্চাত্য দেশের চলৎস্বভাব পুরুষ স্থানীয় আমাদিগকে কর্ম্মপথে পরিচালিত করিবে—ইহাই প্রকৃতির অভিপ্রায়। এই প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ সময় উপস্থিত হইয়াছে। চিরশান্তির রক্তিমাভা পূর্ব্বাকাশে প্রতিফলিত হইয়াছে। চক্ষু থাকে ত চাহিয়া দেখ, এই মহাসমন্বয় দর্শন জন্য দেবগণ আকাশে সমবেত হইয়াছেন। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥

স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ।

(মঠের ব্রহ্মচারীদিগের প্রতি)

হৃষীকেশ হইতে আগত মঠের কয়েকটী সাধুর প্রতি—তোরা সব হৃষীকেশী সাধু হয়ে গেলি! তাদের বোল্ 'জগৎ ত ত্রিকালমে হায় নেই'—সেখানে এক একখানা গেরুয়া প'রে ভিক্ষে ক'রে বেড়ান ও গৃহস্থদের ঠকাবার জন্য গীতা ও বেদান্তের শ্লোক মুখস্থ করা, এই কল্লে সাধু হ'য়ে গেল? ও সব বাবা এখানে চ'ল্‌বে না। এ ঠাকুরের রাজত্ব। তাঁকে Ideal ক'রে নিয়ে ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস যাতে বাড়ে তাই ক'র্ত্তে হবে। ঐ সব দিয়ে জীবনকে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে, তবে ত হবে। তা না—একখানা গেরুয়া কাপড় নিয়ে হৃষীকেশী সাধুর মতন শুধু ফড়র্ ফড়র্ ক'রে শ্লোক ঝাড়্‌লেই সাধু হলো! পাখীর মত শ্লোক শুধু মুখে আওড়ালে চ'ল্‌বে না! জীবন চাই! জীবন—জ্বলন্ত জীবন! জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। তা না, এক একখানা গেরুয়া কাপড় পরা ও শ্লোক মুখস্থ করা—ছ্যা, ছ্যা!

আজ কয়েক জন ভক্ত এসেছিল; তারা কথায় কথায় বল্লে আমাদের গুরুদেব খুব গীতা প'ড়্‌তে বলেন। আমি বল্লুম, 'শুধু প'ড়্‌লে কি হবে? জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে।' তা না হ'লে কিছু হবে না;—ঠাকুর ব'ল্‌তেন 'গীতা দশবার উচ্চারণ ক'ল্লে যা হয়, গীতা মানে তাই।' অর্থাৎ গীতা, গীতা, গীতা—কি না, ত্যাগী, ত্যাগী, ত্যাগী। ত্যাগী না হ'লে কিছুই হবে না। ত্যাগই হ'চ্চে মূল মন্ত্র। আর এক মাত্র ত্যাগেতেই শান্তি। এ ছাড়া আর পথ নেই। তোরা সব গীতা হ'য়ে যা, অর্থাৎ মনের ভেতর থেকে, শুধু বাহিরে নয়, ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'য়ে যা। ত্যাগী না হ'য়ে শুধু গীতা মুখস্থ ক'ল্লে আর কি হবে? আজ কাল ঘরে ঘরে ত গীতা রয়েছে ও অনেকে

প'ড়ছে। কিন্তু তবুও হ'চ্চে না কেন? কি ক'রে হবে? মন যে বিষয়ে আসক্ত! তা হ'লে কি হয়? ত্যাগ চাই, তবেই গীতার মর্ম্ম বুঝ্‌বে। ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ। ঠাকুরকে ছাখ্‌ না। কি ত্যাগী! টাকা স্পর্শ ক'র্ত্তে পার্ত্তেন না; হাত বেঁকে যেত! তোরা তাঁকে Ideal করে নিয়ে জীবনকে গ'ড়ে তোল্‌ না।

পবিত্র হতে হবে, পবিত্রতাই ধর্ম্ম। মন মুখ এক ক'র্ত্তে হবে। ঠাকুরকে দেখেছিলুম, পবিত্রতার জমাট মূর্ত্তি! জনৈক ব্যক্তি ঘুষ নিয়ে উপরি রোজগার ক'র্ত্তেন—তিনি একদিন ঠাকুরের সমাধি অবস্থায় তাঁর পা ছোঁয়াতে তিনি আঁক ক'রে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন। ঠাকুর সমাধি অবস্থায় প'ড়ে না যান এইজন্য তাঁকে ধ'রে থাক্‌তে হ'ত। আমাদেরও তাই ভয় হ'ত, যদি আমাদের ছোঁয়াতে তিনি চীৎকার ক'রে ওঠেন।

আমাদের গুরু-ভাইদের ভেতর কি অমানুষিক ভালবাসা ছিল! লোকে ব'ল্‌তো, এ রকম ত কখনও দেখিনি। গুরুভাইয়ে গুরুভাইয়ে ত লাঠালাঠিই হ'যে থাকে। এ এক নূতন রকম দেখ্‌ছি। ঠাকুরকে কটা লোক বুঝেছে? আমরাই কি এখনো সব বুঝেছি? স্বামিজী আমেরিকা থেকে ফিরে এলে আলমবাজার মঠে আমাদের একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, 'তুমি ঠাকুরকে কি রকম বুঝেছ?' স্বামিজী ব'ল্লেন, 'ভাই, কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। কেবল তাঁর Outlineটুকু দেখ্‌তে পাচ্ছি।' তোরা পরস্পরে খুব ভালবাসা, প্রীতি রাখ্‌বি। তোরা কি কম মনে কচ্চিস্‌ না কি? ** আমি বাড়িয়ে বল্‌ছি না, হক্‌ কথা ব'ল্‌ছি।'

তোদের ভেতর সেই রকম অমানুষিক ভালবাসা নিয়ে আয়। আমরা স'রে গেলে সহরে সহরে হাঁসপাতালই কর্‌, আর বেদান্তের বক্তৃতা বা আশ্রমই কর্‌, কিছুতেই কিছু হবে না—যদি তোদের গুরুভাইদের ভেতর পবিত্রতা, গভীর ভালবাসা ও সদ্ভাব না আসে।

তোরা সব সিদ্ধ হয়ে যা—অহঙ্কার অভিমান পুড়িয়ে ফেল।

এখানে এলে সব সিদ্ধ—নরম হ'তে হবে; কিন্তু অসত্য বা মিথ্যাকে কাটবার জন্য সঙ্গে সত্যরূপ তলোয়ার রাখ্‌তে হবে। সে সময় খুব রোখা হ'তে হবে। ইউরোপের মহাযুদ্ধে ওরা কত Energy নষ্ট ক'চ্ছে। তোরা ওদের ঐ Energy টুকুই অনুকরণ ক'রে ভগবানের দিকে লাগিয়ে দে।

শিমলা ও সিপিমেলা।

(শ্রীগুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)

ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষে' শিমলা সম্বন্ধে অনেক কথাই প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উহার ঐতিহাসিক বিবরণ বিশেষ করিয়া কেহই বলেন নাই। প্রতি বৎসরই গণ্যমান্য অনেকেই গ্রীষ্মের সময় বেড়াইতে আসেন, কার্য্যোপলক্ষে বহু বঙ্গসন্তানের এখানে বসবাস হইয়াছে। আমরাও প্রায় ২০ বৎসর এখানে আসা যাওয়া করিতেছি। স্বতঃই সকলের মনে হয়, এখানকার কি কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না? ইংরাজীতে দুই একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়—কিন্তু বাঙ্গালী-সাধারণের অবগতির জন্য বঙ্গভাষায় সেরূপ কোন বিশেষ চেষ্টা এখনও হয় নাই। অতএব সে সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিলে ধৃষ্টতা হইবে না।

শিমলার নামকরণ সম্বন্ধে একটু কৌতূহলজনক কথা আছে। বাঙ্গালী যেখানেই গিয়াছেন, কীর্ত্তি রাখিয়া আসিতে ভুলেন নাই। ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী ধর্ম্মের জন্য জীবনে মমতাহীন হইয়া কত দুর্গম স্থানে গিয়াও তাঁহার চিরারাধ্য দেবতার মন্দির স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন। একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এতদূরে আসিয়াও

৺কালীমন্দির স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তাহারও পূর্ব্বে, প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে একজন হিন্দু পরিব্রাজক, সম্ভবতঃ বাঙ্গালী, এই হিমগিরির হিমালয় নামানুসারে অত্রস্থিত সর্ব্বোচ্চ গিরিশিখর জ্যাকো বা যক্ষ * পর্ব্বতে (৮৩০০ ফিট উচ্চ) নির্জ্জনে সাধনাভিলাষী হইয়া একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার নাম "শ্যামালয়" রাখিয়াছিলেন, তদবধি ঐ পর্ব্বতের পদপ্রান্তস্থিত একটি ক্ষুদ্র পল্লী 'শ্যামলা' নামেই প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। এই শ্যামলাই পার্ব্বতীয়গণের উচ্চারণে ক্রমপরিবর্ত্তিত হইয়া 'শামলা', 'শেমলা' ও পরিশেষে ইংরাজগণের সময়ে 'শিমলা' হইয়াছে।

ভারতের সকল স্থানই তাহার একটু পূর্ব্ব ইতিহাস সযত্নে পোষণ করিয়া আসিতেছে, শিমলারও পূর্ব্বেতিহাস জানিবার বিষয়। ভারতের শূর জাতিগণের মধ্যে গুর্খা অন্যতম। যে বিস্তৃত ভূখণ্ড হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে নামিয়া ভারতের সমতল ভূমিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বদাই দুর্দ্ধর্ষ ও যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতি দ্বারা অধিকৃত ছিল কিন্তু অসংখ্য উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা ব্যবধান থাকায় এই বীরজাতিগণ একত্র মিলিত হইয়া একচ্ছত্রাধিকার স্থাপিত না করিতে পারিয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমশঃ গুর্খাগণ উপযুক্ত নায়কের অধীনে পরিচালিত হইয়া নেপালের মনোরম উপত্যকাভূমিসকল অধিকৃত করিয়া তথায় তাহাদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপনা করে এবং ক্রমশঃ খণ্ডরাজ্যগুলিও স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া ভারতের উর্ব্বর সমতল ভূমির উপর লুব্ধনেত্রে চাহিতে থাকে। কিন্তু উত্তরভারত তখন মোগলের দ্বারা শাসিত হইত না—কাজেই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ইংরাজের শিক্ষিত সৈন্যের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তাহার পরই ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দের নেপালযুদ্ধ। নেপালযুদ্ধের ইতিহাসও সকলেই জ্ঞাত আছেন। নেপালের বিরুদ্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্র

* Rev Long's Guide to Simla, 1870

প্রকাশিত হইবার পর লর্ড হেষ্টিংস নেপাল আক্রমণের জন্য চারিটী সেনাবাহিনী প্রস্তুত করাইয়া তাহাদিগকে দানাপুর, বারাণসী, মিরাট এবং লুধিয়ানা এই চারি স্থান হইতে অগ্রসর হইতে অনুজ্ঞা করেন। শেষোক্ত দল জেনারল অক্টারলোণী কর্তৃক পরিচালিত হইয়া লুধিয়ানা হইতে উত্তর পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তেজস্বী গুর্খাগণ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াও পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হয় এবং ইংরাজবাহিনী ক্রমে ক্রমে গুর্খাগণের এক একটি দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। নলাগড়, রামগড়, সুরাজগড়, সর্ব্বশেষে মালন দুর্গ অধিকৃত হইলে শান্তি স্থাপিত হয়। শিমলার পশ্চিমে অবস্থিত এই মালন ঐকাল হইতেই ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই যুদ্ধে শিমলা এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসকল বিজয়লভ্যস্বরূপ ইংরাজাধীনে আসিয়া পড়ে এবং সেগৌলীর সন্ধিসূত্রানুসারে নেপালের বর্ত্তমান সীমা নির্ণীত হয়। যুদ্ধাবশেষে ভারতগবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহী রাজন্যবর্গকে মিত্রশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া তাহাদের ভূসম্পত্তি সকল প্রত্যর্পণ করেন।

১৮১৫ খ্রীঃ হইতেই শিমলা-ইতিহাসের আরম্ভ। যুদ্ধের পর সবাথু, কোটগড় ইত্যাদি কয়েকটী স্থান সেনানিবাসের জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। ইহারঃ অধিনায়কগণ শিমলার কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম পদার্পণ করেন। লেফ্টেনেণ্ট রস্ সর্ব্বপ্রথম একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠগৃহ নির্ম্মাণ করেন। কাপ্তেন কেনেডি পার্ব্বতীয় রাজ্যগুলির প্রথম পলিটিকল এজেণ্ট নিযুক্ত হন। ইঁহারই নির্ম্মিত গৃহ, শিমলার দ্বিতীয় গৃহ, অদ্যাবধি 'কেনেডি হাউস্' নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। (ইহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোচ্‌বিহার মহারাজের গ্রীষ্মাবাস ছিল, এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ইহা ক্রয় করিয়া পুনর্নির্ম্মিত করিয়া সরকারী দপ্তর করিয়াছেন।) কাপ্তেন কেনেডির সময় হইতেই শিমলা জনসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তাঁহার আত্মীয়স্বজন বায়ুপরিবর্ত্তন মানসে গ্রীষ্মকালে এই স্থানে তাঁহার অতিথি হইয়া থাকিতেন এবং এই স্থানের মনোহারিত্ব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও

স্বাস্থ্যের উপযুক্ততায় নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া জনসমাজে ইহার উপকারিতা প্রচার করিতেন। ক্রমে ইহা রুগ্ন, অক্ষম আতুরগণেরই নিকট অধিকতর পরিচিত হইয়া তাহাদের প্রিয়তম স্বাস্থ্যাবাসে পরিণত হইতে থাকে। ইহা শাসনকর্ত্তা ও ধনীলোকদিগেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮২৭ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট ও সৈন্যাধ্যক্ষ ভাইকাউণ্ট কম্বারমিয়র কিছুকালের জন্য এখানে বাস করিয়া যান। ক্রমেই ইহার খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিলে গবর্ণমেণ্ট ইহাকে ক্রয় করিতে মানস করিয়া ১৮৩০ সালে কাপ্তেন কেনেডির দ্বারা কেঁওথালের রাণা ও পাতিয়ালার মহারাজার নিকট হইতে তাঁহাদের শিমলার অংশটুকু ক্রয় করেন।

শিমলা ইংরাজের স্বাধিকারভুক্ত হইবার পর তথায় রাজপ্রতিনিধি ও সৈন্যাধ্যক্ষদিগের গ্রীষ্মাবাস প্রস্তুত হইতে থাকে এবং তাঁহারা এখানে প্রতিবৎসর সদলবলে আসিয়া গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিয়া যাইতেন। বহু অবসরপ্রাপ্ত ও অক্ষম কর্ম্মচারিগণ ইংলণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া শিমলাতেই তাঁহাদের বানপ্রস্থাশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেন। এইরূপে ইহা প্রসিদ্ধিলাভ করিতে থাকে। ১৮৩২ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এইখানে বসিয়াই প্রতাপশালী শিখরাজা রণজিৎসিংহের প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করেন এবং রাজ্যসম্বন্ধে কোন বিশেষ বিষয়ের মীমাংসা করেন। ১৮৩৮ সালের ২৫ শে জুলাই এইখানেই কাবুলের শাহ সুজা, পঞ্জাবের রণজিৎসিংহ ও ভারতের ব্রিটীশ রাজপ্রতিনিধির 'ত্রিপক্ষীয় সন্ধি' স্থাপিত হয়। এই সন্ধির ফলেই ১৮৩৮-৩৯ সালের আফগান-যুদ্ধ। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের তরঙ্গ এখানেও সামান্যরূপে অনুভূত হয়। শিমলার নিকটবর্ত্তী জুটগ বা জগৎগড় হইতে একদল গুর্খাসৈন্য বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করে কিন্তু সুবন্দোবস্তে সে বিদ্রোহাগ্নি প্রশমিত হয়। ১৮৬৪ সালে রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মন্ত্রিসভা ও দপ্তরাদির সহিত গ্রীষ্মকালে শিমলায় বাস করেন এবং তদবধি কেবলমাত্র ১৮৭৪ সাল—বাঙ্গলার চিরস্মরণীয় দুর্ভিক্ষের সাল— ব্যতীত প্রতি-

বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্ট গ্রীষ্মকাল এই স্থানেই অতিবাহিত করেন। ১৮৬৯ সালে ইহার লোকসংখ্যা ১৪৮৪৮ ছিল, এখন প্রায় চল্লিশ হাজারেরও উপর স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শিমলা এখন Improvement Trustর হাতে পড়িয়া সুরূপ ও মনোহর হইয়া উঠিতেছে। যুদ্ধের জন্য এই সমিতি এখনও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার উৎকর্ষসাধনের জন্য রাজকর্ম্ম-চারীরা কখনই শ্রমকাতরতা দেখান নাই, রাজকোষ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। জ্যাকো পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে যে সুন্দর রাস্তা উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, ১৮৩০ সালে লর্ড কম্বারমিয়র স্বয়ং উহার নির্ম্মাণ কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ সালে সর্ হেনরী ফেন শিমলার সদর রাস্তাগুলি প্রস্তুত করাইয়া যান। এই ফেন সাহেব যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন রাস্তা প্রস্তুত করানই তাঁহার প্রিয় কার্য্য ছিল। এই বিষয়ে তাঁহার অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া লোকে তাঁহাকে 'পাগলা' ফেন বলিত। ১৮৫০ সালে সর চার্লস্ নেপিয়ারের সময় প্রসিদ্ধ কাল্‌কা শিমলা কার্টরোড, এবং ব্রীগস্ সাহেব কর্ত্তৃক গ্রেট হিন্দুস্থান ও তিব্বত পথ প্রস্তুত হয়। এই পথ ইংরাজের এক চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। কটিমেখলাস্বরূপ এই পথ হিমাদ্রির কটি বেষ্টন পূর্ব্বক তিব্বত ও ভারতের সংযোগ সাধিত করিয়াছে। ১৮৮৫ সালে Army Headquarters (ভারতীয় সমর দপ্তর-গৃহ) এবং ১৯০৪ সালে Gorton Castle অর্থাৎ সিভিল সেক্রেটেরিয়েট গৃহ প্রস্তুত হয়। টাউনহলটি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাকে শিখরচ্যুত করিয়া রাখা হইয়াছে কিন্তু যুদ্ধের জন্য এখনও তাহাকে তদবস্থায় শ্রীহীন হইয়া থাকিতে হইয়াছে। ১৮৪৪ সালে শিমলার প্রসিদ্ধ ক্রাইষ্ট চার্চ্চ স্থাপিত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্যামলা-দেবীর মন্দির * ইহারই উপর, এখন যেখানে রথনী ক্যাসল্ নামক

* এরূপ কথিত আছে যে, শিমলায় প্রথমে যখন গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছিল তখন ইংলণ্ডের কোন বীর সন্তান ৺কালীমন্দিরের নিকট আপন আবাসস্থল নির্ম্মাণ করিবার মানস করিলে মন্দিরটি তাঁহার বিঘ্নস্বরূপ বোধ হইতে থাকে। একদিন তিনি

বাটী আছে, তথায় স্থাপিত ছিল। ১৮৩৫ সালে বিগ্রহটী স্থানান্তরিত করিয়া বর্ত্তমান ৺কালী বাটীতে আনা হয় এবং ১৮৪৫ সালে পশ্চিমাঞ্চলে কালীমন্দির স্থাপয়িতা সাধক রামচরণ ব্রহ্মচারী মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া যান। বর্ত্তমান মন্দিরটি দেখিবার সামগ্রী হইয়াছে, পাঁচ ছয় হাজার মুদ্রা ব্যয় করিয়া মার্ব্বেল প্রস্তর ইত্যাদি দ্বারা পুনর্গঠিত করিয়া মন্দিরের যে সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে তজ্জন্য মন্দিরের ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়ক ৺হরিদাস গুপ্ত, এবং বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দোপাধ্যায় এবং পুরোহিত শ্রীযুক্ত দেবীচরণ ভট্টাচার্য্য শিমলার বাঙ্গালী জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়া আছেন। শিমলার উত্তর পূর্ব্বদিকে মশোবরা টনেলও একটি দর্শনীয় জিনিষ। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫৬০ ফিট্। সম্প্রতি আর একটি টনেল বাজারের মধ্য দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। মশোবরা টনেল সম্বন্ধে একটু অখ্যাতি আছে। যখন লর্ড কিচ্‌নার ভারতের সৈন্যাধ্যক্ষ, তাহার পূর্ব্ব হইতেই টনেলটির প্রতি শিমলা মিউনিসিপালিটির বিশেষ সুনজর ছিল না। ইহা অপ্রশস্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় দেশীয়গণের যাতায়াতের জন্যই ছিল। একদিন সন্ধ্যায় ভারতের জঙ্গীলাট লর্ড কিচ্‌নার একাকী অশ্বারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ফিরিবার মুখে, তাঁহার অশ্ব কোনপ্রকারে ভয়চকিত হওয়ায়, পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকেন। ইহা ১৯০৭ সালের কথা; তাহার পর এই টনেলটির অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখনকার পানীয় জল সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত আর একটি দেখিবার বিষয়। ১৮৬৪ সাল হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর শিমলায় শুভাগমন করিতে থাকায় ও লোক-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ার সহিত জলকষ্ট বিশেষরূপে অনুভূত হইতে

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বিগ্রহটি টান মারিয়া খড়ে ফেলিয়া দেন। রাত্রে স্বপ্নাবেশে দেবী তাঁহাকে তিরস্কার করিলে প্রাতে বিগ্রহটি কুড়াইয়া আনিয়া যথাস্থানে স্থাপিত করেন। এ সম্বন্ধে Towell's Guide to Simla নামক পুস্তকে ঐরূপ একটী কথা আছে। ইহা ১৮৩০ সালের কথা।

থাকে। তখন পর্ব্বতনির্ঝরিণীর জল অবরুদ্ধ করিয়া তাহাকেই পানীয় জলে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য ছোট শিমলার পথে Combermere Brigde এর নীচে একটী পুষ্করিণী প্রস্তুত করা হয়। আজও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এখন কিন্তু কলের জল হইয়াছে। শিমলার উত্তর পূর্ব্বে প্রায় ৯ মাইল দূরে মহাশু পর্ব্বতের পাদদেশে গভীর খদ্ প্রস্তুত করাইয়া শীতের বরফ ও বর্ষার বৃষ্টি ধরিয়া রাখা হয়। ইহাকে Catchment Area নাম দেওয়া হইয়াছে। এই জল এই ৯ মাইল পথ অতিবাহিত করিয়া শিমলার নিকটবর্ত্তী লালপানি নামক স্থানে আনা হয় এবং এই স্থানে পরিষ্কৃত হইলে দমকলের সাহায্যে শিমলার চতুর্দ্দিকে সরবরাহ করা হয়। মধ্যে আবার জলপ্রপাতদ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তিকে ব্যবহারে আনিয়া অন্য প্রকারে জলসরবরাহের প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৮২ সালে মহাত্মা রিপণ সাহেব এখানকার দরিদ্র দেশীয় অধিবাসিগণের জন্য রিপণ হাঁসপাতাল স্থাপিত করিয়া যান। ইহাই এখন দেশীয়গণের একমাত্র হাঁসপাতাল। ইহার সহিত প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণী স্বর্ণময়ী ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ও অন্যান্য দাতাগণের নাম জড়িত আছে।

এখন যাঁহারা শিমলায় আসেন পূর্ব্বের তুলনায় তাঁহাদের বিশেষ কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় না। পূর্ব্বে শিমলাযাত্রিগণের কিরূপ লাঞ্ছনা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইত তাহার একটু আভাস না দিলে পাঠক ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। ১৮৯০ সালের পর অম্বালা কালকা রেলপথ খুলিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে শিমলা যাত্রীদিগকে অম্বালায় নামিয়া ৩৮ মাইল পথ ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া কাল্‌কায় আসিতে হইত। তখনকার পথের কষ্ট এখনও দুই চারি জনের স্মরণ থাকিতে পারে। সন্ধ্যার পর ডাকগাড়ী অম্বালায় আসিত এবং রাত্রি ১১টার পূর্ব্বে আহারাদি সারিয়া ঐ সময় অম্বালা ত্যাগ করিতে হইত। বৃটিশ-সন্তানের ভারতে কোন সময়েই কোন কষ্ট নাই, তাঁহাদের জন্য হোটেল সদা অবারিতদ্বার ও সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য। কিন্তু বাঙ্গালীদের না ছিল ভাল

বসিবার স্থান, না ছিল আহারের ব্যবস্থা! যে কোন প্রকারে হউক তাহা সারিয়া লইয়া ডাকগাড়ীতে উঠিয়া ঘর্ঘরা নদীর তীরে আসিয়া নামিতে হইত। এই পার্ব্বত্য নদী অন্য সময় শুষ্ক বালুরেখার ন্যায় পড়িয়া থাকে কিন্তু বর্ষাকালে হিমালয়ের জলরাশি বহন করিয়া তাহার যে উদ্দাম গতি হয় তাহা একপ্রকার ভীষণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। গ্রীষ্মকালে গোযানে এবং বর্ষাকালে হস্তিপৃষ্ঠে এই নদী পার হইতে হইত, হস্তিপৃষ্ঠে পার্ব্বতীয় নদী পার হওয়া যে কত দুঃসাহসিকতার কার্য্য, বিশেষ বাঙ্গালী কেরাণীকুলের পক্ষে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই পথ অতিবাহিত করিতে পারিলেই ঊষার অরুণরাগের প্রথম উন্মেষের শোভা দেখিতে দেখিতে পথিক হিমগিরি-পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া যোগীশ্বরের ধ্যানমগ্ন গম্ভীর মূর্ত্তির ন্যায় এই অবিচলিত প্রশান্ত মূর্ত্তির সমক্ষে স্বতঃই নতশির হইয়া পড়িত। পথে পাতিয়ালার বিখ্যাত 'পিঞ্জোর বাগান'—এখন ইহা শ্রীভ্রষ্ট। কাল্‌কা (বা কালিকা, জনশ্রুতি এই যে, এই স্থানটি পুরাণোক্ত শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধস্থল) হইতে দুইটি পথ শিমলায় আসিয়াছে। একটি নূতন, ৫৮ মাইল। ইহাই বর্ত্তমান কার্ট রোড। ইহা অতি নিপুণতার সহিত ক্রমোচ্চভাবে প্রস্তুত হওয়ায় সকল প্রকার যান বাহনাদির যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। দ্বিতীয়টি পুরাতন ও আদিম পথ। এই পথে শিমলায় পৌঁছিতে বিলম্ব হইত। এক্ষণে আবার রেলপথ হওয়ায় পুরাতন দুইটি পথই শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে।

শিমলার কথা বলিতে হইলে শিমলার পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যগুলির বিষয় কিছু না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ১৮১৫ সালের গুর্খাযুদ্ধের পর এই পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি ইংরাজশাসনাধীনে আসিয়াছে। তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইহাদিগের স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হয় নাই বরং সন্ধিসূত্রের* দ্বারা তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। এই রাজ্যের অধিপতিগণ সকলেই রাজপুতবংশীয় এবং প্রায় তাঁহারা রাণা

* Aitchison's Treaties and Sanads, 1892.

নামেই পরিচিত। গুর্খাগণের দৌরাত্ম্যের অবসান হইলে ইহারা ভারতগবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে এখন বেশ নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তভাবে রাজ্য ভোগ করিতেছেন। এই পার্ব্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে কুড়িটী ক্ষুদ্র রাজ্য উল্লেখযোগ্য। শিমলার ডেপুটী কমিশনার মহোদয় এই রাজ্য-গুলির পলিটিকাল এজেণ্ট। শতদ্রু হইতে যমুনোত্রি এবং অম্বালা হইতে প্রায় তিব্বতসীমানা পর্য্যন্ত এই রাজ্যগুলির বিস্তার। মামুদ গজনবির ভারত আক্রমণের সময় এবং পরবর্ত্তীকালেও মুসলমানদিগের সহিত সীমান্ত প্রদেশে রাজপুতদিগকে অনবরত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত অধিকাংশ অধিনায়কদিগকে স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিতে হইত। সমরসজ্জিত দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতজাতি-গণ সময় ও সুবিধা পাইলেই পার্ব্বত্য প্রদেশগুলি আক্রমণ করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। এই সময় হইতেই এই স্থানে রাজপুতের গতিবিধি আরম্ভ হয়। সমরক্ষেত্রে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে মুসলমানদিগের হস্তে কেহ কেহ পরাজিত হওয়ায় দেশে ফিরিয়া না যাইয়া পূর্ব্বোক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশগুলিতে স্বীয় স্বীয় স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে মনোনিবেশ করিতেন। ক্রমশঃ উত্তরাখণ্ডের অধিকাংশই রাজপুতের অধীন হইয়া পড়ে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে শিমলার দক্ষিণপূর্ব্বে নাহান বা শিরমুর রাজ্য, উত্তরপশ্চিমে বিলাসপুর, উত্তরে বশাহর, পশ্চিমে নলাগড়, পূর্ব্বে কেঁওথাল প্রধান। কথিত আছে যে, যশলমীরের উগ্রসেন রাও শিরমুর রাজবংশের আদি পুরুষ। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উগ্রসেন রাও এই প্রদেশ অধিকার করেন; তদবধি ঐ বংশই সিংহাসন অধিকার করিয়া রহি-য়াছেন। শিরমুর (অর্থাৎ মুকুটপরিহিত শির) স্বাধীনতা, সভ্যতা এবং রাজ্যসংক্রান্ত সকল বিষয়েই অন্যান্য রাজ্যগুলির অগ্রগণ্য। বর্ত্তমান অধিপতির খুল্লতাত বীর বিক্রমসিংহের ইংরাজদরবারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি। তাঁহার সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে Honorary Lieutenant

---

* Towell's Guide to Simla.

Colonel in the Army নিযুক্ত করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুকরণে এই রাজ্যে দেওয়ানী, ফৌজদারী, রেভিনিউ আদালত, ইংরাজ কর্ম্মচারীর অধীনে দুই তিন দল সৈন্য, পূর্ত্ত বিভাগাদি, লৌহ ঢালাইয়ের কারখানা ইত্যাদি প্রায় সমস্তই আছে। বশাহরের রাজধানী রামপুর, শতদ্রু নদের তীরে অবস্থিত। রামপুর রামপুরী চাদরের জন্য বিখ্যাত। প্রতি বৎসর ১১ই। ১২ই নভেম্বর এই স্থানে এক বড় মেলা বসিয়া থাকে, সেই সময় তিব্বত হইতে তিব্বতী ছাগলের পশম আমদানী হইয়া থাকে, এই পশম অমৃতসহরে চালান হইয়া তথায় রামপুরী চাদর প্রস্তুত হয়। এই পশমে মলিদা, গায়ের কাপড়, অপেক্ষাকৃত মোটা পশমে পট্টু বা পাহাড়ী লুই এবং এখানকার বিখ্যাত 'গোদ্‌মা' কম্বল প্রস্তুত হয়। বশাহর রাজ্যে দেবদারু জাতীয় বড় বড় কেলু বৃক্ষের বন আছে। পঞ্জাবের অধিকাংশ রেলপথের ও গৃহাদির কাষ্ঠ এই স্থান হইতে সংগৃহীত হয়। ইহার পশ্চিমে নলাগড় বা হিন্দোর, ইহা নলাগড়ি প্রস্তরের জন্য বিখ্যাত।

এইবার শিমলার বিখ্যাত সিপিমেলার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। শিপিমেলা শিমলার ব্যস্ত জীবনের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। সেই দিন সুন্দর প্রভাত হইতে শিশিরসিক্ত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোকতরঙ্গ শিপির পথে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। স্থানের রমণীয়তা ও মেলার নামে আকৃষ্ট হইয়া বহু ইংরাজ ও বাঙ্গালী সিপির দিকে ধাবিত হন। পূর্ব্বে রাজপ্রতিনিধি ও সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয়েরা সদলবলে তথায় উপস্থিত হইয়া রাণাকে অনুগৃহীত ও আনন্দিত করিতেন। এখন অবশ্য তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মেলার মনোহারিত্ব ও খ্যাতি এতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে যে, সে দিন পর্ব্বদিনের ন্যায় শিমলার সমস্ত আফিস আদালত বন্ধ থাকে, যাহাতে শ্রমজীবী হইতে শাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত সকলেই এই আমোদে যোগদান করিতে পারেন। রাজপ্রতিনিধি মহোদয় শিমলায় গ্রীষ্মানুভব করিলে শিমলার উত্তরপূর্ব্ব মশোবরা নামক স্থানে গমন

করিয়া থাকেন। এই মশোবরা বাজার হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ নীচে নামিলে এক শ্যামল সুন্দর উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হয়। তরুচ্ছায়া-সমন্বিত, শীতল সমীরণস্নিগ্ধ এই মনোরম সমতল ভূমিখণ্ড মেলার সময় অধিকতর মনোরম হইয়া উঠে। কিছু দূরে একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী স্থানটিকে বেষ্টন করিয়া আছে। নির্ঝরিণীর কুল কুল শব্দ, বাতাসের মৃদু হিল্লোল চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনীতে পিকবরের ন্যায় মন মাতাইয়া তুলে। এই স্থান কোটির রাণার অধিকারভুক্ত। এইখানে সিপি দেবীর মন্দির অধিষ্ঠিত আছে। ইনি কোটি রাজবংশের ও ঐ স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। প্রত্যেক বৈশাখী পূর্ণিমায় এই মেলা বসে এবং দুই দিন পর্য্যন্ত থাকে। পূর্ব্বে ইংরাজ দর্শকের চিত্তবিনোদনের জন্য রাণা বিবিধ বন্দোবস্ত রাখিতেন। ধনুর্ব্বাণ খেলা, হস্তিপৃষ্ঠে উঠিয়া জনতরঙ্গের মধ্যে দ্রুত ধাবমান হওয়া, সর্পের খেলা, তরবারীযুদ্ধ অন্যান্য বহুবিধ খেলাও বন্দোবস্ত থাকিত। কখন কখন বিখ্যাত পালোয়ানের মল্লযুদ্ধ মেলাকে সজীব করিয়া রাখিত। মেলার অধিকাংশই স্ত্রীলোক। প্রকৃতপক্ষে ইহা স্ত্রীলোকেরই মেলা। ইহাদের কেহ কেহ রাজপুতবংশীয়, কেহ কেহ পঞ্জাবী আর্য্যবংশসম্ভূত—দেখিতে গৌরাঙ্গী, কেহ কেহ পরম রূপবতী, মুখের গঠন অনেকটা কাশ্মীরী রমণীদিগের ন্যায় মেলার দিন তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট বসনভূষণে ভূষিত হইয়া চক্ষে কজ্জল দিয়া বিকশিতবদনে দলে দলে নির্ঝরিণীর পার্শ্বে বেড়াইতে দেখিলে সত্যই মনে হয়, এই স্থিরযৌবনা সুন্দরীর দল যেন স্বর্গভ্রষ্টা অপ্সরী-বৃন্দ, সৌন্দর্য্য-সরসীতে স্নান করিবার জন্য মর্ত্তে নামিয়াছে। সৌন্দর্য্যের সর্ব্বত্রই ছড়াছড়ি—অনেকে আবার তাহাই দেখিতে ছুটিয়া যান! এখানকার বদ্ধমূল জনশ্রুতি এই যে, এই মেলায় স্ত্রীবিক্রয় হইয়া থাকে।* কথাটা নিতান্ত অমূলক না হইতেও পারে। আমরা এ সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদিগের প্রমুখাৎ

* Simla Past and Present Towell's Guide to Simla.

বা পুরাতন অধিবাসিগণের নিকট হইতে যতটুকু সত্য কথা আদায় করিতে পারিয়াছি তাহা এই যে, এই মেলা বাহিরে যাহাই হউক, ভিতরে ভিতরে ইহা একটি বিবাহ-বাজার। পার্ব্বতীয় যুবক মনোমত পত্নীলাভের আশায় সম্বৎসর অপেক্ষা করিয়া এই সময়ে উচিতমূল্যে স্ত্রীগ্রহণ করিয়া থাকে। এখানকার বিবাহপ্রথায় একটু বিশিষ্টতা আছে। এখানে বিবাহার্থী যুবক কন্যার পিতা বা অভিভাবককে উচিতমত অর্থ না দিতে পারিলে তাহার পাণিগ্রহণে সমর্থ হয় না এবং ইহা সত্ত্বেও বিবাহবন্ধনের নিয়ম এই যে, স্ত্রীর স্বামীগৃহ বা স্বামীসহবাস মনোমত না হইলে বিবাহপণস্বরূপ যে অর্থ গৃহীত হইয়াছিল, তাহা স্বামীকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিলেই বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনা হইয়া অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে। সিপিমেলায় এইরূপ স্ত্রীসংখ্যাই অধিক এবং এইরূপে এখানে বিবাহার্থী যুবকযুবতীগণের মিলন সাধিত হইয়া থাকে। এই দেশীয় প্রথাটী অনেকের চক্ষে বিসদৃশ বোধ হইতে পারে, তবে সকল বিষয়েরই ভাল মন্দ দুই দিক্ আছে। মন্দ অভিপ্রায়ে এরূপ স্থলে উক্ত প্রথার গুপ্ত প্রচলন যে একেবারেই নাই তাহাও বলিতে পারা যায় না। রাজধানীর সকল সভ্যতা এইরূপই ফল প্রসব করিয়া থাকে। এখন এ প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দিন শিমলাবাসীদিগকে সিপির দিকে ধাবিত হইতে দেখা যায় না। সে দিনকার মেলা পার্ব্বতীয়গণের জন্য। যাহা হউক সিপিমেলা এখানকার একঘেয়ে জীবনের একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

তথাগত-বশিষ্ঠ-সংবাদ।

(শ্রীগোকুলদাস দে, এম, এ)

একদিন মনোহর সায়ংকালে যোগিরাজ শাক্যসিংহ ধ্যান হইতে উঠিয়া শ্রাবস্তী বিহারের পশ্চিমাংশে মুক্তপ্রদেশে পাদচারণ করিতে-ছিলেন। তখন অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মিচ্ছটায় গগনমণ্ডল সুবর্ণমণ্ডিত হওয়ায় সেই কষিত-কাঞ্চন-কান্তি তথাগতের দেহজ্যোতি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া দর্শকের প্রাণে কোন্ অমৃতময় রাজ্যের সংবাদ আনিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবের বিস্তার করিতেছিল। বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ নামক ব্রাহ্মণদ্বয় কিছুদিন যাবৎ জাত্যভিমান ত্যাগ করতঃ ভিক্ষুপদবী লাভেচ্ছু হইয়া বিহারে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা তথাগতের সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শনে যারপর নাই মুগ্ধ হইলেন এবং উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্ব স্ব জটিল প্রশ্নের সমাধানে তৎসান্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করতঃ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

অনতিকাল মধ্যেই ভগবান্ বশিষ্ঠদেবকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বশিষ্ঠ, তোমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া আগারশূন্য প্রব্রজ্যা লইয়াছ বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তোমাদের নিন্দা করে না? বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবন্, তাঁহারা আমাদের যথেষ্টই নিন্দা করেন। ভগবান্ তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিলে বশিষ্ঠ-দেব বলিলেন, ভগবন্, ব্রাহ্মণগণ বলেন তাঁহারাই একমাত্র শুদ্ধ, পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ; কেবলমাত্র তাঁহারাই ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, সে কারণ তাঁহারাই ব্রহ্মার আত্মীয়, অপর বর্ণেরা নহে। আর শ্রমণেরা 'নেড়া' ও নীচ-বৃত্তি-জীবী মাত্র, এই বলিয়া আমাদের কুৎসা করেন।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। বিহারপ্রদেশ উজ্জ্বল দীপমালায়

আলোকিত হইল। ভগবান্ সমীপস্থ আসনে উপবেশন করিয়া আগত ভিক্ষুমণ্ডলীর সম্মুখে বশিষ্ঠকে মধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন :—

হে বশিষ্ঠ, সেই ব্রাহ্মণ সকল পুরাতনকে ভুলিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য এইরূপ বলিয়া থাকে। বাস্তবিক ব্রাহ্মণকুল এখন স্বাভাবিক নিয়মেই উৎপন্ন হয়, কারণ তাহাদের স্ত্রীকন্যারা স্বাভাবিক নিয়মেই ঋতুমতী ও গর্ভবতী হইয়া সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। অহঙ্কারবশতঃ জন্মের ঐরূপ নির্দ্দেশ ও তোমাদের নিন্দা করিয়া তাহারা বহু অপুণ্য সঞ্চয় করে, জানিবে।

পৃথিবীতে বর্ণের চতুর্বিভাগ দৃষ্ট হয়। যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র। প্রত্যেক বর্ণেই অল্পবিস্তর প্রাণিহত্যা, চৌর্য্য, কামসেবা, মিথ্যা কথা, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য, বৃথা বাগাড়ম্বর, প্রবল আসক্তি, চিত্তবিপর্য্যয় ও ভ্রমপূর্ণ ধারণা প্রভৃতি রহিয়াছে ও লোকে তন্নিবন্ধন নিরয়গামীও হইতেছে এবং ইহাও দেখা যায় যে, ঐগুলি হইতে বিরত থাকিয়া সদাচার দ্বারা প্রত্যেক বর্ণের লোকেই স্বর্গে যাইয়া সুখভোগ করে। ফলতঃ প্রত্যেক বর্ণেই এইরূপ নিন্দনীয় ও প্রশংসার্হ ব্যক্তিসকল বিদ্যমান। ইহা দেখিয়াও ব্রাহ্মণগণ যদি আপনাদেরই শ্রেষ্ঠতা ও অপরের হীনতা প্রতিপন্ন করিতে চাহে, তাহা হইলে জানিও, উহা জ্ঞানিজনের অনুমোদিত নহে। কারণ, একমাত্র ধর্ম্মই জগতে শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া উক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কেহ ভিক্ষু, অর্হৎ, নিষ্পাপ ব্রতচারী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, কৃতকৃত্য, আসক্তিশূন্য, ও সিদ্ধকাম হইবেন। যাঁহার চিত্ত পুনর্জ্জন্মের সমস্ত বন্ধন চিরতরে সমূলে বিনষ্ট হইয়া সম্যক্ জ্ঞানে আলোকিত হইয়াছে, জানিবে তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ। আর ধর্ম্ম ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই সমভাবে শ্রেষ্ঠ ও সুখাবহ।

এক্ষণে কি জন্য ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

বশিষ্ঠ, তুমি জান, আমি শাক্যকুলে জন্মিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছি,

তাহা কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বেশ জ্ঞাত আছেন। আর ইহাও জান যে শাক্যেরা প্রসেনজিতের অধীনস্থ থাকিয়া তাঁহাকে সদা সর্ব্বদা সম্মাননা ও অভিবাদনাদি করিযা থাকে। কিন্তু সেই প্রসেনজিৎ শাক্যদিগের দ্বারা ঐরূপে সম্মানিত ও পূজিত হইয়াও সেই সম্মাননা ও বন্দনা আমায় অর্পণ করিয়া থাকেন। কেন? আমি শাক্যকুলে জন্মযাছি বলিযা? —না আমার শৌর্য্য, বীর্য্য, রূপ, ও বংশমর্য্যাদা তাঁহাপেক্ষা বেশী বলিযা? বাস্তবিক তাহা নহে, আমি সংসারত্যাগী, ধর্ম্মসেবী বুদ্ধ বলিয়াই তিনি আমার সম্মাননা করিযা থাকেন। ইহাতে ধর্ম্মকেই তিনি বাস্তবিক পূজা করিযা থাকেন, আমাকে নহে।

আর দেখ বশিষ্ঠ, তোমরা বহু জাতি, বহু নাম, বহু গোত্র ও বহু কুল হইতে আসিযা পব্রজ্যা লইযাছ। তোমরা কে? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর করিবে, 'আমরা শাক্যপুত্র শ্রমণ',। কিন্তু ইহা তাঁহার মুখেই শোভা পায, যাঁহার তথাগতের উপর অচল ভক্তি-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইযাছে, যাহা কখনও মার, ব্রহ্মা, কোন দেবতা বা ব্রাহ্মণ দ্বারা বিচলিত হইবে না তাঁহারই বলা উচিত, আমি ভগবানের পুত্র, আমি তাঁহার মুখ ও হৃদয হইতে জন্মিযাছি, আমি ধর্ম্মজ, ধর্ম্মনির্ম্মিত বা ধর্ম্মাত্মক। কারণ, হে বশিষ্ঠ, তথাগতের অপর নামই ধর্ম্মকায বা ব্রহ্মকায।

হে বশিষ্ঠ, এই দৃশ্যমান্ জগৎ এক সময়ে আদি কারণে বিলীন হইযা গিযাছিল। তখন বৃহৎ জলরাশির ন্যায এই বিশ্বজগৎ এক মহা অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত ছিল। সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, নক্ষত্র তারকাদি কিছুই ছিল না। দিবা রাত্রি তখনও সৃষ্ট হয নাই। মাস, পক্ষ, ঋতু, বৎসর, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তখন জগতের সংবর্ত্তনান্তে জীবকুল জ্যোতির আকার ধারণ করিযা চিন্ময আনন্দ-ভোজী, স্বযংপ্রভা, বিমানবিহারী ও শুদ্ধাচারী হইয়া বহুদিন অবস্থান করিতেছিল। অতঃপর জগতের বিকাশ হইল।

এই বিবর্ত্তন আরব্ধ হইলে প্রথমে সেই জ্যোতির্ম্ময জীবগণ

মানবাকার প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তাহারা পূর্ব্ববৎ চিন্ময়, আনন্দ-ভোজী, স্বয়ংপ্রভা ও ব্যোমচারী হইয়া শুদ্ধভাবে বহুকাল অতিবাহিত করিল।

এইরূপে বহু দিন গত হইলে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের উপরিভাগে সর উদ্গমের ন্যায় সেই সুবিশাল জলরাশির উপর রসময় পৃথিবীর সঞ্চার হইল। উহা সদ্যোজাত নবনীর ন্যায় বর্ণ ও গন্ধসম্পন্ন এবং উহার আস্বাদ মধুর ছিল।

অতঃপর কোন এক চিন্ময় প্রাণীর রসনায় লালসা জন্মিল। অমনি কৌতুহলবশতঃ অঙ্গুলি দ্বারা এই রসময় পৃথিবীর কিয়দংশ জিহ্বায় গ্রহণ করিলে পর তাহার সর্ব্বশরীরে আস্বাদজনিত সুখের এক প্রবাহ ছুটিল এবং সে তদবধি তাহাই খাইতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া অন্য সকলেও ঐ রসময় পৃথিবী ভক্ষণ করিতে লাগিল। ফলে তাহাদের স্বয়ংপ্রভা অন্তর্হিত হইল। চন্দ্র সূর্য্যের আবির্ভাব হইল। নক্ষত্র, তারকা, দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ঋতু এবং বৎসর সৃষ্ট হইল।

সেই চিন্ময় গতপ্রভ প্রাণিগুলি বহু দিন রসময় পৃথিবী ভক্ষণ করিলে তাহাদের গাত্র স্থূল ভাব ধারণ করিল। বর্ণ বিবর্ণ হইতে লাগিল। কেহ শুক্ল, কেহ কৃষ্ণ—এইরূপ বর্ণভেদ জন্মিতে লাগিল, আর তৎসঙ্গে উজ্জ্বল বর্ণেরা হীনবর্ণদিগকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল। এইরূপে অহঙ্কার ও ঘৃণার উদয় হওয়ায় সেই রসময় পৃথিবী অন্তর্হিত হইল। তখন সকলে একত্র হইয়া রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু ভ্রমবশতঃ উহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

রসময় পৃথিবী লুপ্ত হইলে সর্পছত্রের ন্যায় একপ্রকার বর্ণ, গন্ধ ও সুমিষ্ট রসসম্পন্ন ত্বকের আবির্ভাব হইল। তখন জীবসকল তাহাই খাইতে লাগিল। ইহাতে তাহারা আরও অধিক স্থূলভাব প্রাপ্ত হইল, বর্ণ অধিকতর বিবর্ণ হইল। বর্ণভেদ আরও বেশী মাত্রায় ঘটিতে লাগিল ও তৎসহিত অহঙ্কার ও ঘৃণা অতিশয় প্রবল হইল। ফলস্বরূপ সেই স্বয়ংজাত সুমিষ্ট ত্বক্ লুপ্ত হইল। তখন সকলে একত্র হইয়া আবার দুঃখ করিতে লাগিল।

অতঃপর 'বদালতা' নামক এক প্রকার সুমধুর সুখাদ্য শাক জন্মিয়াছিল। উহার অপূর্ব্ব ঘ্রাণ ও আস্বাদ পাইয়া সকলে তাহাই ভক্ষণ করিতে লাগিল। উহা বহুকাল খাইবার পর সকলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিবর্ণতা ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি লাভ করিল। হীনবর্ণেরা অপেক্ষাকৃত উত্তম বর্ণদিগের হেয় হইল। মান, অপমান, ঘৃণা ও অহঙ্কারে জীবের চিত্ত বিলক্ষণ মলিন হইয়া দেহকেও স্থূল ও কঠিন করিল। তখন সেই বদালতা আর উৎপন্ন হইল না। আবার সকলে প্রকৃত রহস্য না জানিয়া দুঃখ করিতে লাগিল।

এইবার ধান্যবৃক্ষের জন্ম হইল। তখন উহা তুষ-কণ-বিহীন সুগন্ধি উত্তম তণ্ডুল উৎপন্ন করিত। লোকে সন্ধ্যাকালে যাইয়া যাহা সংগ্রহ করিত, পরদিন মধ্যাহ্নভোজনের সময় তাহা আপনি সিদ্ধ হইয়া থাকিত, আবার মধ্যাহ্নকালে যাহা সংগ্রহ করিত সায়ংকালে তাহা আপনি সিদ্ধ হইয়া থাকিত। এইরূপে প্রতিদিন সংগ্রহ ও আহার করিয়া লোকে জীবন ধারণ করিত। বর্ণের মলিনতা ও দেহের স্থূলতা এতদিনে যথেষ্টই ঘটিয়াছিল। এক্ষণে ঐরূপ আহারবিহারের ফলে স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ লক্ষিত হইল। তখন পুরুষ নারীর চিন্তায় কষ্ট পাইতে লাগিল এবং নারী পুরুষের ধ্যানে আপনার অস্থিমজ্জা শুষ্ক করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের সঙ্গম হইল। ঐ সময় উহার বিপক্ষ দল দম্পতির উপর নানা মিষ্টালাপের সহিত গোময়, নিষ্ঠীবন ইত্যাদি প্রয়োগ করিত। ইহাই অধুনা বিবাহোৎসবের সময় বর-কন্যাকে লইয়া যে আমোদ প্রমোদ হয়, তাহার আদি কারণ।

সমাজে বিবাহ-প্রথা ছিল না বলিয়া ঐ দম্পতিকে প্রথম প্রথম গ্রামে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। তাহারা জঙ্গলে যাইয়া বাস করিত। তখনও পর্য্যন্ত গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই, এই দম্পতি বন হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমাজের ভয়ে প্রথম গৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল।

এইরূপ বহু গৃহ নির্ম্মিত হইলে লোকের আলস্য জন্মিল। তখন কেহ একবার যাইয়া দুই বারের আহার সংগ্রহ করিত। তাহাকে

দেখিয়া অপর একজন দুইদিনের, তাহাকে দেখিয়া অন্য একজন চারি দিবসের, ক্রমে সপ্তাহের, এইরূপে প্রতি গৃহে ধান্য সঞ্চিত হইতে লাগিল। সংগৃহীত ধান্য আহার করিবার সময় দৃষ্ট হইল যে তাহাতে তুষ জন্মিয়াছে, কণা আসিয়াছে, তাহার সুগন্ধ নাই এবং তাহা সেরূপ আপনি সিদ্ধ হয় না। তখন সকলে মিলিয়া এক বিরাট সভা করিল। উহাতে আপনাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যাবলী ও তদনুগামী অবস্থাসকলের সমালোচনা করিয়া দুঃখের সহিত ব্যক্ত করিল যে, তাহাদিগের মধ্যে পাপের প্রসার হেতু উক্তরূপ অবস্থান্তর সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। অতঃপর সকলের মধ্যে ধান্য সমভাগে বিভক্ত হইয়া তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট হউক, এই প্রস্তাব করিলে তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইল।

এই নিয়মে কিছুকাল গত হইলে কোন এক লুব্ধ স্বীয় ভাগ সংরক্ষিত করিয়া গোপনে অন্যের অংশ গ্রহণ করিল। তাহাতে সকলে তাহাকে ধৃত করিয়া ঐ পাপ কর্ম্ম করিতে নিষেধ মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিল। সেও 'আর করিব না' বলিয়া পুনর্ব্বার ঐরূপ করিল। দ্বিতীয় বারও ধৃত ও ভৎর্সিত হইয়া পরিত্রাণ পাইল। তৃতীয় বার অপহরণ করিলে সকলে মিলিয়া উহাকে হস্ত, লোষ্ট্র, যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। তদবধি মিথ্যাকথা, চৌর্য্য, দুষ্ক্রিয়া ও তদনুযায়ী প্রহার জনসমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

চৌর্য্যের উদয় হইলে লোকে এক সভার অনুষ্ঠান করিয়া প্রস্তাব করিল, একজন শাসনকর্ত্তার আবশ্যক। তিনি ন্যায়কে রক্ষা করিবেন, অন্যায়কে দমন করিবেন এবং দোষীকে নির্ব্বাসিত করিবেন এবং তাঁহাকে সকলে স্বস্ব ধান্যের ভাগ অর্পণ করিবে। উহা অনুমোদিত হইলে যিনি তাহাদিগের মধ্যে রূপে গুণে ও পরাক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহাকেই শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত করা হইল। তিনি সুচারুরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতেন, প্রজারাও তাঁহাকে ধান্যের ভাগ অর্পণ করিত।

মহাজনের সম্মতি অনুসারে নির্ব্বাচিত বলিয়া তাঁহার 'মহাসম্মত'

এই প্রথম নাম হইল। ক্ষেত্রসমূহের স্বামী বলিয়া 'ক্ষত্রিয়' এই দ্বিতীয় এবং ধর্ম্মের দ্বারা অপরকে রঞ্জিত করেন বলিয়া তাঁহার 'রাজা' এই তৃতীয় নাম উৎপন্ন হইল।

হে বশিষ্ঠ, বহু পুরাকাল হইতেই রাজমণ্ডলী ক্ষত্রিয় এই উপাধি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্ম তখন একরূপ ভাবেই বিরাজমান ছিল, কেবল এখনকার মত অধর্ম্মের এত প্রকোপ ছিল না।

ক্রমে কতকগুলি লোকের মনে স্বতঃই উদয় হইল যে, মনুষ্য-সমাজে চৌর্য্য. শঠতা, মিথ্যা কথা, প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া ও নির্ব্বাসন প্রভৃতি অস্বাভাবিক দণ্ড সকল উদ্ভূত হইয়া পাপের প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। তাঁহারা এই পাপ সর্ব্বথা পরিহার কামনায় অরণ্যে গমন করিয়া ধ্যানধারণাদি দ্বারা জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নাম ব্রাহ্মণ হইল। তাঁহারা নগর হইতে অরণ্যে গমন করিয়া পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অগ্নি. ধূম ব্যতীত ধ্যান করিতেন। তাঁহারা আহারের জন্য প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যায় গ্রামে ভিক্ষা করিতে যাইতেন। আবার আসিয়া ধ্যান করিতেন। লোকে সেইজন্য তাঁহাদের 'ধ্যানী' এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। এই ধ্যানী ব্যক্তিগণের কতকগুলি অরণ্যে ধ্যানময় জীবন যাপন করিতে অসমর্থ হইয়া গ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন এবং গ্রন্থপ্রণয়নাদি দ্বারা কালাতি-পাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধ্যান করিতেন না বলিয়া লোকে তাহাদিগকে 'অধ্যায়ক' বলিত; এখন ইঁহাদের প্রভূত সম্মান কিন্তু তখন অতি অল্পই ছিল। ধর্ম্ম তখন সমভাবেই বর্ত্তমান ছিল এবং ব্রাহ্মণগণ সকলেই ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ছিলেন।

তদনন্তর কতকগুলি লোক সংসারধর্ম্ম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর সহিত বাস করিত ও সমস্ত ক্রিয়াকলাপে আপনাদের নিযুক্ত রাখিত। বিশ্রুত কর্ম্ম করিত বলিয়া তাহাদের নাম হইল বৈশ্য। তাহারাও ধর্ম্মের দ্বারা জীবন পরিচালিত করিত।

অবশিষ্ট লোকেরা ক্রূর কর্ম্ম করিত বলিয়া তাহাদের শূদ্র অভি-ধান হইল। ইহাই শূদ্রের পুরাতন ব্যাখ্যা।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্মকেই পরিমাপক করিয়া এই চতুর্বর্ণের তারতম্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কারণ ধর্ম্মই ইহ জগতে ও পরলোকে শ্রেষ্ঠ বস্তু।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে কখন কেহ কেহ স্ব স্ব নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের উপর বিরক্ত হইয়া শ্রমণ ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ কখন কখন অনুষ্ঠেয় বিধির উপর বিরক্ত হইয়া শ্রমণ হয়; ক্ষত্রিয় নিজ কর্ত্তব্যকে ঘৃণা করিয়া শ্রমণ হয়, বৈশ্যও সংসারসুখে বীতরাগ হইয়া শ্রমণ হয় এবং শূদ্রও স্বীয় ক্রূর কর্ম্মে ভীত হইয়া শ্রমণ হইয়া থাকে। শ্রমণ বলিতে এই চতুর্বর্ণের মধ্যে যাঁহারাই সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মময় জীবন গঠন করিবার জন্য আপনাদের উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদিগকেই বুঝায়।

অন্যদিকে ইহাও দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বা যে কেহ হউক কায়মনোবাক্যে দুষ্ক্রিয়া করিয়া মিথ্যা-দৃষ্টিজনিত কর্ম্ম হেতু দেহান্তে অপার দুর্গতি—নিরয় প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করে। অথবা কায়মনোবাক্যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সম্যক্-দৃষ্টি ও তৎসংযুক্ত কার্য্য করিয়া দেহান্তে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া সুখভোগ করে। সুতরাং এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের মধ্যে উভয়বিধ লোকই পরিদৃষ্ট হয়।

হে বশিষ্ঠ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যে কেহ হউন না কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া বোধি-বিধায়ক তত্ত্বসকলের চিন্তা দ্বারা এই জন্মেই নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হন।

সেইজন্য ধর্ম্মই কেবল ইহ ও পরলোকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত আছে।

ব্রহ্মা সনৎকুমার যথার্থই গাথায় বলিয়াছেন—

গোত্রে কয় ক্ষত্রিয়কে শ্রেষ্ঠ সবাকার,
পার্থিব সম্মানে মাত্র সম্মান তাহার।
কিন্তু সেই অর্হৎ চরিত্র মহান্,
ত্রিলোকেতে নাই কেহ তাঁহার সমান।

ইহাতে বিন্দুমাত্র ভুল নাই। এই বলিয়া ভগবান্ সেই রাত্রের কথাপ্রসঙ্গ শেষ করিলেন। উপস্থিত ভিক্ষুমণ্ডলী তাঁহার বাক্যে হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।*

সাহিত্য-সৌন্দর্য্য।

(ডাক্তার শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু)

আজকাল বাংলা সাহিত্যের লেখকসংখ্যা দিন দিন যে প্রকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে তাহা প্রকৃতই সুখের বিষয় বলিতে হইবে। অনেকে এই কথার পর একটা 'কিন্তু' দিয়া বলিয়া থাকেন, "উন্নতি অর্থে ভাষাকে নূতন ভাবে তৈয়ারী করা নহে, যাহা আছে তাহার উৎকর্ষ সাধন করা—ভাষাকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করা। অপেক্ষাকৃত দুরূহ ভাষাকে অনেকে একটু ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত যে. ভাষা ভাবানুগামিনী। —উচ্চস্তরের ভাব তেমন ভাষা না হইলে পরিস্ফুট হইবে কেন?"

এ কথায় আমাদের একটু অন্যমত আছে। আমাদের মতে যাঁহারা ভাষাকে যত ছোট ও সাধারণ কথায় বড় ভাবাপন্ন করিয়া সাজাইয়া দেন, তাঁহাদের কবিত্বশক্তি তত বেশী। দেশ-কাল-পাত্র ও রুচি অনুসারে ভাষাকে রূপান্তরিত না করিলে চলিবে কেন? এবং এই রূপান্তরিত করার নামই ভাষার উন্নতি। কেন না, দেশ সেই ভাষারই ভক্ত। দুরূহ ভাষা ঘৃণা বা অবহেলা করেন কাহারা? যাঁহারা সে ভাষার ভাবকে হৃদয়ে স্থান দিতে অক্ষম। না বুঝিলে বা না অনুভব করিতে পারিলে কিসের আকর্ষণে মানুষ

---

* পালি 'অগ্‌গঞ্ঞ' সূত্র অবলম্বনে লিখিত।

দুরূহ ভাষাকে ভাল ভাবে স্থান দিবে বা তাহা পাঠ করিবে। এ অন্যায়ের জন্য বঙ্গীয় পাঠকগণের প্রতি লেখক বিরক্ত বা দুঃখিত হইলে চলিবে কেন? তাই বলিতেছিলাম, বর্ত্তমান যুগে ভাষাকে সহজ ও সরল করিয়া উচ্চস্তরের ভাবময় করিয়া তোলাই সঙ্গত। কেন না, দেশের জন্য যাঁহারা রচনালেখক, তাঁহারা সর্ব্বদাই দেশের রুচি মানিয়া চলিতে বাধ্য। ছোট কথায় বড় ভাবের অবতারণা হইতে পারে কি না, তাহা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভাষাকে যতই সহজ, সরল ও ক্ষুদ্র করি না কেন, তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহ হইতে অনন্ত ভাবময় শক্তি দিতে না পারিলে সে ভাষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

অধিকাংশ পাঠককে ভাবের কাছে আজকাল বড় একটা ধরা দিতে দেখি না। যেখানে ভাব লইয়া মানুষকে মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়, সেইখানেই তাহার বিরক্তি উপস্থিত হয়। এই বিরক্তি অনুভূত হয় বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ অনেকের নিকটে অবজ্ঞাত। কিন্তু এই সকল লোকের উপর অভিমান করিয়া যদি রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ না হইতেন তবে বঙ্গসাহিত্যের একটা সুন্দর দিক্ অনুদ্ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি একটা বাঁধা অর্থ ধরা দেয় না, এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। কিন্তু আমরা বুঝি, যাহা লইয়া মানুষকে আলোচনা করিতে হয় না, বা উচ্চ অঙ্গের ভাবের সঙ্গে মিশিতে হয় না, সে কবিতা রচিত না হইলেও সাহিত্যের কিছু আসে যায় না। সে সব কবিতা সমালোচনা করিতে বসিয়া শুধু লিখিতে হয়—'ভাল লাগিল না' 'ভাষা সরল হয় নাই', 'লিপিচাতুর্য্য মৌলিক গল্পেরই মত ফুটিয়াছে,' ইত্যাদি। ইহা ছাড়া আর কিছু বলিবার থাকে না। বাঙ্গালা ভাষায় ভাবের অভাব নাই, প্রাচীন কাব্যগ্রন্থই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেখানে যেরূপ ভাব ও ভাষার—উপর দেশের বার আনা লোকের শিক্ষা নির্ভর করে, সেইরূপ ভাবেই লেখককে চলিতে হইবে।

কেন না, ভাষা ও কাব্য-সৌন্দর্য্য লেখকের নিজের জন্য নহে, পাঠকের জন্য। তাহা যদি সত্য হয়, তবে তাহাদের রুচি কতকটা মানিয়া চলিতেই হইবে। কেবল মাত্র দেশের শিক্ষিত সমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের নিরক্ষর ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না।

সকল মানুষ যেমন একই ঈশ্বরের সন্তান, সকল ধর্ম্মই তেমন একই ধর্ম্মের অধীন। ধর্ম্মগত বিদ্বেষ লইয়াও অনেকে অনেক কবি ও সাহিত্যিককে প্রকাশ্যভাবে ভাল বলিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদের দুর্ব্বলতা। প্রতিভাশালী লেখক সম্বন্ধে মুখে যে যাহাই বলুন না কেন, অন্তরে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও গর্ব্বে মস্তক অবনত করেন না, অথবা তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

অনেক সময় ভাষায় একটা দোষ বড় বড় লেখকগণও করিয়া যান। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটকের রচয়িতা। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানি ধর্ম্মবিষয়ক নাটক ও একখানি সামাজিক নাটক লিখিয়া যান। অবশ্য পরিশেষে তাঁহার 'বঙ্গনারী' নামে আর একখানি সামাজিক নাটকও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার সব পুস্তকের একই ভাষা। রণক্ষেত্রে যে ভাষায় মাধুর্য্য আনয়ন করে, সামান্য গৃহস্থ-পরিবারের মৃত্যুচ্ছবিতে সে দুরূহ ভাষা থাকিলে চলিবে কেন? তাঁহার "পরপারে" নাটকে করুণাময়ীর মৃত্যুর পর দয়ালের মুখে যে ভাষা তিনি দিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত লেখকের পক্ষে নিতান্তই অশোভন হইয়াছে। শোক করিবার সময় যদি অভিধানের দুরূহ ভাষা খুঁজিয়া শোক করিতে হয়, তবে স্বাভাবিক অভিনয় হইবে বলিয়া নাটক দেখিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। ইহাতে যত বড় অভিনেতাই হউন না কেন, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়চাতুর্য্য দেখাইতে পারিবেন না। শুধু বীরভাবে শোক, দুঃখ, হর্ষ করিয়া দর্শকের মনে একটা সাময়িক 'উত্তেজনা' আনয়নপূর্ব্বক করতালি লাভ করিতে পারেন মাত্র।

গিরীশ বাবুর সামাজিক নাটকগুলি যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সহজ ও সরল ভাষায় রচিত। তাঁহার ভাষাতে দুরূহ শব্দ নাই, অথচ গভীর ভাব আছে। অভিনেতার অভিনয়ক্ষমতা থাকিলে নাট্যকারের চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও একখানি ছবি সাজিতে পারেন। এই সব ছোট কথায় বড় ভাব দিয়াই গিরীশচন্দ্র নাট্যসম্রাট্ আর রবীন্দ্রনাথ কবিসম্রাট্।

গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিকগণের প্রতি আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। আজকাল বাংলা দেশের পাঠকগণ ইঁহাদেরই ভক্ত; তাহার প্রমাণ, ॥০ আট আনা সংস্করণের পুস্তকগুলির বহুল প্রচার। অন্য ভাবের পুস্তকপাঠ নবীন পাঠকের রুচিবিরুদ্ধ। সুতরাং গল্প উপন্যাস নাটক যাহাতে অসার, নিরর্থক, ভাবশূন্য না হয় এবং শুধু ঘুম আনাইবার মহৌষধ না হইয়া জ্ঞানের আলো জ্বালাইবার যথেষ্ট সহায়তা করে, তদ্বিষয়ে লেখকগণের মনযোগ দিতে হইবে। উৎকৃষ্ট নাটকই অভিনয়ের উপযোগী, এবং অভিনয় দর্শনে মানবের শিক্ষা লাভ হয়। উপন্যাস ভাল হইলে, পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চরিত্রগত সৌন্দর্য্য স্বতঃই পাঠকের মনে উদিত হইয়া লেখকের গূঢ় অভিপ্রায় তাহাকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। বহু নিরক্ষর ব্যক্তিকে ইতিহাস ও পুরাণের কথা বলিতে শোনা যায়, তাহারা যাত্রা ও নাটক দেখিয়াই এ কথা বলিবার ক্ষমতা লাভ করে। এই সব আমোদ যদি কুরুচি ও কুভাবাপন্ন না হয়, তবে 'পুঁথিগত বিদ্যা' না হইলেও নিরক্ষর ব্যক্তি বহু জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

এইবার আমরা সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আলোচনা করিব। কেমন করিয়া বাঙ্গালীকে চলিতে হইবে, কেমন করিয়া বাঙ্গালীর ভাষা গঠন করিতে হইবে, বহুদিন যাবৎ বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ধর্ম্মপুস্তকে তাহা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর অভাব বুঝিয়াছিলেন, এবং যেমন করিয়া লিখিলে ভারতবাসী শিক্ষিত হইতে পারে, বঙ্কিমবাবু তাহাই

লিখিয়া গিয়াছেন। নব্যযুগের পথপ্রদর্শক বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকের এত আদর। তাই আজ তাঁহার জন্য ভারতবাসী গর্ব্বিত, তাই তিনি সাহিত্য-সম্রাট্‌ বঙ্কিমচন্দ্রের বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে, বহু আলোচনা এখনও বাকী রহিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রকে আজও বাঙ্গালী ঠিক চিনিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি লইয়া নানা জনেই নানামতে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তবে যাহা ভাল, তাহা 'ভাল' বলিবার অধিকার সকলেরই আছে, এই সাহসেই তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে সাহসী হইতেছি। গুরুতর রাজকার্য্যভার মস্তকে লইয়া, হাজার হাজার বাদী বিবাদীর নথি খতাইয়াও বঙ্কিমচন্দ্র নবীন যুগের জন্য যে রচনাবলী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না।

সাহিত্য-সৌন্দর্য্য দেখিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস দাশরথি ইত্যাদি শত শত সাহিত্যরথী রহিয়াছেন যাঁহাদের কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না। সে সৌন্দর্য্য দেখিতে গেলে শত শত পুস্তক লিখিতে হয়, একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সম্পূর্ণ প্রকাশ অসম্ভব। তাই শুধু বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া আজ তাঁহার লিপিচাতুর্য্য দেখিবার সামান্য প্রয়াস পাইব মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাই আমাদের বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজন, কেন না, তাহাতে এক দিকে যেমন নবীন পাঠকের চিত্তাকর্ষণের যথেষ্ট উপাদান আছে, অন্য দিকে তেমনি ভাষা ভাবময়ী হইয়া শিক্ষিত ব্যক্তির আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকেরই প্রীতিসম্পাদন করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক যে কোন স্থান হইতে খুলিয়া পাঠ আরম্ভ করা যায়, সেই স্থান হইতেই একটা নূতন আস্বাদন ও আকর্ষণ অনুভব করা যায়। ইহা যেন চিরনূতন। নূতন বেশ লইয়া যেন প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে

মানুষকে অপূর্ব্ব সম্পদ্ দান করে। ভাব অনেকের নেই আসিয়া থাকে ; উহাকে যাঁহারা চিত্রে ও ভাষায় ফুটাই দিতে পারেন তাঁহারাই কবি। এই সব কাব্যকুশল ব্যক্তিগণের ।ধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের সবগুলি চরিত্রই যেন এক একখানি ছবি। পাঠ করিতে করিতে সে ছবি যেন জীবন্ত হইয়া আপনি আসিয়া হৃদয়ে ধরা দেয়।

যেখানে ইন্দ্রিয়সম্ভোগস্পৃহার সহিত রূপের সম্বন্ধ, সেইখানেই প্রেম পদদলিত—সেইখানেই মানুষ অধঃপাতের নিম্নস্তরে অবস্থান করে। সেই জন্য গোবিন্দলাল, নগেন্দ্র, কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী প্রভৃতির পতন ঘটিয়াছিল। আর যেখানে তাহা নহে, সেখানে রূপ অখণ্ড ও অক্ষয় হইয়া চিরদেদীপ্যমান থাকে। গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ, কুন্দনন্দিনী, রোহিণী, শৈবলিনীর হৃদয়ে যে প্রেম ছিল না তাহা নহে, সে প্রেম ক্ষণিক। লালসাকে প্রেম বলা চলে না। প্রেমানুশীলন মনুষ্যজীবনের পবিত্র স্বর্গীয় সাধনা যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার ছবি সযত্নে হৃদয়কন্দরে রক্ষিত করার নামই প্রেম, এই প্রেমকেই সাধনা কহে, এবং এই সাধনা হইতেই মানুষ রূপকে বিস্তৃত হইতে দেখিয়া অরূপে সিদ্ধি লাভ করে। সে সিদ্ধির আসনে দেখিয়াছি, 'প্রতাপকে', 'দেবী চৌধুরাণীকে' ও 'কপালকুণ্ডলাকে'। ইহারা যে রূপ দেখিয়া মজিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাণ আছে—তৃষ্ণা নাই, শান্তি আছে—আর্ত্তনাদ নাই, উচ্ছ্বাস আছে—আবেগ নাই, আশা আছে—ভয় নাই। কপালকুণ্ডলা এই প্রকার প্রাণময়ী প্রেমময়ী। সেক্ষপিয়ারের 'মিরান্দা'ও কালিদাসের 'শকুন্তলা' অনেকটা কপালকুণ্ডলার মত। তিনজন চিত্রকরের তিনটী প্রেমময়ী মূর্ত্তি। আজ আমরা 'কপালকুণ্ডলাকে' লইয়াই আলোচনা করিব। কাপালিক ও প্রস্পেরো, মিরান্দা ও কপালকুণ্ডলা, গনজালো ও অধিকারী, ফার্দ্দিনান্দ ও নবকুমারের চরিত্র-সৌন্দর্য্য, প্রেমপার্থক্য বিস্তারিতভাবে বিচারে অন্য সময়ে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা রহিল।

যে দিন পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইয়া সরল, সাহসী ব্রাহ্মণসন্তান নবকুমার সমুদ্রতীরে বিসর্জ্জিত হইলেন, সে দিন নবকুমার কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। যখন বুঝিলেন সহযাত্রীরা সত্য সত্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখনও সহযাত্রীদের প্রতি নবকুমারের কিছুমাত্র বিরক্তি বা বিদ্বেষ আসে নাই। এই ক্রোধ না করাকেই প্রেম বলে। প্রেমিকের হিংসা বা প্রতিশোধ লইবার বাসনা হৃদয়ে স্থান পায় না। নবকুমার এমন কি সঙ্গিগণের প্রতি মনে মনে বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই; তিনি শুধু বুঝিয়াছিলেন, "তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?" সমুদ্রের রূপে তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সমুদ্রদর্শন সার্থক হইয়াছিল। এই সার্থকতার জোরেই সঙ্গী যাত্রীগণের এত বড় কৃতঘ্নতাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার যাত্রিগণকে ক্ষমা কোথাও করেন নাই, তবে আমাদের মনে হয় এত বড় অন্যায়ের প্রতিশোধ না লওয়াই ক্ষমা, কেন না, নবকুমার দুর্ব্বল নহেন, দরিদ্রের সন্তানও ছিলেন না। সুতরাং কিছু না বলাই ক্ষমা, এবং এই ক্ষমা প্রেমের দ্বারাই আনিত।

কপালকুণ্ডলার সহিত সান্ধ্য ছবির মাঝখানে সমুদ্রতটে প্রথম যখন নবকুমারের সাক্ষাৎ হয়, তখন নবকুমার সেই শিশুস্বভাবা বনবিহারিণী রূপ দর্শনে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সে চাহনি লালসার নহে, সুন্দর, তাই দেখিতেছিলেন। সে চাহনিতে তন্ময়তার সঙ্গে ভক্তি মিশান ছিল।

শার্দ্দূলচর্ম্ম-পরিহিত শ্মশ্রু-জটা-পরিবেষ্টিত তান্ত্রিক সাধক কাপালিক নবকুমারকে বধার্থে যখন ভৈরবীমূর্ত্তির নিকট লইয়া গেলেন, তখন কপালকুণ্ডলার স্ত্রীসুলভ স্নেহে বা মায়ায় আবদ্ধ হইয়া খড়্গ চুরি করিয়া রাখিয়া বধকার্য্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা আনয়নপূর্ব্বক নবকুমারকে লইয়া পলায়ন করেন। যদি সেই দিবস বালিয়াড়ির শিখর হইতে কাপালিক পতিত না হইতেন, যদি সে পতনে দুই

বাহু ভগ্ন হওয়ায় হতচেতন না হইতেন, তবে নবকুমারকে কেহই রক্ষা করিতে পারিতেন না। নবকুমারকে লইয়া কপালকুণ্ডলা নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিলেন। এ পলায়নে কোন লালসা ছিল না। খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্তই তাঁহাদের দ্বারা কপালকুণ্ডলা ত্যক্ত হন, ইনি ব্রাহ্মণকন্যা; কাপালিক স্বীয় যোগ সিদ্ধি মানসে ইহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এই বনের নীরবতার মাঝখানেই তাহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছে। মানুষের যে সব দোষ থাকিতে পারে, কপালকুণ্ডলার তাহাও ছিল না, সুতরাং লালসা কোথা হইতে আসিবে?

তৎপরে অধিকারী কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া নবকুমারেব সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহ দিলেন। বিবাহকার্য্য শেষ হইলে কপালকুণ্ডলা দেবীর চরণে বিল্বপত্র রাখিলেন--দেবী তাহা গ্রহণ করিলেন না। সম্ভবতঃ জগন্মাতাব ইচ্ছা নহে যে, কপালকুণ্ডলার পবিত্র জীবন সংসারের লালসার দিকে চলিয়া যায়। বিবাহে কপালকুণ্ডলার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই ছিল না, কেন না তাঁহার কোন কামনা ছিল না। কপালকুণ্ডলা নিষ্কাম প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। গীতা পাঠ করিয়া মানুষ যেরূপ হইয়া থাকে, কপালকুণ্ডলা পাঠ না করিয়াই তাহা হইয়াছিলেন তিনি বুঝিয়াছিলেন, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"। যাহা হউক কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে স্বামীপদে বরণ করিলেন, যোগ্য পাত্রেই কপালকুণ্ডলা অর্পিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় কপালকুণ্ডলার প্রেম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা বুঝি উন্নতপ্রাণ নবকুমারেরও ছিল না।

অধিকারীর নিকট বিদায় লইয়া মেদিনীপুর-পথে নবকুমার কপালকুণ্ডলার শিবিকার পশ্চাতে পড়িলেন। কেন না, তিনি পদব্রজে যাইতেছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে দস্যু কর্ত্তৃক ভগ্ন শিবিকায় আবদ্ধা মতিবিবিকে তিনি বন্ধনমুক্ত করিয়া নিজে যষ্টিস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে চটিতে লইয়া চলিলেন। স্ত্রী ও পরপুরুষ এভাবে রাত্রিকালে

চলিতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি, কেন না নবকুমার সংযমী ও চরিত্রবান্ যুবক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদি দেবীপুরের 'দেবেন্দ্র দত্তের' কাঁধে মতিবিবিকে স্থান দিতেন, তবে সে রচনাতে ঠিক ভক্তিভাবে প্রেমের ছবি দেখিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।

মতিবিবি কপালকুণ্ডলাকে সপত্নী জানিয়াও যথেষ্ট অলঙ্কারে তাঁহার অঙ্গ বিভূষিত করিয়া দিলেন। মতি, নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী, অদৃষ্টক্রমে মুসলমান হইয়া স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স বার বৎসর ছিল। অলঙ্কার দস্যুতে লইয়া গেলেও যথেষ্ট ছিল, সে সমস্ত মতি কপালকুণ্ডলাকে পরাইলেন। সপত্নীকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধা হইলেন। কেন হইলেন? প্রেমময়ীর নিকট লালসাময়ীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। স্বামীহারা পদ্মাবতী আগ্রায় সেলিমের প্রেমভিখারিণী, নূরজাহানকে সরাইয়া তিনি সম্রাজ্ঞী হইতে ব্যস্ত। তবু এই চটিতে অন্ধকার গৃহে মতির এক দীর্ঘশ্বাসে তাহার হারাণো পুরাতন প্রেমকে মূর্ত্তিমতী হইয়া জাগিতে দেখিয়াছিলাম। লালসাকে যে প্রেম বলা চলে না, এবং প্রেম না হইলে মানুষ যে শান্তিলাভ করিতে পারে না, তাহার প্রমাণ মতিবিবি। মতি লালসার তাড়নায় যাহা চাহিয়াছে, তাহাই পাইয়াছে, যাহা কল্পনা করিয়াছে তাহাই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। তবু প্রাণে শান্তি পায় নাই। মতির হৃদয়ে যদি প্রেম থাকিত, তাহা হইলে সে পূর্ব্ব হইতেই তৃপ্তিলাভ করিত।

কপালকুণ্ডলা এতগুলি গহনা পাইয়াও অপকটহৃদয়ে ভিক্ষুককে দান করিল, অঙ্গের অলঙ্কারও খুলিয়া দিল। তাহার পাওয়াতেও আনন্দ নাই, দানেও দুঃখ নাই, এইটুকুই কপালকুণ্ডলার চরিত্রের মাধুর্য্য।

নবকুমারের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়া সহযাত্রিগণ যে প্রকার বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, এ প্রকার বীর বাঙ্গালীসমাজে অভাব নাই। আমরা নবকুমারের মহত্ত্ব দেখিয়াছি সেইদিন, যেদিন সপ্তগ্রামে প্রেমপীড়িতা মতির সহিত নবকুমারের কথা হইয়াছিল।

পদ্মাবতী ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে এত কাল আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াও আগুন স্পর্শ করেন নাই। পান্থনিবাসে এক রাত্রিতে তাঁহার যে প্রেমের উন্মেষ হইয়াছিল, সে প্রেম ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া আজ সে সত্যই প্রেমময়ী হইয়াছে। যখন সে প্রেমময়ী, তখন ধনসম্পদ্ গৌরবলালসা সমস্তই তাহার নিকট অসার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তখন তাহাতে আর কোন স্পৃহা রহিল না, কেন না প্রেমিক প্রেমিকার কোন সাংসারিক তৃষ্ণা থাকিতে পারে না। তবু পদ্মাবতী আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রচুর ঐশ্বর্য্য লইয়া সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যৌবন ও ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া নবকুমারকে প্রলুব্ধ করিবেন। কিন্তু শত প্রলোভনেও নবকুমারের হৃদয় টলাইতে পারিলেন না; এইখানে নবকুমার ও পদ্মাবতীর ছবি যেমন করিয়া আঁকিলে হয়, স্বর্গীয় বঙ্কিম-চন্দ্র সেই ভাবেই তাঁহাদের অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রেমের ডাকে মতি আগ্রার সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, নবকুমারও ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত মতিবিবিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন! এই প্রকার ত্যাগেই প্রেমের বিকাশ। পদ্মাবতী যদি সম্পূর্ণরূপে প্রেমময়ী হইতে পারিতেন, তাহা হইলে আর স্বামীকে পাইতে ব্যস্ত হইয়া কুপথ অবলম্বন করিতেন না প্রেমিকা না হইলে প্রেমময়কে কখনই পাওয়া যায় না।

কাপালিক কপালকুণ্ডলার অনুসন্ধান করিতে করিতে সপ্তগ্রামে আসিলেন, তাহাকে না পাইলে তাহার তন্ত্রসাধনা ব্যর্থ হইয়া যায়। কপালকুণ্ডলার সন্ধান পাইয়াও কাপালিক ভগ্ন হস্ত নিমিত্ত সহকারীর আবশ্যক হইয়া পড়িল। পুরুষবেশী পদ্মাবতী যখন স্বীকৃত হইল না, তখন ছলনা অবলম্বন ভিন্ন কাপালিকের কোন উপায় রহিল না। পদ্মাবতী কপালকুণ্ডলাকে বধ করিতে স্বীকৃতা হইল না, লালসায় হোক আর প্রেমেই হোক সে স্বামীকে চায়। সম্পূর্ণ প্রেম হৃদয়ে থাকিলে স্বামীকে চাহিবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। আবার সপত্নীর

প্রাণ নিতেও ইচ্ছা নাই, এইখানেই সে যে একেবারে প্রেম-হীনা নহে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কাপালিকের অন্য সুযোগ ঘটিল—কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দিহান নবকুমারকে তিনি বুঝাইলেন, কপালকুণ্ডলা চরিত্রহীনা। এই প্রকারে উত্তেজিত নবকুমারকে সুরা পান করাইয়া কাপালিক সম্পূর্ণভাবে তাহাকে হাত করিল। রাত্রিকালে বনে, অপরিচিত ব্রাহ্মণ-যুবকের সহিত নিঃসঙ্কোচে কপালকুণ্ডলা আলাপ করিলেন; পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি কপালকুণ্ডলার পক্ষে তাহা দূষনীয় হয় নাই। কপালকুণ্ডলা আসিবার সময় কালীর পদে বিল্বদল দিয়া আসিয়াছিলেন। মা, তাহা গ্রহণ করেন নাই, সেই হইতে সে ভীতা!—তাহা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাহার লজ্জা, ভয়, দুঃখ কিছুই ছিল না। পদ্মাবতী নিজ পরিচয় দিয়া কপালকুণ্ডলাকে স্বামী পরিত্যাগ করিতে বলিলে তিনি অবলীলাক্রমে স্বামী ত্যাগ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এইখানেই কপালকুণ্ডলার নারীত্বের গৌরব দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই চরণ দুটি মনে পড়িল—

"প্রেমে নর আপনি হারায়, প্রেমে পর আপন হয়, আদানে প্রেম হয়নাক হীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।"

বন পরিত্যাগ করিয়া কপালকুণ্ডলা গৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন, জ্ঞানহারা নবকুমার যন্ত্রচালিতের ন্যায় 'কুলটাকে' যথার্থ তাহার পিছু লইলেন, পাছে শক্তি হারাইয়া ফেলেন এই ভয়ে পুনরায় কাপালিকের নিকট হইতে সুরা পান করিয়া টলিতে টলিতে কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে আইস।"

সকলে মহাশ্মশানে উপনীত হইলেন। কাপালিক নবকুমারকে আদেশ করিলেন, কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আন। সেই মহাশ্মশানের উপর দিয়া যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলার হাত ধরিয়া তাহাকে স্নান করাইতে নদীতে যাইতেছিলেন, তখনই আমরা কপালকুণ্ডলার অপূর্ব্ব প্রেমময়ী মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি! ধন্য সেই

ছবি, ধন্য সেই চিত্রকর! এই সময়ে যে ভাবে ও যে ভাষায় নবকুমারকে দুই চারিটী কথা কপালকুণ্ডলা বলিয়াছিলেন, পাঠকের বুঝিবার ও দেখিবার ক্ষমতা থাকে ত সমস্ত মাধুর্য্য সেইখানেই অনুভব করিতে পারিবেন। তাহার অনন্ত স্বর্গীয় প্রেম বুঝিবার ক্ষমতা নবকুমার কোথায় পাইবেন? প্রেমের রাজ্যে লালসা নাই, হিংসা নাই, প্রবঞ্চনা নাই, অবিশ্বাস নাই. বলিযাই পদ্মাবতী স্বামীহারা হইলেন, নবকুমার পথচ্যুত হইলেন, কাপালিকের নিষ্ঠুর সাধনা ব্যর্থ হইল!

সেই প্রেমের গরীয়সী মূর্ত্তি চৈত্রবায়ুতাড়িত বিশাল তরঙ্গে বিসর্জ্জিতা হইল! প্রেমের এ প্রকার উৎকৃষ্ট ছবি আমরা অনেক দিন দেখি নাই। কপালকুণ্ডলা প্রেমের আদর্শ, হিন্দুর গৌরব, মনুষ্যজীবনের একমাত্র 'সাধনা'।

একবার ওঠ, মৃন্ময়ি! আবার সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া তোমার আগুলফ্‌লম্বিত কেশরাজি সমুদ্রের শান্ত সমীরণে উড়াইয়া দাঁড়াও! একবার তোমার কোমল কণ্ঠস্বরে ইন্দ্রিয়ভোগ-বিমূঢের হৃদয়তন্ত্রীতে নিষ্কাম-প্রেমের ঝঙ্কার তুলিয়া যাও! তুমি স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা লইয়া আমাদের সম্মুখে এস—আমরা তোমায় নমস্কার করি।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।

উত্তরবঙ্গ বন্যাকার্য্য—কার্য্যবিবরণী ও আবেদন।

গত বারের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইবার পর, গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা পরিদর্শনান্তর আমরা থানা রাণী-নগরে ৫টী, থানা নওগাঁয় ৫টী ও নন্দনালি থানায় ২টী সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছি।

কলিকাতা, বিবেকানন্দ সোসাইটী, নন্দনালী থানার কেন্দ্র দুই-টীর ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উহাদের কার্য্য পরিচালনা শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন কবিলেও সোসাইটী কেন্দ্র দুইটীর কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিবেন।

কার্য্যারম্ভের পর ৩য় সপ্তাহে ৩৪৬০ জন ব্যক্তি সমস্ত কেন্দ্রগুলি হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হন. সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৯৫ জন চাউল ব্যতীত ২২০ জোড়া নুতন এবং কতকগুলি পুরাতন কাপড় কেন্দ্রগুলি হইতে বিতরিত হইয়াছে। বস্ত্রাভাব সর্ব্বত্রই বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। পরিদর্শন কালে নগ্ন এবং অৰ্দ্ধনগ্ন বহু স্ত্রীপুরুষ আমাদের সেবকগণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। দুবলহাটী, হাঁসাইগাড়ী ও বলিহার কেন্দ্রে। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে বন্যায় ক্ষেত্রাদি ডুবিয়া যাওয়ায় গরুর খাদ্যেরও অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। খাদ্যাভাবে বহু গরু বাছুর মারা গিয়াছে। আমরা ঐ সকল গ্রামে ইতিমধ্যে ৪০০০ আটি খড় বিতরণ করিয়াছি। অন্ততঃ এখনও একমাস কাল খড় বিতরণ করিতে হইবে, ইহাতে সাপ্তাহিক অল্লাধিক ২৫০৲ টাকা করিয়া খরচ পড়িবে। কেবল হাঁসাইগাড়ী কেন্দ্রতেই ৬৪৭টী গরুকে প্রথম সপ্তাহেই সাহায্য করা হইয়াছে। নওগাঁর রিলিফ কমিটী আমাদিগকে যে ২০০০ আটী খড় বিতরণের জন্য দেন, তদ্দ্বারা রাণীনগর থানার কেন্দ্রসমূহে বিশেষতঃ রাতোয়ালে খড় দেওয়া হয়।

নিম্নে ৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সমস্ত কেন্দ্রসমূহের সাপ্তাহিক চাউল বিতরণের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইল। প্রথম সপ্তাহের বিতরণ তারিখ কেন্দ্রগুলির পার্শ্বে দেওয়া হইল।

থানা রাণীনগর।

কেন্দ্রের নাম।	গ্রামের সংখ্যা।	সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি-গণের সংখ্যা।	চাউলের পরিমাণ।
কাশিমপুর (১৪।৯।১৮)	৮	৯০	৪॥০
ঐ, পর সপ্তাহে	১৭	২২৩	১১/৬

ঐ, ”	১৬	২২৪	১১/৮
ঐ, ”	১৭	২২২	১০॥৪
বিল্ কৃষ্ণপুর (১৬।৯।১৮)	১৫	৫৫	২৸০
ঐ, পর সপ্তাহে	১৮	৮৯	৪।৮
ঐ, ”	১৮	৮৯	৪।৮
রাতোয়াল (১৬।৯।১৮)	৩০	২৯৩	১৪॥৬
ঐ, পর সপ্তাহে	৩৯	৮২২	৪১/৪
ঐ, ”	৪১	৬৩৭	৩১৸৪
রাণীনগর (১৮।৯।১৮)	২১	১৮২	৯/৪
ঐ, পর সপ্তাহে	২৫	২৬৩	১৩/৬
ঐ, ”	২৯	২৬২	১৩/৪
ভাণ্ডারগ্রাম (১৯।৯।১৮)	২২	১৯৩	৯৸২
ঐ, পর সপ্তাহে	২৮	২৭৫	১৩৸
ঐ, ”	৪১	৪০৬	২০।২
	থানা নওগাঁ।		
নওগাঁ (২৫।৯।১৮)	২৬	৪৪১	২২॥২
ঐ, পর সপ্তাহে	৫৬	৫৪২	২৭/৪
দুবলহাটী (২৩।৯।১৮)	২৩	১৫৮	৭৸৬
ঐ, পর সপ্তাহে	৩১	২২৯	১১/৮
শৈলগাছি (২৪।৯।১৮)	২২	২৭৫	১৩৸০
ঐ, পর সপ্তাহে	২২	৩১১	১৫॥২
বালিহার (২৭।৯।১৮)	৮	৪৮	২।৬
হাঁসাইগাড়ী (৬।১০।১৮)	৬	৪৫	২।০

৩১ মন চাউলও কেন্দ্রগুলি হইতে সাময়িক সাহায্যরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা স্থানীয় অবস্থা অনেক পরিমাণে ভাল হইয়াছে, কিন্তু বন্যায় শতকরা ৭৫ খানি বাড়ী পড়িয়া যাওয়ায় এবং মাঠের ধান অর্দ্ধেকের উপর নষ্ট হওয়ায়, জল কমিয়া গেলেও গ্রামবাসিগণকে অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছে। লোকে

এখনই এরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে যে, আশঙ্কা হয়, যদি সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর শীঘ্র দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে কৃষিঋণ, গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য অর্থ, রবিশস্যের বীজ, এককালীন অর্থদানাদির দ্বারা সাহায্য না করেন, তাহা হইলে এতদঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে।

সর্ব্বশেষে আমরা দুঃস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে যে সকল সদাশয় ব্যক্তি, সভা, সমিতি অর্থ এবং বস্ত্রাদি দ্বারা এই সেবা কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমরা আশা করি এই সেবা কার্য্যে সহানুভূতির অভাব হইবে না। এখনও লোকের সাহায্যের প্রয়োজন থাকায় আমরা সাধারণের নিকট আরও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। অর্থ বা বস্ত্র নিম্ন লিখিত ঠিকানা দ্বয়ে প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

বিগত ১০ই অক্টোবরের বিবরণী প্রকাশিত হইবার পর বন্যার জল গ্রাম ও মাঠ হইতেও সরিয়া গিয়াছে। আতঙ্ক কমিয়া যাওয়ায় জনসাধারণ স্ব স্ব গ্রামে ও গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে ও যাহার যৎকিঞ্চিৎ অর্থ আছে তদ্দ্বারা আগামী শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্ব স্ব গৃহাদির পুনর্নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছে। কৃষকগণ রবিশস্য বপন করিবার জন্য ক্ষেত্রাদিতে চাষ আবাদ করিতেছে। তজ্জন্য শ্রমজীবিরাও কাজ কর্ম্ম পাইতেছে—যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা কম মজুরীতে। গভর্ণমেণ্টও কৃষিঋণ ও রবিশস্যের বীজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া সাহায্য করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় দুবলহাটী হাঁসাইগাড়ী ব্যতীত অন্যান্য কেন্দ্রগুলি হইতে চাউল বিতরণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিলেও এমন অনেক দুঃস্থ পরিবার আছেন, যাঁহাদের গৃহে বিধবা স্ত্রীলোক নাবালক শিশু ও বৃদ্ধ ব্যতীত উপার্জ্জনক্ষম কেহই নাই যাঁহাদিগকে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের কেন্দ্রাধীনস্থ গ্রামসমূহের ঐরূপ পরিবারসমূহে আমরা এককালীন কিছু অর্থ দিয়া সাহায্য করিব স্থির করিয়াছি, যাহাতে তাঁহারা উহা মূলধন-

রূপে ব্যবহার করিয়া ধান বা চাউল কেনা বেচা করিয়া আপনাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন বা প্রয়োজন বুঝিলে উহা দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া আগামী শীত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। থানা নওগাঁর দুবলহাটী, নওগাঁ ও হাঁসাইগাড়ী এবং রাণীনগর থানার ভাণ্ডার গ্রাম ও রাতোয়াল এই পাঁচটী কেন্দ্র হইতে উক্ত সাহায্য বিতরিত হইবে। আমরা শুনিলাম, গভর্ণমেণ্ট হইতে ঐরূপ সাহায্য প্রদান হইবে না, যদিও ঐরূপ সাহায্য পাইবার উপযুক্ত পরিবারের সংখ্যা বিরল নহে।

নিম্নে ৬ই হইতে ২৮ শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

থানা রাণীনগর।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
রাণীনগর (৯।১০।১৮)	২৮	১৯১	৯॥২
ভাণ্ডার গ্রাম (১০।১০।১৮)	৪১	৪২৪	২১/৮
ঐ, পর সপ্তাহে	৪১	৪০০	২০/
বিল্ কৃষ্ণপুর (৭।১০।১৮)	১৬	১০৪	৫/৮
ঐ, পর সপ্তাহে	১৬	১০১	৫/২
রাতোয়াল (৭।১০।১৮)	৪৩	৫২৪	২৬/৮
ঐ, পর সপ্তাহে	৪৩	৪১৮	২০৸৬
ঐ, "	৪০	২২২	১১/৪

থানা নওগাঁ।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
নওগাঁ (৭।১০।১৮)	৫৮	৫০৮	২৫।৩
ঐ, পর সপ্তাহে	৫৯	৪৮৮	২৪।৬
শৈলগাছি (৮।১০।১৮)	২২	৩০৪	১৫/৮
বলিহার (৩০।৯।১৮)	২৮	৯৭	৪৸৪
ঐ, পর সপ্তাহে	৩৪	১৭২	৮॥৪
ঐ, "	৩৫	১৬১	৮২/

তুবলহাটী (৭।১০।১৮)	৩৫	২৭১	১৩॥২
ঐ, পর সপ্তাহে	৩৫	২৪৯	১২/৮
ঐ, ”	৩৬	২৮১	১৪/২
ঐ, ”	৩৭	১০৫	৫।০
হাঁসাইগাড়ী (৯।১০।১৮)	১৩	১৫৫	৭৸০
ঐ, পর সপ্তাহে	১৩	১৪৫	৭।০
ঐ, ”	২৩	১৮৩	৯/৬

১৭/মণ চাউলও কেন্দ্রগুলি হইতে সাময়িক সাহায্যরূপে দেওয়া হইয়াছিল। থানা রাণীনগরে কাশিমপুর কেন্দ্র গত ৫ই অক্টোবর বন্ধ হইয়াছে।

পুরাতন বস্ত্র ব্যতীত ১৫৫ জোড়া নূতন বস্ত্র কেন্দ্রগুলি হইতে বিতরিত হইয়াছে। হাঁসাইগাড়ী কেন্দ্র হইতে গত ২রা হইতে ২৩ শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৯খানি গ্রামে ৮৪০টী গরুকে ৩৫ কাহন খড় ৪ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে।

ক্রমশঃ বন্যাপ্লাবিত উত্তরবঙ্গের অধিবাসিগণের অবস্থা পূর্ব্ববৎ হইয়া আসিতেছে, শীঘ্রই আমরা অন্যান্য সাহায্য-কেন্দ্রগুলিও বন্ধ করিব। যাঁহারা অর্থাদি দান করিয়া দুঃস্থ নারায়ণগণের সেবায় সহায়তা করিয়াছেন, সেই সকল সদাশয় ব্যক্তিগণের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ, যাঁহারা দুঃসময়ে সাহায্য পাইয়াছেন তাঁহাদেরও কৃতজ্ঞতা আমরা জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের তহবিলে এখনও যে অর্থ আছে তদ্দ্বারাই আমরা বর্ত্তমান সেবাকার্য্য সমাধা করিতে পারিব; কিন্তু হয় তো ভবিষ্যতে ভগবান না করুন, উত্তরবঙ্গবাসীর পুনঃসাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে। অন্যান্য জেলা হইতেও (যথা বাঁকুড়া মানভূম, পুরী প্রভৃতি) আমরা এখনই সাহায্যপ্রার্থনার আবেদন প্রাপ্ত হইতেছি। ঐ সকল স্থানের অবস্থাসম্বন্ধে আমরা অনুসন্ধান করিতেছি, বোধ হয় শীঘ্রই সাহায্যকেন্দ্র খুলিতে হইবে। অতএব আমাদের সহৃদয় দেশবাসিগণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা সাহায্য প্রেরণ যেন বন্ধ না করেন।

নিম্নলিখিত ঠিকানাদ্বয়ে সাহায্য প্রেরিত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে সাদরে গৃহীত হইবে ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণের দুরবস্থা মোচনকল্পে ব্যয়িত হইবে।

১। সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন,
উদ্বোধন অফিস, ১নং মুখার্জ্জি
লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

২। প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন,
মঠ, বেলুড় পোঃ, হাবড়া

গত আশ্বিন সংখ্যার উদ্বোধনে যে বস্ত্রবিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তদনন্তর যে সকল কেন্দ্র হইতে বস্ত্র বিতরিত হইয়াছে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল। মিশনের উত্তরবঙ্গে বন্যাকার্য্য শীঘ্র সমাপ্ত হইবে, কিন্তু এই বস্ত্রবিতরণ কার্য্য এখনও চলিতে থাকিবে। অতএব এই বস্ত্রবিতরণ কার্য্যে যিনি যাহা সহায়তা করিতে চান, তাহা উল্লিখিত ঠিকানাদ্বয়ের যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

বাঁকুড়া ৪৫, গড়বেতা (মেদিনীপুর) ৫ জোড়া, গুটীয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বরিশাল) ১৫ জোড়া ; কোটালীপাড়া, (ফরিদপুর) ৩০ জোড়া ; রাজসাহী জেলার বন্যাক্লিষ্ট স্থানে মিশনের কেন্দ্র সমূহ হইতে ৩৮৬ জোড়া ; কলমা (ঢাকা) ২০ জোড়া, বেলুড় (হাওড়া) ২১ জোড়া, সোণার গাঁ (ঢাকা) ২৫ জোড়া, ভুবনেশ্বর (পুরী) ৪০ জোড়া ; কোয়ালপাড়া, ৫০ জোড়া, বরানগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল হোম ৫ জোড়া এবং এতদ্ব্যতীত ১৯ জোড়া কাপড় বিভিন্ন দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে দেওয়া হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভিব্যক্তি।*

মহাপুরুষের জীবনালোকেই মানবমনে উচ্চ ভাব বিকাশ লাভ করে। যে সমস্ত ভাব দ্বারা আমাদের হৃদয় অনুপ্রাণিত, যে সকল চিন্তা দ্বারা আমাদের কার্য্য পরিচালিত, যাহা আমাদের জীবনকে কোন উচ্চ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, মহৎজীবনাদর্শের নিকট আমরা তজ্জন্য ঋণী। শাস্ত্রচর্চ্চা ও উপদেশ-শ্রবণ দ্বারা মনে সাময়িক প্রেরণা, হৃদয়ে ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাস লাভ হয় বটে, কিন্তু উহা দ্বারা জীবন গঠিত হয় না—'মানুষ তৈয়ারী' হয় না। কারণ, মানুষ যে সকল উচ্চ বিষয় পাঠ বা শ্রবণ করে অথবা চিন্তা ও কল্পনা সহায়ে যে সকল তত্ত্ব ধারণা করে, মহাপুরুষের জীবনেই উহাদের সাক্ষাৎ প্রকাশ। অতএব মহৎজীবনালম্বনই মহৎভাবলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। এই হেতু মহাপুরুষগণ সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সমাদৃত ও সম্পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

স্বাভিব্যক্তি কথাটী ইংরাজী personality শব্দের অনুবাদ হইলেও উহার প্রতিপাদ্য ভাব আমাদের সম্পূর্ণ দেশীয়, ভারতীয়। ভারতীয় অধিকারবাদ—যাহা ভারতীয় চিন্তার অবলম্বন, ভারতীয় সাধনার সোপান—তাহা এই স্বাভিব্যক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাভিব্যক্তি স্বীকার করিয়াই ভারত অসংখ্য ধর্ম্মমত, বিচিত্র অনুষ্ঠানসমূহ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভারত অজ্ঞকে অল্পজ্ঞের আসন প্রদান করিয়া ব্যক্তিগত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের ধর্ম্মসমন্বয়বাণী "যত মত তত পথ", "কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই" তাঁহার এই কথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত ভাব বা

* স্বামীজির ষট্‌পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে পঠিত।

স্বভাবের বিকাশই স্বাভিব্যক্তি। ব্যক্তিগত অধিকার বা স্বভাব যখন মানুষের চিন্তা ও কার্য্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে তখনই তাহাকে স্বাভিব্যক্তি বা personality বলা যায়। ইহা আত্মপরিচয়, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্য্যাদাসমন্বিত আত্মপ্রকাশ,—অভিমানদুষ্ট আত্মপ্রচার নহে। ইহা আপন মর্য্যাদারক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরের গৌরব রক্ষা করে। ইহা নিজ অধিকার লাভের সঙ্গে পরকেও অধিকার প্রদান করে। এই স্বাভিব্যক্তির উপরই মানবজীবনের বিশিষ্টতা। ইহা প্রত্যেকের জীবনে ভিন্নরূপ হইয়াও কাহারও মধ্যে কম কাহারও মধ্যে অধিক পরিস্ফুট। স্বামীজির মধ্যে উহার সম্পূর্ণ জীবন্ত ও জ্বলন্ত প্রকাশ। তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপে, কার্য্যে, ভাবে, চিন্তায় ও অঙ্গভঙ্গীতে স্বাভিব্যক্তি দেদীপ্যমান। তাঁহার জীবন আকাশের মত অনন্ত, বিচিত্র ও আলোকময়। অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম, অপূর্ব্ব তাঁহার বৈরাগ্য, জ্বলন্ত তাঁহার বিশ্বাস, অমিত তাঁহার তেজ, অসাধারণ তাঁহার বিদ্যা, অমানুষী তাঁহার প্রতিভা, অনন্ত তাঁহার জ্ঞান, অচিন্ত্য তাঁহার প্রেম! ভাবিবামাত্র কি এক কর্ম্মদৃপ্ত, চিন্তাপ্রবীণ, জ্ঞানগম্ভীর, প্রেমপূত, শান্তিস্নিগ্ধ, ভাবোজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময়, তেজোঘনমূর্ত্তি মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠে! ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভিব্যক্তি। ইহারই প্রভাবে তিনি বিলাসনিকেতন পাশ্চাত্যকে আত্মচৈতন্যে প্রবুদ্ধ, মৃতপ্রায় ভারতকে সঞ্জীবিত ও মোহগ্রস্ত বঙ্গভূমিকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন।

শৈশবের খেলাধূলা, কৈশোর ও যৌবনের বিদ্যাচর্চ্চা, সহচরগণের সহিত ব্যবহার ও কঠোর সংসার-সংগ্রামের মধ্যে স্বামীজির স্বাভিব্যক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইলেও উহা সর্ব্ব প্রথম সেই দিনই সুপরিজ্ঞাত, যে দিন তিনি সত্যলাভের প্রবল প্রেরণায় দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলন এবং হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা করিয়া, সংশয়ের পর সংশয়ে আচ্ছন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় আপনি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন কি?" কি অদ্ভুত প্রশ্ন! শাস্ত্রালোচনা এবং যথাসম্ভব ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া,

কৌলিক ও লৌকিক রীতিনীতির অনুবর্ত্তন করিয়া মানুষ চিরকালই মনে করে ধর্ম্মলাভ করিতেছি। কিন্তু ধর্ম্ম যে কেবল মতবিশ্বাস নহে, শুদ্ধ অনুষ্ঠান বা বিচার নহে, ধর্ম্ম যে সাক্ষাৎকারের বস্তু, উপলব্ধির বিষয়, এ কথা কয়জনের প্রাণে আঘাত করে? সত্যের সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত সত্য সম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা যে অন্ধগণের হস্তীসম্বন্ধে বিবাদের ন্যায় নিষ্ফল নিরর্থক, ইহা কয় জন বোঝে? তাই স্বামীজি জগৎকে নূতন করিয়া বলিয়া গেলেন,—

"বুদ্ধির সায় দিয়া আজ আমরা অনেক মূর্খামিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া কালই হয় ত আবার সম্পূর্ণ মত পরিবর্ত্তন করিতে পারি। কিন্তু যথার্থ ধর্ম্ম কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। ধর্ম্ম উপলব্ধির বস্তু—উহা মুখের কথা বা মতবাদ বা যুক্তিমূলক কল্পনামাত্র নহে—তাহা যতই সুন্দর হউক না কেন। ধর্ম্ম জীবনে পরিণত করিবার বস্তু, শুধু শুনিবার বা মানিয়া লইবার জিনিষ নহে; সমস্ত মন প্রাণ বিশ্বাসের বস্তুর সহিত এক হইয়া যাইবে—ইহাই ধর্ম্ম।"* "এই ঋষিত্ব ও বেদদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্ম্মানুভূতি। যতদিন ইহার উন্মেষ না হয়, ততদিন ধর্ম্ম কেবল কথার কথা ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রথম সোপানেও পদ স্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে।"†

সত্যলাভের কি প্রবল আকাঙ্ক্ষাই স্বামীজির হৃদয়ে ছিল। স্বামীজি নিজে যাহা করিয়াছেন তাহাই মুখে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার জীবন তৎপ্রচারিত ভাব ও চিন্তাসমূহের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ। ঈশ্বরলাভের অন্তরায় জানিয়া গুরুপ্রদত্ত অযাচিত অষ্টসিদ্ধি সদর্পে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অভাবের ভীষণ তাড়নায় "বুদ্ধিহারা" প্রায় হইয়াও গুরুর কথায়ও জগদম্বার নিকট ঐহিক বিষয় যাচ্ঞা করিতে পারেন নাই। সত্য-দর্শনের প্রবল আগ্রহে সাংসারিক দারুণ অভাব ভুলিয়া, ঐহিক উন্নতির সমস্ত

* সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ।

† হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া, কাশীপুরের উদ্যানে কঠোর সাধনাবলে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের সংস্পর্শে আত্মপরিচয় লাভ করিয়া স্বামীজি অচিরেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাকে অনন্যসাধারণ জীবন যাপন করিতে হইবে। তাই সহপাঠিগণকে অনেক সময় রহস্য করিয়াই যেন বলিতেন, "দেখ্, তোরা হয় ত বড় জোর উকিল, ডাক্তার বা জজ্ হবি, আমি কিন্তু নূতন কিছু কোর্‌বো।" সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন সাধারণ সন্ন্যাসিগণের মত মানবসমাজের বাহিরে কেবল আত্মমুক্তির সন্ধানে অথবা আনন্দ আস্বাদনে ব্যয়িত হইবে না—তাঁহার কর্ত্তব্য শুদ্ধ নিজ-দেহের, নিজ সমাজের, নিজ দেশের প্রতি নয়, সমস্ত সমাজের সমস্ত দেশের সমস্ত জাতির,সমস্ত জগতের জন্য তাঁহার জীবন। কাশীতে অব-স্থান কালে তিনি শ্রীযুক্ত প্রমদা দাস মিত্রকে বলিয়াছিলেন—"Some day I shall fall upon the society like a bomb-shell." * পরিব্রাজকবেশে ভারতের সর্ব্বত্র কখনও হিমারণ্যে কঠোর তপস্যায়, কখনও তীর্থমন্দিরে পূজা ধ্যানে, কখনও রাজপ্রাসাদে ধর্ম্মোপদেশ দানে, কখনও দরিদ্রগৃহে আতিথ্য গ্রহণে, কখনও চণ্ডালসহ মধুর আলাপনে, কখনও রাজপথে, মরুভূমিতে বা সাগরতটে অনশনে,—দীর্ঘ সাত বৎসর কাল যাপন করিয়া ভারতের উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধন, সাধু, অসাধু সকলের সহিত সমভাবে পরিচিত হইয়া, ভারত-জীবন-সমস্যার এক অভিনব উপায় স্থির করিয়া, জগতের মোহস্বপ্ন ভাঙ্গিবার জন্য সুদূর আমেরিকায় ছুটিয়া গেলেন। অসহায়, অজ্ঞাতনামা, গৈরিকধারী হিন্দু সন্ন্যাসীযুবক আত্মনির্ভরতাবলে ভোগমত্ততা, জাত্যভিমান, জ্ঞানগরিমা ও ধর্ম্মবিদ্বেষের মধ্য দিয়া আপন পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। যে চিকাগো মহাসভায় ধর্ম্মপ্রচারকগণ স্ব স্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকেই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তথায়

* একদিন আমি বজ্রের ন্যায় সমাজের উপর পতিত হইব।

হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব ও ঈশ্বরদর্শন প্রচার দ্বারা, সমন্বয় ও শান্তির বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া জগতের চিন্তাপথে নূতন আলোক প্রদান করেন। বৌদ্ধযুগের পর বিদেশে ভারতের ধর্ম্মপ্রচার এই প্রথম। ইহা স্বামীজির স্বাভিব্যক্তির আর এক জ্বলন্ত নিদর্শন। New york Herald বলিয়াছিল ঃ—Vivekananda is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions ; after hearing him we feel, how foolish it is to send missionaries to this learned nation. *

চিকাগো মহাসভার পর স্বামীজি আমেরিকাবাসিগণের ধর্ম্মোৎকণ্ঠা মিটাইবার জন্য তিন বৎসর কাল তথায় অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি দুইবার নিমন্ত্রিত হইয়া লণ্ডন গমন করেন ও ইউরোপের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। তথায় সুবিখ্যাত Prof. Max-Muller ও Kiel Universityর দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক Paul Duessenএর সহিত তাঁহার সাক্ষৎ হয়। তাঁহারা উভয়ে স্বামীজির সহিত আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন ও তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাচ্যশাস্ত্র আলোচনা সম্বন্ধে স্বামীজি বলিয়াছিলেন,—If Max-Muller is the old pioneer of the new movement, Duessen is certainly one of its younger advance guards." এই সাক্ষাতের ফলেই Prof. Max-Muller, 'The Life and Sayings of Sri Ramkrishna' নামক তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন। স্বামীজির ওজস্বিনী ভাষা, তেজোদ্দীপ্ত বদন, অগাধ পাণ্ডিত্য, গভীর জ্ঞান, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, দৃঢ় অধ্যবসায় এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সুমহৎ চরিত্র ও ধর্ম্মোপলব্ধি পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের প্রাণে সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্বসমূহ গভীর ভাবে অঙ্কিত করিয়া দেয়। তাঁহার পূত সংস্পর্শে

* বিবেকানন্দই যে ধর্ম্ম মহাসভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় বিষয় হইয়াছিলেন, ইহাতে আর কিছুই সন্দেহ নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া আমাদের বেশ ধারণা হইয়াছে যে, এই সুশিক্ষিত জাতির নিকট আমাদের ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করা কি নির্বুদ্ধিতার কাজ।

ও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে কত চরিত্রহীন চরিত্রবান্, কত সন্তপ্ত শান্তিপ্রাপ্ত, কত নাস্তিক ঈশ্বরবিশ্বাসী, কত নর নারী ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসব্রতধারী হইয়াছিলেন।

স্বামীজির এই সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতাসকল রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, ও জ্ঞানযোগ নামে পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। এ সব তাঁহার ভক্তিমান্ শিষ্য Mr. Goodwinএর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। স্বামীজির বক্তৃতাবসানে Goodwin প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া উহা ছাপাইবার বন্দোবস্ত করিতেন ও প্রত্যুষে তাহা জনসমক্ষে প্রচার করিতেন। স্বামীজি কোন কোন সপ্তাহে ১৭টী বক্তৃতাও প্রদান করিতেন। বক্তৃতা ব্যতীত তিনি ক্লাশ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দান ও বহুসভাসমিতিতে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। স্বামীজির লণ্ডন অবস্থান সম্বন্ধে Mr. Eric Hammond লিখিয়াছেন,—"Clubs, societies, drawing-rooms opened their doors to him. Sets of students grouped themselves together in this quarter and that, and heard him at appointed intervals. His hearers, hearing him longed to hear further."* Indian Mirror পত্রিকার লণ্ডনবার্ত্তাবহ লিখিয়াছেন,—"It is a rare sight to see some of the most fashionable ladies in London seated on the floor, cross-legged, of course, for want of chairs, listening with all the *Bhakti* of an Indian *Chela* towards his *Guru*."† এইরূপ একদিনই

* ক্লাব, সোসাইটী, ড্রইংরুমসকলের দ্বার তাঁহার নিকট সদা উন্মুক্ত থাকিত। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রেরা নানাস্থানে জড় হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিত। আর একবার যিনি তাঁহার কথা শুনিতেন, তিনি পুনরায় তাহা শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতেন।

† লণ্ডনের সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্তবংশীয়া কতকগুলি মহিলা চেয়ারের অভাবে মেঝেতে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া একজন ভারতীয় শিষ্যের ন্যায় প্রগাঢ় গুরুভক্তি-সহকারে তদীয় কথা শ্রবণ করিতেছেন, এরূপ দৃশ্য বাস্তবিকই বিরল।

ভারতসেবাব্রতধারিণী ভগ্নী নিবেদিতা (Miss Margerate Noble) স্বামীজিকে প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন। The Master as I saw Him গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন,—

"সময়টী নভেম্বর মাসের এক রবিবারের ঠাণ্ডা বৈকাল বেলা এবং স্থান ওয়েষ্টএণ্ডের (West-End) একটী বৈঠকখানা; তিনি অর্দ্ধবৃত্তাকারে উপবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে মুখ করিয়া এবং কক্ষের অগ্নি রাখিবার স্থানে প্রজ্বালিত অগ্নির দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিলেন; আর যখন তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তৎপ্রদত্ত উত্তরটীর উদাহরণস্বরূপ কোন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন, তখন সেই গোধূলি ও অন্ধকারের সময় তত্রত্য দৃশ্যটী তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই ভারতীয় উদ্যানের অথবা সূর্য্যাস্ত সময়ে কূপান্তিকে বা গ্রামের উপকণ্ঠে তরুতলে উপবিষ্ট কোন সাধুর পার্শ্বে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দেরই এক কৌতুককর রূপান্তর বলিয়া বোধ হইয়া থাকিবে।

"ইংলণ্ডে আচার্য্য হিসাবে স্বামীজিকে আমি আর কখনও এমন সাদাসিধাভাবে দেখি নাই। ইহার পরে তিনি সর্ব্বদাই বক্তৃতা দিতেন; অথবা তিনি যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন তাহা এতদপেক্ষা অধিক সংখ্যক শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কাহারও কাহারও কর্ত্তৃক পদ্ধতি অনুযায়ী জিজ্ঞাসিত হইত। শুধু এই প্রথম বারেই আমরা মাত্র ১৫।১৬ জন অভ্যাগত ছিলাম। আমাদের মধ্যে অনেকে আবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। স্বামীজি তাঁহার গেরুয়া পোষাক ও কোমরবন্ধ পরিয়া আমাদের মধ্যে বসিয়াছিলেন।—যেন আমাদিগের নিকট কোন এক দূর দেশের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। মাঝে মাঝে এক একবার "শিব! শিব!" বলিতেছেন, উহা আমাদের নিকট কেমন নূতন নূতন ঠেকিতেছে—আর তাঁহার মুখমণ্ডলে লোকে খুব ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণের বদনে যে মিশ্রিত কোমলতা ও মহত্ত্বের ভাব দেখিতে পায়, তাহাই লক্ষিত হইতেছিল। হয়ত উহা সেই ভাব, যাহা রাফেল আমাদিগকে

তাঁহার Sistine Child * এর ললাটফলকে আঁকিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।"

অদ্ভুত ভারতীয় সাধুর অদ্ভুত শিক্ষাদান! আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদী মধ্যস্থ Thousand Island Park নামক দ্বীপে স্বামীজির অবস্থান ও শিক্ষাদান বর্ণন করিয়া অপর এক পাশ্চাত্য শিষ্যা মিস্ ওয়াল্ডো Inspired Talks নামক পুস্তকের সূচনায় লিখিয়াছেন ঃ—

"স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন লোকের সহিত বাস করাই অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করা। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সেই একই ভাব—আমরা এক ঘনীভূত ধর্ম্মভাবের রাজ্যে বাস করিতাম। স্বামীজি মধ্যে মধ্যে বালকের ন্যায় ক্রীড়াশীল ও কৌতুকপ্রিয় হইলেও এবং সোল্লাসে পরিহাস করিতে ও কথার চোটপাট জবাব দিতে অভ্যস্ত থাকিলেও, কখন মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেন না। প্রতি জিনিষটী হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথবা উদাহরণ দিবার বিষয় পাইতেন, এবং এক মুহূর্ত্তে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু পৌরাণিক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন।"

কিন্তু স্বামীজি কেবল প্রচারকার্য্যেই নিমগ্ন ছিলেন না। তৎ-প্রচারিত ভাবসমূহ যাহাতে লোকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবন গঠন করিতে পারে তজ্জন্য স্থানে স্থানে বেদান্তসমিতি স্থাপন করিয়া গুরু-ভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ ও পাশ্চাত্য শিষ্য স্বামী কৃপানন্দকে উহাদের ভারার্পণ করেন। এইরূপে পাশ্চাত্যে এক মহাজাগরণের সূত্র-পাত করিয়া স্বামীজি প্রায় চারি বৎসর প্রবাসের পর গুরুগতপ্রাণ মিঃ গুডউইন, ও মিষ্টার ও মিসেস্ সেভিয়ার সহ জন্মভূমি

* এই বিখ্যাত চিত্রখানির মধ্যস্থলে শিশু ঈশা ও তাঁহার জননী মেরীর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, বামে সেণ্ট সিক্টাসের, দক্ষিণে সেণ্ট বার্বারার এবং নিম্নে দুইটী দেবশিশুর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ইহা এখন ড্রেসডেনে।

ভারতে প্রত্যাগমন করেন। সেভিয়ারদম্পতী বহুকাল ধর্ম্মচর্চ্চায় নিরত থাকিয়াও সত্যনির্ণয় করিতে না পারিয়া স্বামীজিকে প্রথম দর্শন-মাত্র উভয়ে একই কালে বলিয়াছিলেন—"This is the man and this is the philosophy that we have been seeking in vain all through life."* এই সেভিয়ারদম্পতীই সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া হিমালয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণের মিলনক্ষেত্র মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বামীজির অপর ভক্ত Miss Henrietta Muller এর অর্থে বেলুড়মঠ স্থাপিত হয়। স্বামীজি ব্যতীত ইতিপূর্ব্বে আর কাহাকেও পাশ্চাত্যের অর্থে ভারতে মঠস্থাপন করিতে দেখা যায় নাই।

স্বদেশে পদার্পণ মাত্র সমস্ত ভারত যেন প্রবুদ্ধ—একপ্রাণ হইয়া দিগ্‌বিজয়ী ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিতে উদ্যত হইল। রাজাধিরাজ-সেবিত বিবেকানন্দ ভারতে সর্ব্বত্র যেরূপ অভিনন্দিত ও পূজিত হইয়াছিলেন এইরূপ আর কেহ কখনও হন নাই। স্বদেশ-দর্শন মাত্র তাঁহার প্রাণের আবেগ ও মনের বল যেন সহস্রগুণে বাড়িয়া উঠিল। জ্বলন্ত উৎসাহে তিনি কলম্বো হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র আপন জ্ঞান ও চিন্তাসম্পদ্‌ অকাতরে বিতরণ করিয়া ভারতের যথার্থ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ—

"অন্যান্য দেশের সমস্যাসমূহ হইতে এদেশের সমস্যা জটিলতর—গুরুতর। জাতীয় অবান্তর ভাব, ধর্ম্ম, ভাষা, শাসন—সমুদয় লইয়াই একটী জাতি গঠিত।* * * কেবল আমাদের পবিত্র পুরাণেতিহাস, আমাদের ধর্ম্মই আমাদের সম্মিলনভূমি—ঐ ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে।* * * যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারাই ইহা জানেন। আর আমরা চাই, আমাদের ধর্ম্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের আবালবৃদ্ধ-

* ঠিক এই লোককেই এবং এই ধর্ম্মমতকেই আমরা সারাজীবন ধরিয়া বৃথা অন্বেষণ করিতেছিলাম।

বনিতা সকলের নিকট, প্রচারিত হউক—সকলে সেইগুলি জানুক, বুঝুক আর নিজেদের জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করুক। * * * যদি রক্ত তাজা ও পরিষ্কার হয়, সে দেহে কোন রোগজীবাণু বাস করিতে পারে না। ধর্ম্মই আমাদের শোণিতস্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি উহা বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি ঐ রক্ত বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনৈতিক, সামাজিক, বা অন্য কোন বাহ্য দোষ, এমন কি, আমাদের দেশের ঘোর দারিদ্র্য দোষ—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে। * * * এই ধর্ম্মেই আমাদের জাতীয় মন, জাতীয় প্রাণপ্রবাহ দেখিতে পাইবে। ইহার অনুসরণ কর, তোমরা মহত্ব পদবীতে আরূঢ় হইবে। উহা পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। এই জাতীয় জীবনপ্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করিলে তাহার একমাত্র পরিণাম হইবে—বিনাশ। আমি অবশ্য একথা বলিতেছি না যে, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। আমি একথা বলিতেছি না যে, রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই। আমার এইটুকু মাত্র বক্তব্য এবং ইচ্ছা যে, তোমরা ভুলিও না যে, ঐগুলি গৌণমাত্র, ধর্ম্মই মুখ্য। ভারতবাসী প্রথম চায় ধর্ম্ম—তারপর চায় অন্যান্য বস্তু। ঐ ধর্ম্মভাবকে বিশেষভাবে জাগাইতে হইবে।"*

কিন্তু কর্ম্মবীর স্বামীজি কেবল কথায়ই কার্য্য শেষ করেন নাই। আমেরিকার ন্যায় এখানেও ভারতের জাতীয় উন্নতির জন্য এক মহা-যন্ত্র স্থাপন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠা স্বামীজির প্রবল কার্য্যকুশলতা, গভীর চিন্তাশীলতা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম দূরদর্শিতা ও বিশাল মহাপ্রাণতার পরিচায়ক। একদিকে উদার নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, অপরদিকে সাধনভজনাদি সহায়ে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায়। স্বামীজি দেখিতে পাইয়াছিলেন, "সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া দেশ ধীরে ধীরে মহা

* ভারতের ভবিষ্যৎ, মাদ্রাজ।

তমোগুণ হ্রদে ডুবিয়া গেল” অথচ ইহাকে জাতীয আধ্যাত্মিক সম্পদ্ ফিরিয়া পাইতে হইবে। কিন্তু তমোভাবাপন্ন ভাবতের পক্ষে ত্যাগপথ অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধ ঈশ্বরাবাধনা ও ধ্যানাদি সহাযে সত্যলাভ অতীব আশঙ্কাজনক। কাবণ, কর্ম্মহীন বৈরাগ্য অনেকস্থলে আলস্যেব রূপান্তব—প্রচ্ছন্ন তমোভাব মাত্র। অলস শান্তিপ্রিয়তা সজীব ভাবতন্ময়তাব ফল না হইযা নিশ্চেষ্ট জড়ত্বকে অবলম্বন করিযাই সাধাবণতঃ উপস্থিত হয। তাই স্বামীজি ত্যাগের সহিত কর্ম্ম সংযুক্ত করিয়া দিলেন। কোন্ কর্ম্ম? ‘দেশেব ও দশের’ উপকার। শিবজ্ঞানে জীবসেবা—দরিদ্র বিপন্ন নারাযণগণেব সেবা। কঠিন রোগেব কঠিন ঔষধ। সুখসৌন্দর্য্য ও সম্পদের মধ্যে মঙ্গলমযের মঙ্গলহস্ত দর্শন অনেকের পক্ষেই সম্ভবপব। কিন্তু দারিদ্র্য, দুঃখ, বোগ ও মৃত্যুমধ্যে মঙ্গলমযেব ‘সত্যং শিবং সুন্দবং’ মূর্ত্তির সন্ধান কয়জন পায? ‘অসিধরাকবালিনী’ মা যে ‘বরাভযদাযিনী’ একথা কেই বা বুঝে? বিনাশ ও লযমুখে জীবেব সংসারস্বপ্ন ঘুচাইয়া নিত্যানন্দেব সন্ধান বলিযা দেওযাই সংহাবিণী বিদ্যাশক্তির কার্য্য। সংহাবিণী মহাশক্তির এই কল্যাণময়ী মূর্ত্তির দর্শন না পাইলে—রোগ, শোক মৃত্যু, ও ধ্বংসেব এই ক্ষেমঙ্কব ভাব বুঝিতে না পাবিলে মঙ্গলময়ের যথার্থ ধাবণা হয না, ‘মঙ্গলময’ কেবল কথার কথা—আত্মপ্রতাবণা মাত্র। তাই স্বামীজি কঠোবেব উপাসনায, ভীষণের পূজায ভাবতকে আহ্বান করিলেন,—

“জাগো বীব, ঘুচায়ে স্বপন, শিযবে শমন, ভয কি তোমাব সাজে?
দুঃখ ভার, এ ভব-ঈশ্বব, মন্দিব তাঁহাব প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥
পূজা তাঁব সংগ্রাম অপার, সদা পবাজয় তাহা না ডবাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥”

শিবজ্ঞানে জীবসেবা ব্যবস্থার আব এক উদ্দেশ্য ধর্ম্মসমন্বয়। একমাত্র সার্ব্বভৌমিক বেদান্তই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বযের ভিত্তি। তাই স্বামীজি দেশকালপাত্র বিবেচনা কবিযা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সর্ব্বভূতে নারায়ণ বুদ্ধি স্থির করিবাব জন্য বলিলেন,—

"ব্রহ্মহতে কীটপরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর !"

মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ের আরোপ করিয়া যেমন হৃদয়মন্দিরে সচ্চিদানন্দের দর্শন লাভ হয়, ঈশ্বর বোধে জীবসেবা করিয়াও সেইরূপ সর্ব্বভূতে নারায়ণ দর্শন ঘটিবে, সন্দেহ কি। বেদান্তোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের এই অভিনব উপায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটই স্বামীজি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের কথায় এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোক পাইয়া স্বামীজি একদিন বলিয়াছিলেন,—'অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ-সংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্ম্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়; সংসারের সকল কাজ উহার অবলম্বনে করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সেই সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল, ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ বা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায় ? ঐরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ

হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।

'ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায় ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের সুদূরপরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শন-পূর্ব্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্ত সাধক স্বল্পকালেই কৃতকৃতার্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। কর্ম্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যে সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ কর্ম্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও থাকিতে পারে না তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই যে কর্ত্তব্য এবং উহা করিলেই যে তাহারা আশু লক্ষ্যে পৌঁছাইবে এ কথা বলিতে হইবে না। যাহা হউক, ভগবান্ যদি কখন দিন দেন ত আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্ব্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকেই শুনাইয়া মোহিত করিব।'*

এই সেবাধর্ম্মের সহিত ভারতে জাতীয়তা গঠনের নিবিড় সম্বন্ধ আছে। প্রথমতঃ, ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের, সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর লোক ইহাতে সমভাবে যোগদান করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যথার্থ ত্যাগী, অনুরাগী ও কর্ম্ম-প্রবণ ব্যক্তি দ্বারাই দেশের, সমাজের ও জাতির কল্যাণ সম্ভবপর। তৃতীয়তঃ, স্বার্থত্যাগী শিক্ষিত জনগণের সেবা দ্বারা ভদ্র ও ইতর সাধারণের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইবে। শিক্ষিত সমাজ দ্বারা জন-সাধারণ পরিচালিত না হইলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।

পরন্তু স্বামীজি দেখিলেন—এই তমসাচ্ছন্ন, অনশনক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, মহামারীগ্রস্ত ভারতে কয়জন ত্যাগের মর্য্যাদা বুঝিবে? —"এই ভারতে কয়জন? সেই মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে নির্ম্মম হইয়া সর্ব্বত্যাগী হন? সেই দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩২৪।

যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সেই বিশাল হৃদয় কোথায় যাহা সৌন্দর্য্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।" অতএব ভারতের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। "রজোগুণের মধ্যে দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না করিলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?" অপরদিকে দেখিলেন, রজোগুণপ্রধান পাশ্চাত্য ভোগের চরম সীমায় উপনীত -ধ্বংসোন্মুখ। তাই জগৎগুরু বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য ও ভারতের জাতীয়-জীবন-সমস্যার এক অপূর্ব্ব সমাধান স্থির করিলেন।—"ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।"

এইরূপে স্বামীজি আপন জীবনব্রত কার্য্যে পরিণত করিয়া উহারই সৌকর্য্যসাধনার্থ প্রায় তিন বৎসর কাল পরে পুনরায় আমেরিকা যাত্রা করেন। এবার তিনি কালিফোর্ণিয়া প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারকালে জনৈক মহিলা ছাত্রীর নিকট হইতে সানফ্রান্‌সিসকো নামক স্থানে ১৬০ একর (৫০০ শত বিঘা) জমী প্রাপ্ত হইয়া "শান্তি আশ্রমের" প্রতিষ্ঠা করেন। সানফ্রান্‌সিসকো মন্দিরই পাশ্চাত্য জগতে প্রথম হিন্দু মন্দির। এক বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া স্বামীজি প্যারিস মহাসভায় (Congress of the History of Religions বক্তৃতা দিবার জন্য গমন করেন। প্যারিস অবস্থান কালে বহু বিখ্যাত কবি, দার্শনিক, অধ্যাপক, ভাস্কর, চিত্রকর, বিজ্ঞানবিৎ, গায়ক, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সহিত স্বামীজির আলাপ হয়। তৎপরে স্বামীজি ইউরোপের নানাস্থান—বিয়েনা, কনষ্টান্টিনোপল, এথেন্স, এবং মিশর দর্শন করিয়া

সহসা সকলের অজ্ঞাতসারে একেবারে বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার এই শেষ পাশ্চাত্য দেশ দর্শন সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন,—"স্বামীজি এই কয়মাস কাল ইউরোপ ও আমেরিকায় যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন, তাহা হইতে লোকের সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই অধিক মনে হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার আশপাশের জগৎকে মোটেই গ্রাহের মধ্যে আনিতেন না বলিলেই হয়। সচরাচর লোকে জিনিষকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকে, তিনি তৎপ্রতি আদৌ খেয়াল করিতেন না, অত্যধিক সফলতা লাভ করিয়াও তিনি কদাপি এতটুকু চমকিত বা সন্দিহান হইতেন না। বিস্মিত না হইবার কারণ, যে মহাশক্তি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছিল তাহার মাহাত্ম্য তিনি অতি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কার্য্যে বিফল মনোরথ হইলেও তিনি হতাশ হইয়া পড়িতেন না। জয় পরাজয় উভয়ই আসিবে এবং চলিয়া যাইবে—তিনি তাহাদের সাক্ষী মাত্র।*" তিনি এবার দেড় বৎসর পর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার দৃঢ় শরীর ইতিপূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তথাপি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নানাস্থান দর্শন ও জ্বলন্ত উৎসাহে শিক্ষাদান ও অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

জ্ঞানের সহিত ভাবের এবং কর্ম্মের সহিত সমতার মিশ্রণ স্বামীজির জীবনের দুইটী প্রধান বিশেষত্ব। পাশ্চাত্যবিজয়ী বেদান্তমূর্ত্তি স্বামীজির জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া General Assembly College এর Principal William Hastie তাঁহার জীবনের প্রারম্ভেই বলিয়াছিলেন,—He is an excellent philosophical student. In all the German and English universities there is not one student so

* আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

brilliant as he*" স্বামীজির গভীর প্রেম চারিটী বিশেষভাবে প্রকটিত ঃ—

প্রথমতঃ; তাঁহার স্বদেশানুরাগ। কলিকাতায় বক্তৃতাকালে তিনি বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বে একজন ইংরাজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "স্বামীজি! চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবমুকুটধারী, মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্য ভূমিতে ভ্রমণের পর আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগিবে?" আমি বলিলাম, "পাশ্চাত্য ভূমিতে আসিবার পূর্ব্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পর্য্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের হাওয়া আমার নিকট এখন পবিত্রতামাখা, ভারত এখন আমার নিকট তীর্থস্বরূপ।' ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তর আমার আসিল না।" †

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার গুরুভক্তি। গুরুদেবের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজি একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। কতবার কথোপকথন ও বক্তৃতাস্থলে তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া আর বলিতে পারেন নাই। মান্দ্রাজে প্রদত্ত The Sages of Inda বিষয়ক বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"যদি আমার জীবনে একটী সত্যও বলিয়া থাকি, তবে সে তাঁহার, তাঁহারই বাক্য; আর যদি এমন অনেক কথা বলিয়া থাকি যাহা অসত্য, ভ্রমাত্মক—যাহা মানবজাতির কল্যাণকর নহে, সেগুলি সবই আমার। তৎসমুদয়ের জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।"

কলিকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে তাঁহার অভিনন্দনকালেও তিনি গুরুদেবের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"আমাকে দেখিয়া তাঁহাকে বিচার করিও না; আমি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্র মাত্র। আমাকে দেখিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচার করিও না; উহা এত উন্নত ছিল যে, আমি অথবা তাঁহার অপর কোন শিষ্য যদি

* তিনি দর্শনশাস্ত্রের একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্র। সমস্ত জর্ম্মাণ ও ইংলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ ছাত্র একজনও নাই।

† কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর—ভারতে বিবেকানন্দ।

শত শত জীবন ধরিয়া চেষ্টা করি, তথাপি তিনি যথার্থ যাহা ছিলেন, তাহার কোটী ভাগের এক ভাগেরও তুলনা হইতে পারে না।"

তৃতীয়তঃ তাঁহার ঈশ্বরভক্তি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'নরেন্দ্রের নির্গুণে ভক্তি'। কিন্তু সগুণে ভক্তি ব্যতীত নির্গুণে ভক্তি লাভ হয় না। স্বামীজিও ভক্তিযোগে বলিয়াছেন যে, "ভক্তি আমাদের প্রকৃতিস্রোতের সহিত সামঞ্জস্য ভাবে প্রবাহিত। আমরা ব্রহ্মের মানবীয় ভাব ব্যতীত অপর কোন ভাব ধারণা করিতে পারি না।" স্বামীজির রচিত স্তোত্রাদির মধ্যে এবং কাশ্মীরে ক্ষীরভবানীর পূজায় তাঁহার স্বগুণে ভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্থতঃ তাঁহার বিশ্বপ্রেম। স্বামীজি যেন এক দিকে শঙ্করের মেধা অপর দিকে বুদ্ধের হৃদয় লইয়া জন্মিয়াছিলেন। একমাত্র মুক্তাত্মাগণই বলিতে পারেন,—

"আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব,—'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ'—এই আমার ধর্ম্ম। যার ভাগ্যে থাকে, সে এই মহাকার্য্যে সহায়তা করতে পারে।"

অপার জ্ঞানের সহিত অপার প্রেমের ন্যায়, অশেষ কর্ম্মের সহিত অসীম শান্তভাবের মিশ্রণও স্বামীজির জীবনে অনির্ব্বচনীয়। অনন্ত কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও স্বামীজির মন সর্ব্বদা সমাধির উচ্চভূমিতে অবস্থিত ছিল। পরমহংসদেব বলিতেন—'নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ'। শিক্ষাদান কালে স্বামিজী কিরূপ আপনভাবে থাকিতেন, বিলাস বিভবের মধ্যে কিরূপ নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতেন, ভগ্নী নিবেদিতার লেখনীমুখে তাহার কথঞ্চিৎ পরিব্যক্ত হইয়াছে। বক্তৃতা দান কালে স্বামীজি সম্পূর্ণ তন্ময়—'a voice without body' হইয়া যাইতেন। রঙ্গরসিকতার সময়ও 'he was never for a moment far from the dominating note of his life'। সুইজর্লণ্ডে প্রকৃতির মনোরম মূর্ত্তি দর্শনে, তপোভূমি ভারতে হিমালয় দর্শনে তাঁহার কর্ম্মে সম্পূর্ণ উদাসীনতা উপস্থিত হইত। তাঁহার নিজের কথায়ও দেখিতে পাওয়া যায়, "যেমন এই শৈলরাজের চূড়ার পর চূড়া আমার নয়নগোচর

হইতে লাগিল, ততই আমার কর্ম্মপ্রবৃত্তি—বৎসর বৎসর ধরিয়া আমার মাথায় যে বুদ্বুদ খেলিতেছিল তাহা—যেন শান্ত হইয়া আসিল, আর কি কায আমি করিয়াছি, ভবিষ্যতেই বা আবার কি কার্য্য করিবার সঙ্কল্প আছে, ও সকল বিষয়ের আলোচনায় মন না দিয়া এখন আমার মন—হিমালয় যে এক সনাতন সত্য অনন্ত কাল ধরিয়া শিক্ষা দিতেছে, যে এক সত্য এই স্থানের হাওয়াতে পর্য্যন্ত খেলিতেছে, ইহার নদী-সমূহের বেগশীল আবর্ত্তসমূহে আমি যে এক তত্ত্বের মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতেছি, সেই ত্যাগের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে।"*

গুণাতীত স্বামীজি যেন জগতে নিষ্কাম কর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই দুরূহ সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্বামীজির বালক-ভাবের মধ্যেও তাঁহার গুণাতীত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সেভিয়ার দম্পতীর সহিত তাঁহার ব্যবহার ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। লণ্ডনে দ্বিতীয়বার অবস্থান কালে স্বামীজির এই গুণাতীত বালকভাব এক সময়ে সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠে। তিনি আপনাকে শক্তিমানের যন্ত্ররূপে উপলব্ধি করিয়াই লিখিয়াছিলেন,—

"আমি যেদিন এই পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করেছি, সেই দিনটাকে ভেবে তাকে ধন্য ধন্য করছি। আমি এখানে এসে কত দয়া, কত ভালবাসা পেয়েছি; আর যে অনন্ত প্রেমস্বরূপ হতে আমার আবির্ভাব, তিনি আমার ভাল মন্দ প্রত্যেক কাযটী লক্ষ্য করে আসছেন—কারণ, আমি তাঁর হাতের যন্ত্র বই আর কি? তাঁর সেবার জন্য আমি আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছি—সব সুখের আশা ছেড়েছি—জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি। তিনি আমার সদা ক্রীড়া-শীল আদরের ধন—আমি তাঁর খেলুড়ে। এই জগতের কাণ্ড কার-খানার কোনখানে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—সব তাঁর খেলা, সব তাঁর খেয়াল। তিনি আবার কোন্ হেতুতে বা কোন্ যুক্তিতে চালিত হবেন? লীলাময় তিনি—এই জগৎনাট্যের সকল

* আলমোড়া অভিনন্দনের উত্তর।

অংশেই তিনি এই সব হাসি কান্নার অভিনয় কচ্ছেন। জো যেমন বলে—ভারি তামাসা, ভারি তামাসা!"

ইহাই যথার্থ বিবেকানন্দ! এই গুণাতীত অবস্থার জন্য তিনি সকল দেশের সকল জাতির সম্পত্তি, সকল আচার ব্যবহারের অতীত ছিলেন। তিনি নিজেই একবার প্যারি হইতে লিখিয়াছিলেন,—

"As for me, mind you, I stand at nobody's dictation. I know my mission in life, and no charivarism about me; I belong as much to the world as to India, no humbling about that. * * * What country has any special claim on me? Am I any nation's slave?" †

স্বামীজির চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব একাধারে অনেক গুণ। বাগ্মী, তার্কিক, সমালোচক, রসিক, লেখক, কবি, গায়ক, বাদক, শিল্পজ্ঞ বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া এ প্রবন্ধের কার্য্য নহে। স্বামিজীর স্মৃতিশক্তিও অদ্ভুত ছিল। পুস্তক পাঠে তিনি এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, একবার পড়িলে বড় বড় গ্রন্থ মুখস্থ হইয়া যাইত। স্বামীজির প্রতিভা সহপাঠিগণের চিত্তে কিরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিত প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়,—"Undoubtedly a gifted youth, sociable, free, unconventional in manners, a sweet singer, the soul of social circles, a brilliant conversationalist somewhat bitter and caustic, piercing with the shafts of a keen wit, the shows and mummeries of the world, sitting in the scorner's chair

* পত্রাবলী—২য় ভাগ।

আমি কাহারও আদেশের অপেক্ষা রাখি না। এ জীবনে আমার কি কর্ত্তব্য তাহা আমি বেশ জানি। শত চীৎকার ও বাধা বিপত্তিতেও আমি তাহা ভুলিব না। আমি ভারতের ওযেমন আপনার, সমস্ত জগতেরও তেমনি। ইহার চেয়ে খাট করিলে চলিবে না। * * * কোন্ দেশের আমার উপর বিশেষ দাবী আছে? আমি কি কোন জাতির ক্রীতদাস?'

but hiding the tenderest of hearts under the garb of cynicism ; altogether an inspired Bohemian but possessing what Bohemians lack,—an iron will ; somewhat peremptory and absolute, speaking with accents of authority and withal possessing a strange power of the eye which could hold his listeners in thrall." * বক্তৃতার ভাষা এবং রচনার মধ্যেও স্বামীজির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। চিকাগো মহাসভায় জীবনের প্রথম বক্তৃতায়ই তিনি জগদ্ব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি যে কিরূপ তেজঃপূর্ণ তাহা পড়িলেই বুঝা যায়। ইংরাজী সাহিত্যে কার্লাইলের মত আবেগময়ী ওজস্বিনী ভাষা কমই আছে। স্বামীজির বক্তৃতা পড়িয়া মনে হয়, স্বামীজি যেন তাঁহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। গভীর দার্শনিকতত্ত্বসমূহ তিনি অবলীলাক্রমে বুঝাইয়া দিতেন। বক্তৃতার ভাষা তাঁহার বাগ্মীতা, স্বাধীন চিন্তা, হৃদয়বত্তা ও তেজস্বিতার নিদর্শনস্বরূপ। স্বামীজির গদ্য রচনা কখনও গুরুগম্ভীর কখনও লঘু অথচ দ্রুত। তিনি বিশেষণবহুল সমাসযুক্ত বাক্য রচনায় যেমন নিপুণ, কথোপকথনের ভাষায়ও তেমন সিদ্ধহস্ত—কোথাও ভাবগাম্ভীর্য্য, তীক্ষ্ণ বিচার ও মৌলিক গবেষণা, কোথাও বা বিদ্রূপ, কটাক্ষ ও রসিকতা। স্বামীজির কবিতাগুলি তাঁহার সঙ্গীতাভিজ্ঞতা, ভাবুকতা ও কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক। 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'র মধ্যে তিনি নিপুণ শিল্পীর ন্যায় কোমল ও কঠোর ভাবের কি আশ্চর্য্য সমাবেশ করিয়াছেন!

স্বামীজির বিচিত্র স্বভাবের ন্যায় তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব এবং চাল

* বাস্তবিকই তিনি একজন অসীম মেধাবী, স্বাধীনচেতা, কুসংস্কারবিহীন, লোকপ্রিয়, সুগায়ক, দৃঢ়চেতা ও প্রকৃত হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন। বক্তৃতা বা কথোপকন সময়ে তাঁহার অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ চক্ষুদ্বয় হইতে এক স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নির্গত হইত। তিনি একাধারে বোহিমীয়াবাসিদিগের ন্যায় প্রবল কল্পপ্রবণ—ও তৎসহ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ছিলেন।

চলনও অপূর্ব্ব ছিল। তাঁহার উন্নত বপুঃ, বিস্তীর্ণ বক্ষঃ, জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল, তেজঃপূর্ণ আয়ত লোচন, মহিমমণ্ডিত প্রশস্ত ললাট দর্শক-মাত্রেরই হৃদয়-মন অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করিত। স্বামীজির অন্তরের ভাব তাঁহার মুখমণ্ডল ও চক্ষে সর্ব্বদাই প্রতিফলিত হইত। তাঁহার বদনমণ্ডল কথনও হাস্যোজ্জ্বল, কথনও চিন্তাধীর, কথনও কর্ম্মকঠোর, কথনও ভাবকোমল। তাঁহার চক্ষু কথনও হর্ষোৎফুল্ল, কথনও বিচার-গম্ভীর, কথনও প্রেমস্নিগ্ধ, কথনও ধ্যানস্তিমিত। তাঁহাকে দেখিলে কথনও রাজপুত্র, কথনও যোগী বলিয়া মনে হইত। স্বামীজির গতি কথনও অরণ্যবিহারী সিংহের মত স্বচ্ছন্দ, স্বানন্দ, কথনও বালকের মত দ্রুত ও চঞ্চল ছিল। এইরূপ তাঁহার অন্তরের ন্যায় দেহের ভাবও অনন্ত ছিল।

এই অগণিতগুণাধান, অনন্তজ্ঞানসমুদ্র, অফুরন্ত প্রেমের উৎস, বালসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ কে? শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, "বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের জন্ম, কর্ম্ম অলৌকিক এবং তাঁহাদের প্রচারকার্য্যও অত্যাশ্চর্য্য।" স্বামীজির নিজ জীবন সম্বন্ধেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য। মান্দ্রাজে প্রদত্ত 'The Sages of India' বিষয়ক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন,—

"এক্ষণে এমন এক ব্যক্তির জন্মের প্রয়োজন হইয়াছিল, যাঁহাতে একাধারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয় বিরাজমান থাকিবে, যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন, সকল সম্প্রদায় এক আত্মা, এক শক্তিতে অনুপ্রাণিত ও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, যাঁহার হৃদয় ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত দরিদ্র, দুর্ব্বল, পতিত সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্ব সকলের উদ্ভাবন করিবে, যাহাতে ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত সকল বিরোধী-সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন করিবে ও এইরূপ অদ্ভুত সমন্বয় সাধন করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যভাবে উন্নতিসাধক সার্ব্ব-

ভৌমিক ধর্ম্মের প্রকাশ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।"

কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের সঙ্গে স্বামীজির জীবনকেও আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে তাঁহার রচিত শ্লোকের চরণ দুইটি—

"আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।"

তাঁহার নিজের জীবনকেও স্মরণ করাইয়া দেয়। স্বামীজির জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সহিত সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বিবেকানন্দকে জানিতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণকে জানা আবশ্যক, শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিতে হইলেও বিবেকানন্দকে বুঝা আবশ্যক। অধিক কি, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই জানিতেন বিবেকানন্দ কে এবং বিবেকানন্দই বুঝিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কে। গুরুগতপ্রাণ স্বামীজি গুরুদেবের কথা বলিতে বলিতে একেবারে বিহ্বল হইয়া যাইতেন; ঠাকুরও 'নরেন্দ্র নরেন্দ্র' করিয়া পাগল হইয়া পড়িতেন। অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া কতবার কলিকাতায় ছুটিয়া গিয়াছেন। কখনও তাঁহাকে আদর করিতেন, কখনও নারায়ণ জ্ঞানে তাঁহার সেবা করিতেন। কখনও বলিতেন, 'নরেন্দ্র মৎস্যের মধ্যে রোহিত,' কখনও বলিতেন, 'গ্রহের মধ্যে সূর্য্য,' কখনও 'পদ্মের মধ্যে সহস্রদল'। আবার বলিয়াছিলেন,—'নরেন্দ্র আমার শ্বশুর ঘর' 'নরেন্দ্রের চাবি আমার কাছে রহিল, ও আপনাকে বুঝিতে পারিলে থাকিবে না।' গুরু-শিষ্যের এই অভূতপূর্ব্ব আকর্ষণ, এই অশ্রুতপূর্ব্ব সম্বন্ধ কি সৃষ্টি-প্রবাহের তরঙ্গবিশেষ, অথবা ইহা কি সেই সনাতন মহাকর্ষণের ভাগবতলীলার পুনঃপ্রকাশ? বুঝি বা শক্তিমানের লীলাবিলসন যাহা জ্ঞানময়, ভক্তিময় মূর্ত্তিধারণ করিয়া জগদুদ্ধারের কারণ হইয়াছিল, যাহা আনন্দঘন প্রেমঘন বিগ্রহাবলম্বনে জগতে প্রেমের অভিনয় ঘটাইয়াছিল, যাহা অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপে জগৎ

মাতাইয়াছিল, জটিলতর যুগ প্রয়োজন সাধনের জন্য ভক্ত্যাবৃত জ্ঞান-বপুঃ জ্ঞানাবৃত ভক্তিবপুঃ ধরিয়া পুনঃপ্রকটিত! স্বামীজিও এক সময়ে জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন,—"তাঁর (ঠাকুরের) ভিতরটা কেবল জ্ঞান, বাহিরটা কেবল ভক্তি, আমার বাহিরটা জ্ঞান, ভিতরটা ভক্তি।" কিন্তু জগৎ এই লীলারহস্য বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছে না, দেখিয়াও যেন নয়ন মুদ্রিত করিয়া রাখিতেছে। তাই আজিও জগৎ নূতন আদর্শের কল্পনা করিতেছে, নূতন যুগের স্বপ্ন দেখিতেছে। বর্ত্তমান আদর্শ যেন ইহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইহাতেও সে নিজের কার্য্য স্থির করিতে পারিতেছে না। এখনও যেন তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় হয় নাই।

হে ভারত, তুমিও কি ঘরের জিনিসকে চিনিয়া লইবে না? এস ভাই, "যে শক্তির উন্মেষমাত্র দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাসজাতি-সুলভ ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্রের পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর।" 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' তোমাদের জীবন তুচ্ছ ধন, মান, বিদ্যা ও যশের জন্য, ক্ষুদ্র পারিবারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টায় বিনষ্ট করিও না। যন্ত্রপুত্তলিকাবৎ গতানুগতিকের অনুসরণ না করিয়া, আপন আপন ভাব বুঝিয়া, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, যথার্থ শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হও। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ঈশ্বরদর্শন ও ধর্ম্মসমন্বয় বাণী সফল হউক!

এস ভাই, আর বিলম্ব করিও না; আপনাকে চিনিয়া লও, আপনাকে বিশ্বাস কর। "আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক" এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। এই আত্মপ্রত্যয়—এই শ্রদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বঙ্গীয় যুবকগণের মুখ চাহিয়া বড় আশায় বলিয়াছিলেন,—

"বীর হও; শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু আসিবেই আসিবে। আমি ত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই

কার্য্যেরও অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং এই কার্য্যের এতদূর বিস্তার ও উন্নতি সাধন করিবে যে, আমি কল্পনায়ও তাহা কখনও ভাবি নাই। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোনও দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় অতীত দশ বৎসর ধরিয়া সমুদয় ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ হইবে, যাহাতে ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয়ই বলিতেছি, এই হৃদয়বান্ উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর হইতেই শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য সকল প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত—এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে। তোমাদের সম্মুখে এই মহান্ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। অতএব আর একবার তোমাদিগকে সেই মহতী বাণী 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। ভয় পাইও না; কারণ, মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যত কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে, সবই সাধারণ লোকের মধ্যে। জগতে যত বড় বড় প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে। আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে তাহা পুনরায় ঘটিবে। কোন কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিবে। যে মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে সেই মুহূর্ত্তেই তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের অধিকাংশ দুঃখের কারণ, ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার। নির্ভীক হইলে এক মুহূর্ত্তেই স্বর্গ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হয়। অতএব—

'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মলাভের উপায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(স্বামী বিবেকানন্দ)

এদেশে (আমেরিকায়) আমার জনৈক মরমন (Mormon) ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি আমাকে তাঁহার মতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আমি, বলিয়াছিলাম, "আপনার মতের উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে কিন্তু কয়েকটী বিষয়ে আমরা একমত নহি। আমি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-ভুক্ত এবং আপনি বহু বিবাহের পক্ষপাতী, ভাল কথা, আপনি ভারতে আপনার মত প্রচার করিতে যান না কেন ?" ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি রকম, আপনি বিবাহের আদৌ পক্ষপাতী নহেন আর আমি বহু বিবাহের পক্ষপাতী, তথাপি আপনি আমাকে আপনাদের দেশে যাইতে বলিতেছেন !" আমি বলিলাম, "হাঁ, আমার দেশবাসী সকল প্রকার ধর্ম্মমতই শুনিয়া থাকেন—তাহা যে দেশ হইতেই আসুক না কেন আমার ইচ্ছা আপনি ভারতে যান ; কারণ প্রথমতঃ, আমি সম্প্রদায় সমূহের উপকারিতায় বিশ্বাস করি। দ্বিতীয়তঃ, তথায় এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান সম্প্রদায়গুলির উপর আদৌ সন্তুষ্ট নহেন, এবং এই হেতু তাঁহারা ধর্ম্মের কোন ধারই ধারেন না। সম্ভবতঃ তাহাদের কতকগুলি আপনার মত গ্রহণ করিতে পারেন।" সম্প্রদায়ের সংখ্যা যতই অধিক হইবে, লোকের ধর্ম্মলাভ করিবার ততই বেশী সম্ভাবনা থাকিবে। যে হোটেলে সব রকম খাবার পাওয়া যায়, সেখানে সকলেরই ক্ষুধাতৃপ্তির সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং আমার ইচ্ছা, সকল দেশে সম্প্রদায়সংখ্যা বাড়িয়া যাক্, তাহা হইলে লোকের ধর্ম্মজীবনলাভের সুবিধা হইবে। আপনি ইহা মনে করিবেন না যে, লোকে ধর্ম্ম চায় না। আমি

তাহা বিশ্বাস করি না। তাহারা যেটী চায় প্রচারকেরা ঠিক সেটী দিতে পারে না। যে লোক নাস্তিক, জড়বাদী বা ঐ রকম একটা কিছু বলিয়া ছাপমারা হইয়া গিয়াছে, তাহারও যদি এমন কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি তাহাকে ঠিক তাহার মনের মতন আদর্শটী দেখাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সে হয়ত সমাজের মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন লোক হইয়া উঠিবে। আমরা বরাবর যে ভাবে খাইতে অভ্যস্ত সেই ভাবেই খাইতে পারি। দেখুন না, আমরা হিন্দু, আমরা হাত দিয়া খাইয়া থাকি। আপনাদের অপেক্ষা আমাদের আঙ্গুল 'খেলে' বেশী, আপনারা ঠিক ঐরূপে ইচ্ছামত আঙ্গুল নাড়িতে পারেন না। শুধু খাবার দিলেই হইল না, আপনাকে উহা নিজের ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সেইরূপ শুধু যে কতকগুলি আধ্যাত্মিক ভাব দিলেই হইল তাহা নহে, সেগুলি এরূপ ভাবে দিতে হইবে যাহাতে আপনি উহা গ্রহণ করিতে পারেন। সেগুলি যদি আপনার নিজের ভাষায়—আপনার প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত করা হয়, তবেই আপনি উহাতে খুসী হইবেন। আমার নিজের ভাষায় কথা কহেন, এমন কোন ব্যক্তি আসিয়া আমি বুঝিতে পারি এরূপ ভাবে আমাকে তত্ত্বোপদেশ দিলে আমি তৎক্ষণাৎ উহা বুঝিতে পারি এবং চিরকালের মত উহা ধারণা কারতে সমথ হই—ইহা অতি সত্য ঘটনা।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, কত বিভিন্ন স্তরের এবং প্রকৃতির মানবমন রহিয়াছে এবং ধর্ম্মগুলির উপরেও কি গুরু দায়িত্বভার ন্যস্ত রহিয়াছে। এক ব্যক্তি দু তিনটী মত বাহির করিয়া বলিয়া বসিলেন যে, তাঁহার ধর্ম্ম সকল লোকের উপযোগী হওয়া উচিত। তিনি একটী ছোট খাঁচা হাতে লইয়া এই জগৎরূপ ভগবানের চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর, হস্তী, এবং সকলকেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে হস্তীটীকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ইহার মধ্যে ঢুকাইতে হইবে।" আবার, হয়ত এমন এক সম্প্রদায় আছে যাদের মধ্যে কতকগুলি ভাল ভাল ভাব

আছে। তাঁহারা বলেন, "সকলেই আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হউক!" "কিন্তু সকলের ত স্থান হইতেছে না?" "কুছ পরোয়া নেই! তাহাদিগকে কাটিয়া ছাঁটিয়া যেমন করিয়া পার ঢোকাও।" "আর তাহারা যদি না আসে?" "তাহারা নিশ্চিত উৎসন্ন যাইবে।" আমি এমন কোন প্রচারক বা সম্প্রদায় কোথাও দেখিলাম না যাঁহারা স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখেন, "আচ্ছা, লোকে যে আমাদের কথা শুনে না, ইহার কারণ কি?" ইহা না করিয়া তাঁহারা কেবল লোকদের অভিশাপ দেন আর বলেন, "লোকগুলো ভারি পাজি।" তাঁহারা একবার জিজ্ঞাসাও করেন না, "কেন লোকে আমার কথার কর্ণপাত করিতেছে না? কেন আমি তাহাদিগকে ধর্ম্মের সত্যসকল দেখাইতে পারিতেছি না? কেন আমি তাহাদের মাতৃভাষায় কথা কহিতেছি না? কেন আমি তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে সমর্থ হইতেছি না? বাস্তবিকই তাঁহাদের আরও ভাল করিয়া জানা উচিত, এবং যখন তাঁহারা দেখেন যে লোকে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছে না, তখন যদি কাহাকেও গালাগালি দিতে হয় ত তাঁহাদের নিজেদের গালাগালি দেওয়া উচিত। কিন্তু সকল সময়ে উহা লোকদেরই দোষ! তাঁহারা কখনও তাঁহাদের সম্প্রদায়কে বড় করিয়া সকল লোকের উপযোগী করিবার চেষ্টা করেন না।

সুতরাং কেন যে এত সঙ্কীর্ণতা রহিয়াছে তাহার কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—অংশ আপনাকে পূর্ণ বলিয়া সর্ব্বদা দাবী করিতেছে; ক্ষুদ্র—সসীম বস্তু আপনাকে অসীম বলিয়া সর্ব্বদা জাহির করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলির কথা একবার ভাবিয়া দেখুন—মাত্র, কয়েক শতাব্দী হইল ভ্রান্ত মানব-মস্তিষ্ক হইতে তাহাদের জন্ম হইয়াছে, তাহারা আবার কিনা ভগবানের অনন্ত সত্যের সমস্তই জানিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া আস্পর্দ্ধা করে! কতদূর আস্পর্দ্ধা একবার দেখুন! মানুষ যে কতদূর আত্মম্ভরী হইয়াছে, তাহা ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়। আর এই প্রকার দাবী যে বরাবরই ব্যর্থ হইয়াছে তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই এবং প্রভুর কৃপায় উহা

চিরকালই ব্যর্থ হইবে। এই বিষয়ে মুসলমানেরা সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা তরবারির সাহায্যে প্রত্যেক পদ অগ্রসর হইয়াছিল—এক হস্তে কোরাণ, অপর হস্তে তরবারি ; "হয় মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ কর নতুবা মৃত্যু আলিঙ্গন কর—আর দ্বিতীয় উপায় নাই!" ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন তাহাদের কি ভয়ানক উন্নতি হইয়াছিল—ছয়শত বৎসর ধরিয়া কেহই তাহাদিগের গতিরোধ করিতে পারে নাই। কিন্তু পরে এমন এক সময় আসিল যখন তাহাদিগকে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে হইয়াছিল। অপর কোন ধর্ম্মও যদি ঐরূপ করে তবে তাহাদিগেরও ঐ দশা হইবে। আমরা এই প্রকার শিশুই বটে! আমরা মানবপ্রকৃতির কথা সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই। আমাদের জীবনপ্রভাতে আমরা মনে করি যে, আমাদের অদৃষ্ট কি এক অসাধারণ রকমে গড়িয়া উঠিবে এবং আমাদের এই বিশ্বাস কিছুতেই দূর করিতে পারি না, কিন্তু জীবনসন্ধ্যায় আমাদের চিন্তা অন্যরূপ দাঁড়ায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। প্রথমাবস্থায়, যখন তাহারা একটু বিস্তৃতি লাভ করে তখন তাহারা মনে করে, কয়েক বৎসরেই সমুদয় মানবজাতির মন বদলাইয়া দিবে এবং বলপূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্মমত গ্রহণ করাইবার জন্য শত সহস্র লোকের প্রাণবধ করিতে থাকে। পরে যখন তাহারা অকৃতকার্য্য হয় তখন তাহাদের চক্ষু খুলিতে থাকে। দেখা যায়, ইহারা যে উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, আর ইহাই জগতের পক্ষে অশেষ কল্যাণজনক। একবার ভাবিয়া দেখুন যদি এই গোঁড়া সম্প্রদায়সমূহের কোন একটী সমুদয় পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িত তাহা হইলে আজ মানুষের দশা কি হইত! প্রভুকে ধন্যবাদ, যে তাহারা কৃতকার্য্য হয় নাই। তথাপি প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এক একটী মহান্ সত্যকে দেখাইয়া দিতেছে ; প্রত্যেক ধর্ম্মই কোন একটী বিশেষ সারবস্তুকে—যাহা তাহার প্রাণ বা আত্মাস্বরূপ—তাহাকেই ধরিয়া রহিয়াছে। আমার একটী পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে :—কতকগুলি রাক্ষস ছিল ; তাহারা মানুষ মারিত এবং

নানাপ্রকার অনিষ্টসাধন করিত। কিন্তু তাহাদিগকে কেহই মারিতে পারিত না। অবশেষে একজন খুঁজিয়া বাহির করিল যে তাহাদের প্রাণ কতকগুলি পাখীর মধ্যে রহিয়াছে এবং যতক্ষণ ঐ পাখীগুলি নিরাপদে থাকিবে ততক্ষণ কেহই তাহাদের মারিতে পারিবে না। আমাদের প্রত্যেকেরও যেন এইরূপ এক একটী প্রাণ-পক্ষী আছে, উহার মধ্যেই আমাদের প্রাণবস্তুটী রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের একটী আদর্শ, একটী উদ্দেশ্য রহিয়াছে, যেটী কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। প্রত্যেক মনুষ্যই এইরূপ এক একটী আদর্শ, এইরূপ এক একটী উদ্দেশ্যের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ। আর যাহাই নষ্ট হউক না কেন, যতক্ষণ সেই আদর্শটী ঠিক আছে, যতক্ষণ সেই উদ্দেশ্য অটুট রহিয়াছে, ততক্ষণ কিছুতেই আপনার বিনাশ নাই। সম্পদ্ আসিতে বা যাইতে পারে, বিপদ্ পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু আপনি যদি সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া থাকেন, কিছুই আপনার বিনাশসাধন করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধ হইতে পারেন, এমন কি শতায়ুঃ হইতে পারেন কিন্তু যদি সেই উদ্দেশ্য আপনার মনে উজ্জ্বল এবং সতেজ থাকে তাহা হইলে কে আপনাকে বধ করিতে সমর্থ? কিন্তু যখন সেই আদর্শ হারাইয়া যাইবে এবং সেই উদ্দেশ্য বিকৃত হইবে তখন আর কিছুতেই আপনার রক্ষা নাই। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ্—সমস্ত শক্তি মিলিয়াও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। এবং জাতি আর কি—ব্যষ্টির সমষ্টি বই ত নয়? সুতরাং প্রত্যেক জাতির একটী নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, যেটী বিভিন্ন জাতিসমূহের সুশৃঙ্খল অবস্থিতির পক্ষে বিশেষ দরকার, এবং যতদিন উক্ত জাতি সেই আদর্শকে ধরিয়া থাকিবে ততদিন কিছুতেই তাহার বিনাশ নাই। কিন্তু যদি ঐ জাতি উক্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে এবং উহা অচিরেই অন্তর্হিত হইবে।

ধর্ম্মের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। এই সকল পুরাতন ধর্ম্ম যে আজিও বাঁচিয়া রহিয়াছে, ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে,

তাহারা নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্য অটুট রাখিয়াছে। তাহাদের সমুদয় ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও, সমুদয় বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও, সমুদয় বিবাদ বিসম্বাদ সত্ত্বেও, তাহাদের উপর নানাবিধ অনুষ্ঠান ও নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর আবর্জ্জনা-স্তূপ সঞ্চিত হইলেও উহাদের প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ডটী ঠিক আছে— উহা জীবন্ত হৃৎপিণ্ডের ন্যায় স্পন্দিত হইতেছে—ধুক্ ধুক্ করিতেছে। উহারা যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে উহাদের একটীও তাহা বিস্মৃত হয় নাই। আর, সেই উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করা কি আনন্দকর। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুসলমানধর্ম্মের কথা ধরুন। খ্রীষ্টধর্ম্মা-বলম্বিগণ মুসলমানধর্ম্মকে যত অধিক ঘৃণা করেন এরূপ পৃথিবীর আর কোন ধর্ম্মকেই করেন না। তাঁহারা মনে করেন এরূপ নিকৃষ্ট ধর্ম্মের আর কখনও অভ্যুদয় হয় নাই। কিন্তু দেখুন, যাই এক জন লোক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল, সমুদয় ইসলামীয়গণ তাহাকে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভ্রাতা বলিয়া বক্ষে ধারণ করিল! এরূপ আর কোন ধর্ম্ম করে না। যদি এক জন রেড-ইণ্ডিয়ান মুসলমান হয়, তাহা হইলে তুরস্কের সুলতানও তাহার সহিত একত্রে ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না এবং সে শিক্ষিত বা বুদ্ধিমান হইলে রাজসরকারে যে কোন পদ লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু এদেশে আমি এ পর্য্যন্ত এমন একটীও গির্জ্জা দেখি নাই, যেখানে শ্বেতকায় ব্যক্তি ও কাফ্রি পাশাপাশি নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে পারে। এই কথাটী একবার ভাবিয়া দেখুন যে ইসলামধর্ম্ম তদন্তর্গত ব্যক্তি সকলকে সমানচক্ষে দেখিয়া থাকে। সুতরাং আপনারা দেখিতেছেন, এই-খানেই মুসলমানধর্ম্মের বিশিষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্ব। কোরাণের অনেক স্থলে ইন্দ্রিয়ৈকলক্ষ্য জীবনের কথা দেখিতে পাইবেন; তাহাতে ক্ষতি নাই। মুসলমানধর্ম্ম জগতে যে বার্ত্তা প্রচার করিতে আসিয়াছে তাহা এই যথার্থ ভ্রাতৃভাব—যাহা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বিগণ পরস্পরের প্রতি পোষণ করিয়া থাকে।

মুসলমানধর্ম্মের উহাই সারতত্ত্ব এবং স্বর্গ, জীবন প্রভৃতি আর আর বস্তু সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা তাহা

মুসলমানধর্ম্মের নিজস্ব নহে; তাহারা অন্য ধর্ম্ম হইতে ঢুকিয়াছে।

হিন্দুদিগের মধ্যে একটী জাতীয় ভাব দেখিতে পাইবেন—তাহা আধ্যাত্মিকতা। অন্য কোন ধর্ম্মে—পৃথিবীর অপর কোন ধর্ম্মপুস্তক-সমূহে ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে এত অধিক শক্তিক্ষয় করিয়াছে দেখিতে পাইবেন না। তাঁহারা এরূপভাবে আত্মার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোন পার্থিব সংস্পর্শই ইহাকে কলুষিত করিতে পারে না। আত্মা অপার্থিব বস্তু এবং এই অর্থে উহাতে কখনও মানবীয় ভাব আরোপ করা যায় না। সেই একত্বের ধারণা—সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধি সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে। তিনি স্বর্গে বাস করেন ইত্যাদি উক্তি হিন্দুদের নিকট প্রলাপোক্তি বই আর কিছুই নহে—উহা মনুষ্য কর্ত্তৃক ভগবানে মনুষ্যোচিত গুণাবলীর আরোপ মাত্র। যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহা এখনই এবং এইখানে বর্ত্তমান। অনন্তকালের একটী মুহূর্ত্ত যেরূপ অপর যে কোন মুহূর্ত্তও তাহাই। যিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী তিনি এখনও তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন। আমাদের মতে কিছু উপলব্ধি হইলেই তবে ধর্ম্মের আরম্ভ হইল—কতকগুলি মতে বিশ্বাসী হওয়া কিম্বা উহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা, অথবা প্রকাশ্য-ভাবে নিজ ধর্ম্মমত ব্যক্ত করা—ইহাদের কোনটীই ধর্ম্ম নহে। আপনি ঈশ্বর আছেন বলিতেছেন—"আপনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন কি?" যদি 'না' বলেন তবে আপনার তাঁহাতে বিশ্বাস করিবার কি অধিকার আছে? আর যদি আপনার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, তবে তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন না কেন? কেন আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া এই এক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন না। ত্যাগ এবং আধ্যাত্মিকতা—এই দুইটীই ভারতের মহান্ আদর্শ এবং ইহাদিগকে ধরিয়া আছে বলিয়াই তাহার এত ভুল ভ্রান্তিতেও বিশেষ কিছু যায় আসে না।

খ্রীষ্টানদিগের প্রচারিত মূল ভাবটীও ইহাই—"সতর্ক থাক এবং

প্রার্থনা কর—কারণ, ভগবানের রাজ্য অতি নিকটে”—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি করিয়া প্রস্তুত হও। আর এই ভাব কখনও নষ্ট হয় নাই। আপনাদের বোধ হয় মনে আছে যে, খ্রীষ্টানগণ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন কাল হইতে, অতি কুসংস্কারগ্রস্ত খ্রীষ্টান দেশসমূহেও অপরকে সাহায্য করা, হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করা প্রভৃতি সৎকার্য্যের দ্বারা সর্ব্বদা আপনাদিগকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করিয়া প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা এই লক্ষ্যে স্থির থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের ধর্ম্ম জীবিত থাকিবে।

সম্প্রতি আমার মনে একটা আদর্শের ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে। হয়ত ইহা স্বপ্নমাত্র। জানি না ইহা কখনও জগতে কার্য্যে পরিণত হইবে কি না। কিন্তু কঠোর বাস্তবে থাকিয়া মরা অপেক্ষা কখন কখন স্বপ্ন দেখাও ভাল। বড় বড় সত্য, তাহা যদি স্বপ্নও হয়, তথাপি ভাল—নিকৃষ্ট বাস্তব অপেক্ষা তাহারা শ্রেষ্ঠ। অতএব একটা স্বপ্ন দেখা যাক্।—

আপনারা জানেন যে, মনের নানা স্তর আছে। আপনি হয় ত একজন বস্তুতান্ত্রিক সহজজ্ঞানে আস্থাবান্ যুক্তিবাদী; আপনি আচার অনুষ্ঠানের ধার ধারেন না। আপনি যুক্তি দ্বারা পরীক্ষিত এমন সব বিষয়ে বিশ্বাস করিতে চান, যাহাতে কল্পনার এতটুকু অবসর মাত্র নাই। আবার পিউরিটান ও মুসলমানগণ আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের উপাসনাস্থলে কোন প্রকার ছবি বা মূর্ত্তি রাখিতে দিবেন না। বেশ কথা! কিন্তু অপর এক প্রকার লোক আছেন, তিনি একটু বেশী শিল্পকলাপ্রিয়—ঈশ্বরোপাসনা করিতে গিয়াও তাঁহার অনেকটা শিল্পকলার প্রয়োজন হয়; তিনি উহার ভিতর নানা সরল ও বক্ররেখা, বর্ণ, রূপ, প্রভৃতির সৌন্দর্য্য প্রবেশ করাইতে চান—তাঁহার পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি পূজার সর্ব্বপ্রকার বাহ্যোপকরণের প্রয়োজন। আপনি যেমন ঈশ্বরকে যুক্তি বিচারের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিও তেমনি তাঁহাকে ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্য দিয়া বুঝিতে পারেন। আর একপ্রকার

লোক আছেন, প্রেমিক—তাঁহার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল। ভগবানের পূজা এবং স্তবস্তুতি করা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন ভাব নাই। তাহার পর জ্ঞানী—তিনি এই সকলের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে বিদ্রূপ করেন এবং মনে করেন, "উহারা কি মূর্খ! ঈশ্বরের কি ক্ষুদ্র ধারণাই করিতেছে!"

তাঁহারা পরস্পরকে উপহাস করিতে পারেন কিন্তু এই জগতে প্রত্যেকেরই একটা স্থান আছে। এই সকল বিভিন্ন মন—এই সকল বিভিন্ন সাধনা দরকার। যদি আদর্শ ধর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহা উদার এবং বিস্তৃত হওয়া উচিত, যেন এই সকল বিভিন্ন মনের উপযোগী খাদ্য যোগাইয়া দিতে পারে। উহাকে—জ্ঞানীকে দার্শনিক বিচারের দৃঢ়ভিত্তি, উপাসককে ভক্তের হৃদয়, আনুষ্ঠানিককে উচ্চতম প্রতীকোপাসনালভ্য সমুদয় ভাব এবং কবিকে, সে যতদূর পারে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, এবং অন্যান্য প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ভাব যোগাইবার উপযোগী হইতে হইবে। এইরূপ উদার ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে হইলে, আমাদিগকে ধর্ম্মসমূহের অভ্যুদয়কালে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং তাহাদের সকলকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

অতএব গ্রহণই (acceptance) আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত—বর্জ্জন নহে। কেবল পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা (toleration) নহে—উহা অনেক সময়ে নাস্তিকতার নামান্তর মাত্র। সুতরাং আমি উহাতে বিশ্বাস করি না। আমি 'গ্রহণে' বিশ্বাসী। কেন আমি পরধর্ম্মসহিষ্ণু হইব? পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা বলিলে আমি বুঝি যে, কোন ধর্ম্মমত অন্যায় করিতেছে কিন্তু আমি দয়া করিয়া উহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছি। তোমার আমার মত লোক কাহাকেও দয়া করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এরূপ মনে করা কি ভগবানের নামে দোষারোপ করা নহে? আমি অতীতের ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাদের সকলের সহিতই পূজা করিব। প্রত্যেক সম্প্রদায় যে ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা

করে, আমি তাহাদের প্রত্যেকের সহিত ঠিক সেই ভাবে তাঁহার আরাধনা করিব। আমি মুসলমানদিগের মসজিদে যাইব, খ্রীষ্টান-দিগের গির্জ্জায় প্রবেশ করিয়া ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নতজানু হইব, বৌদ্ধদিগের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের ও সংঘের শরণ লইব, এবং অরণ্যে গমন করিয়া হিন্দুর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইব ও তাঁহার ন্যায়, সকলের হৃদয়কন্দর-উদ্ভাসিতকারী জ্যোতির দর্শনে সচেষ্ট হইব।

শুধু ইহাই নহে, যাহারা পরে আসিতে পারে তাহাদের জন্যও আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখিব। ঈশ্বরের পুস্তক কি সমাপ্ত হইয়াছে?— অথবা এখনও উহা ক্রমপ্রকাশ্য রহিয়াছে? জগতের এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহ এক অদ্ভুত পুস্তক। বাইবেল, বেদ, কোরাণ এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ যেন ঐ পুস্তকের এক একখানি পত্র, এবং উহার অসংখ্য পত্র এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। আমার হৃদয় সেই সকলের জন্যও উন্মুক্ত থাকিবে। আমরা বর্ত্তমানে রহিয়াছি, কিন্তু অনন্ত ভবিষ্যতের ভাবরাশি গ্রহণ করিবার জন্যও আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে তৎসমুদয়ই গ্রহণ করিব, বর্ত্তমানের জ্ঞানালোক উপভোগ করিব এবং ভবিষ্যতেও যাহা উপস্থিত হইবে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য হৃদয়ের সকল বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া রাখিব। অতীতের ঋষিকুলকে প্রণাম, বর্ত্তমানের মহাপুরুষদিগকে প্রণাম এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে আসিবেন তাঁহাদের সকলকে প্রণাম।

(সমাপ্ত)

বিলাইচণ্ডী ও মুসলমানের হিন্দুত্ব।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস)

কিছুদিন হইল উদ্বোধনের পাঠকপাঠিকাগণকে মীরাটের নৌচন্দী বা নবচণ্ডীর কথা বলিয়াছিলাম। আজ তাঁহাদের নিকট আর এক চণ্ডীদেবীর সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলাম। ইঁহার নাম বিলাই-চণ্ডী। এই দেবীর নামে ই, বি, রেললাইনের উপর একটি ষ্টেশন আছে, তাহা পার্ব্বতীপুর ষ্টেশন হইতে ৫।০ মাইল উত্তরে এবং সৈদপুর হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। শুনা যায়, বিলাইচণ্ডী হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমে বিজন অরণ্যমধ্যে বিরাট-রাজের প্রাসাদ বিদ্যমান আছে।

ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমোত্তর কোণে বিলাইচণ্ডীর স্থান। পূর্ব্বে বিরাট-রাজধানীর প্রবেশদ্বার এইখানে ছিল। তাহার নিদর্শন এখানকার ভগ্ন ইষ্টক ও মৃৎস্তূপ এবং শমীবৃক্ষ। শুনা যায়, এ দিকে যখন রেললাইন পাতা হয়, তখন স্থানীয় লোকদিগের আপত্তি সত্ত্বেও এখানকার প্রস্তর, প্রাচীর, দ্বার প্রভৃতি কতিপয় সাহেব কর্ত্তৃক নিঃশেষে স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব্ব হইতেই এই স্থান মৃৎস্তূপে পরিণত, অরণ্যে পরিবৃত ও শ্বাপদসঙ্কুল হইয়া উঠে। অরণ্যের চতুর্দ্দিক এক্ষণে পরিষ্কৃত হইয়া ধান্য ক্ষেত্রে শোভিত হইলেও মূল ভিটা ময়নাকাঁটার ক্ষুদ্র জঙ্গলে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। ভিটার একাংশে ঈষদুন্নত মৃৎস্তূপের উপর একটি নাতিবিস্তৃত ঘনপত্র শমীবৃক্ষ দণ্ডায়মান আছে। তাহার সন্নিহিত উচ্চতর মৃৎস্তূপের উপর মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত বংশনির্ম্মিত এক খানি প্রশস্ত কুটীর। অল্পদিন হইল জনৈক সন্ন্যাসী স্বীয় আশ্রমস্বরূপ উহা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর এক সন্ন্যাসী এখানে বাস করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রের

সীমান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান পল্লী আছে। এদিকে হিন্দুর সংখ্যা অল্প। সন্ন্যাসীর এই বনাশ্রমের অদূরে একটি অরণ্য আজিও বিদ্যমান আছে। তথায় ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু এখনও মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। কথিত আছে, পূর্ব্বে এখানে ময়ুর, হরিণ প্রভৃতি দলে দলে বিচরণ করিত, কিন্তু শিকারীর সন্তোষবিধান ও রসনার তৃপ্তিসাধনার্থ নয়নাভিরাম জীবকুলের স্বচ্ছন্দ-বিহার ও নৃত্যগীত চিরবিরাম লাভ করিয়াছে। স্থানীয় জনৈক মুসলমান "বাহে" বলিল, এখানে বহুকাল হইতে "মাদারের বাঘ" অর্থাৎ প্রসিদ্ধ পীরের রক্ষিত ব্যাঘ্র আছে, সেইটি মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলে না, কেহ তাহাকে মারিতেও পারে না। যাহা হউক এই ব্যাঘ্রভয়ে কেহ এস্থানে সন্ধ্যার পর আর থাকে না। কিন্তু দিবাভাগে মধ্যে মধ্যে দূর দূরান্তর হইতে হিন্দু নরনারী এবং সময়ে সময়ে মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ পূর্ব্বোল্লিখিত বৃক্ষটি দেখিতে আসেন। লোকের বিশ্বাস উহা সেই শমীবৃক্ষ যাহাতে পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাস-কালে গাণ্ডীবাদি দৈবাস্ত্রসমূহ লুকাইয়া রাখিয়া ছদ্মবেশে বিরাটরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্থানীয় মুসলমান ও অশিক্ষিত হিন্দুগণ ইহাকে "অচিনা গাছ" বলিয়া থাকে। ইহার কাণ্ডাংশ অনেকটা বটের ঝুরী-হীন কাণ্ডের মত। শাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও ঘনপত্র। সোঁদাল পাতা একটু কম চওড়া ও বেশী পুরু হইলে যেমন হইত এই গাছের পাতাও অনেকটা সেইরূপ। বৃক্ষতল গাঁদাফুলের গাছে বেষ্টিত করা হইয়াছে, এবং বৃক্ষের কাণ্ড-ত্বকে কোন কোন দর্শক স্ব স্ব নাম অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এই বৃক্ষতলে বিলাইচণ্ডীর অধিষ্ঠান। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এখানে কোন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুনা গেল, পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীঠাকুর শীঘ্রই চণ্ডীদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। মূর্ত্তি গঠন করিতে দেওয়া হইয়াছে।

দেবীপুরাণে ইঁহার উল্লেখ নাই। পুরাণ-সমুদ্র মন্থন করিলে বিলাইচণ্ডীর উদ্ভব হয় কি না বলা কঠিন। কিন্তু যে দেবী সর্ব্ব-ভূতেই মাতৃরূপেও শক্তিরূপে সংস্থিতা, আমরা যাঁহার "প্রতিমা

গড়ি মন্দিরে মন্দিরে," সেই রূপাতীতা কালাতীতার মূর্ত্তি যদি আজ এই পুরাণপ্রসিদ্ধ স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহাতে পৌরাণিক সংস্কার ক্ষুণ্ণ হয় না। মহাভারতের কাল আজিও মীমাংসার স্থল হইয়া থাকিলেও অর্জ্জুনাদির শমীবৃক্ষে অস্ত্ররক্ষা ঘটিত ব্যাপার যে শত শত বৎসরের কাহিনী তাহাতে কাহারও সন্দেহই থাকিতে পারে না। কিন্তু পাণ্ডবস্পর্শপূত শমীবৃক্ষ বলিয়া ইহার চতুর্দ্দিকে যে সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে তাহা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন। কারণ, বৃক্ষটি একশত বৎসরের হইবে কিনা সন্দেহ। ইহার পার্শ্বে আর একটি ক্ষুদ্র অচিনা গাছ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই দুইটি ব্যতীত এই জঙ্গলের মধ্যে এই জাতীয় বৃক্ষ আর নাই। ইহার শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল হয়, ফল হয় না। যদি এই বৃক্ষ সেই পৌরাণিক বৃক্ষের বীজ হইতে জাত বলিয়া স্বীকার করা হয় এবং সেই যুক্তিতে ইহার পবিত্রতা এবং পূর্ব্ব সংস্কার রক্ষা করিবার প্রয়াস হয়, তাহা হইলে প্রথমেই ইহার শমীত্বের প্রমাণ আবশ্যক। ইহা যে শমীবৃক্ষ তাহা উদ্ভিদ্বেত্তাগণের এবং এই স্থান যে বিরাটরাজ্যের প্রবেশ দ্বার ছিল তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হওয়া চাই। তাহা হইলে এবং দেশশুদ্ধ লোকের মুখে শোনা এই অচিনা গাছকে বেশ চিনাইয়া দিলে, হয় বহুদিনের ভ্রম দূর হইবে, না হয় বহুদিনের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়া স্থানের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হইবে এবং এক্ষণে যথায় দুই দশজন কৌতূহলীর আগমন হইতেছে, সেই ধান্যক্ষেত্র ও সর্ব্বত্র জলাবিলপরিবৃতা বিলভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিলাইচণ্ডীর তলা সহস্র সহস্র নরনারীর মহাতীর্থে পরিণত হইবে। আমরা শুনিলাম, অনেকে ঔষধার্থে এই বৃক্ষের পাতার রস খায়। কিন্তু কি রোগে ইহা সেব্য, আমাদের সংবাদদাতা 'বাহে' তাহা বলিতে পারিল না। সুতরাং আমরা এই বৃক্ষের পত্র "ইণ্ডিয়ান মেডিসিনাল প্লাণ্টস্" (Indian Medicinal Plants) * নামক বিরাট্ গ্রন্থের

* Indian Medicinal Plants (containing botanical descriptions, names in the principal vernaculars, properties and uses of over

অন্যতম সম্পাদক স্বনামপ্রসিদ্ধ মেজর বি, ডি, বসু, এম্ ডি, আই, এম, এস মহাশয়কে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দিলাম। * শমী আমাদের দেশের সাধারণ সাঁই গাছ। অভিধানে শমি বা শমী বাবলাজাতীয় বৃক্ষ, যাহার কাষ্ঠ যজ্ঞাদিতে ব্যবহৃত হয়। শমীবৃক্ষের আর এক নাম 'অগ্নিগর্ভা'। কারণ অগ্নি এই বৃক্ষের মধ্যে লুক্কাইত ছিল। এই অগ্নি পাণ্ডবদিগের দ্বারা লুক্কাইত অস্ত্রাগ্নি বলিয়াই বোধ হয়, কারণ অল্লাধিক পরিমাণে সকল বৃক্ষই অগ্নিগর্ভ।

চণ্ডীতলা হইতে এক মাইল উত্তর পূর্ব্বে আর একটি দর্শনীয় স্থান আছে। এই স্থান বহুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রসমূহ পরিবৃত একটি গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। এই গ্রামও বিলাইচণ্ডী নামে খ্যাত। ষ্টেশন হইতে শমীবৃক্ষ দেখিয়া এখানে আসিতে হইলে দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয় কিন্তু সোজা ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বোত্তর দিকে 'বুড়ীর হাট' নামক ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য দিয়া এখানে আসিতে প্রায় এক মাইল পথ চলিতে হয়। ইহার পর লক্ষ্মণপুর নামক গ্রাম। লক্ষ্মণপুরেও হাট বসে। ষ্টেশন হইতে এই সকল গ্রামে যাইবার জন্য ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যে পথ আছে তাহাতে গোযানের চলাচল আছে। কিন্তু বর্ষায় তাহাতে পদব্রজে গমন করাও দুঃসাধ্য। চারি পাঁচ ঘর হিন্দু ব্যতীত এখানে সমস্তই মুসলমানের বাস। গ্রামের জমীদার হিন্দু, যে কয় ঘর হিন্দুর উল্লেখ করা হইল শেখ খেরকেটু তাহাদের অন্যতম। ইহার স্ত্রী চয়নবিবি এবং কন্যা খয়রুউন্নিসা ব্যতীত সংসারে আর কেহ নাই।

1,300 Indian plants and used in medicines by the Medical Profession all over the world) by the late Lieut Col. R. A. Kirtikar, F.L.S., I.M.S. (Retd.), Major B. D. Basu, I.M.S. (Retd.), and an I.C.S. (Retd.). Price 250 Rupees only. Panini Office, Bhuvaneswari Asrama, Bahadurganj, Allahabad.

* এই প্রবন্ধ লেখার পর মেজর বসুর পত্র পাইয়াছি। তিনি জানাইয়াছেন যে উহা শমী বৃক্ষ নহে।

চতুর্দ্দিকে মুসলমান দেখিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে কয় ঘর হিন্দুর বাস, শেখ খেরকেটু বলিল, "আমরা চার পাঁচ ঘর মাত্র হিন্দু এখানে বাস করি।" ইহার বাড়ীর উত্তরে জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাস এবং দক্ষিণে কনিষ্ঠভ্রাতার বাড়ী। সহোদরদ্বয় ইঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছে, এবং শত্রুতা করিতেও ছাড়ে নাই। এ গ্রামে ইহাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের বাস। তাহার পূর্ব্বের সংবাদ ইহার জানা নাই। প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে এখানে দর্শনীয় কিছুই ছিল না, কিন্তু ১৩১৯ সাল হইতে শেখ খেরকেটু সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং স্বীয় আচরণ অনুষ্ঠানে হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান সাধারণের কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়াছে। শেখগৃহ হিন্দুর তীর্থে পরিণত হইতে চলিয়াছে। হিন্দু নরনারী ইহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে আসিয়া পূজা দিয়া মানত করিয়া দোলদুর্গোৎসব ও রাসপর্ব্বাদিতে যোগ দান করিয়া যায়। রোগযন্ত্রণা হইতে শান্তিলাভের জন্য, মোকদ্দমা মামলায় জয়লাভের আশায় লোক ইহার আশ্রয়গ্রহণ করে। ইনি শিবের নিকট, কালীর নিকট, মহিষমর্দ্দিনীর নিকট, হরির নিকট—ইহার প্রতিষ্ঠিত সকল দেবতার নিকট তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করিবার জন্য করযোড়ে প্রার্থনা করেন। দেবমূর্ত্তি ও গোব্রাহ্মণের প্রতি এই পরিবারের অচলা ভক্তি দর্শনে হিন্দুমাত্রেই মুগ্ধ; শেখ খেরকেটু এক্ষণে শ্রীপ্রেমহরি দাস এবং তদীয় কন্যা মুসম্মাৎ খয়রূউন্নিসা এক্ষণে শ্রীমতী প্রেমহরি দাসী নামে পরিচিত। গৃহিণী চয়নবিবির নামের পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু ইহারা তিন জনেই আচারনিষ্ঠ, নিরামিষভোজী,—মুসলমানের খাদ্য ইহাদের ত্রিসীমানার মধ্যে আসিতে পায় না। ইহারা পলাণ্ডু পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। সময়ে সময়ে শিক্ষিত হিন্দুগণ এখানে আসিয়া দেবালয়প্রাঙ্গণে রন্ধনাদি করিয়া অন্নভোজন করত ইহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। স্থানীয় মুসলমানদিগের ও জ্ঞাতিবর্গের বিবিধ উৎপীড়ন ও ভয় প্রদর্শন সত্ত্বেও ইহারা বিচলিত হয় নাই। ইহাদের সম্বন্ধে বহু কৌতূহলজনক সংবাদ পাইয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জনার্থ আমরা এই মুসলমান-হিন্দু পরিবার

ও দেবালয় দর্শনে গমন করি। আমরা বিলাইচণ্ডী ষ্টেশনে নামিয়া প্রথমেই এই যবন হরিদাসের গৃহে উপস্থিত হই।

কয়েকদিন পূর্ব্বে পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে খেরকেটুর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। সুতরাং দূর হইতে আমাদিগকে দেখিয়া সে মহা আনন্দ প্রকাশ করিল। খেরকেটুর প্রৌঢ় বয়স, দেহ কৃশ, গলায় তুলসীর মালা—মালার মধ্যে ফকীরদিগের গলায় পাথর বা কাচের যেরূপ মালা থাকে তাহারও দুইটি দানা, কপালে শ্বেত চন্দনের চিহ্ন—পরিধানে ধুতী, উর্দ্ধাঙ্গ নগ্ন। আমরা দেবালয়ের সম্মুখে কিছু দূরে একটি চালার নীচে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে খেরকেটুর সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। তাহার নিকট এক-খানি খাতা আছে, তাহাতে দেখিলাম হরিদ্বার পাতঞ্জল আশ্রমের পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গঙ্গানন্দ স্বামিজী মহারাজ, সৈদপুর নিবাসী বাবু কেদারনাথ ঘোষ, দার্জ্জিলিংয়ের বসু এণ্ড বসু কোম্পানীর বাবু খগেন্দ্রকুমার বসু, পার্ব্বতীপুরের (অধুনা শালিখা নিবাসী) অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার ব্রজনাথ মিত্র, কাটিহারের মেডিক্যাল অফিসর বাবু অঘোরনাথ ঘোষ, এল, এম, এস এবং আরও ৬০।৬৫ জনের নাম স্বাক্ষরিত দেখিলাম। ইহাদের অনেকেই অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। একজন মাড়বারী ভদ্রলোকের স্বাক্ষর দেখিলাম। ইনি সৈদপুরের মহাজন অর্জ্জুনদাস আগরওয়াল্। গত হরিপূজার সময় চারিজন খ্রীষ্টান, তন্মধ্যে দুইজন রেল বিভাগের সাহেব, আসিয়া কিছু কিছু চাঁদা দিয়া গিয়াছিলেন। শুনিলাম, দিনাজপুর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ সাহেব ঠাকুর দেখিতে আসেন। ইনি একবার ঠাকুরের ভোগের জন্য একশত ফজলী আম দিয়াছিলেন। ভোগের সামগ্রীর বা প্রেমহরিদাসের অর্থের অভাব হইলে এই দয়ালু সাহেব মধ্যে মধ্যে তাহা পূরণ করিয়া দেন। আমরা আলাপ করিতেছি এমন সময় শেখকন্যা শ্রীমতী প্রেমহরি দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিধানে সাড়ী মাত্র, মাথার চুল পশ্চাতে জড়ান—বিউনি করা হয় নাই, মধ্যমাকৃতি, উজ্জ্বল শ্যাম-

বর্ণা, পুষ্টাঙ্গী ও পূর্ণযৌবনা, প্রায় ষোড়শী কিন্তু কুমারী, মুখশ্রী গম্ভীর, দৃষ্টি স্থির, নেত্রদ্বয় সারল্যপূর্ণ, স্বল্পভাষিণী, বনহরিণীর ন্যায় স্বচ্ছন্দগতি কিন্তু ধীর ও বিনয়নম্রা। হরিদাসী আসিয়া পিতার ইঙ্গিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অভিবাদন করিল। তাহাকে যে দুই চারিটি প্রশ্ন করিলাম সংযতভাবে তাহার উত্তর দান করিয়া প্রস্থান করিল। আমরা তাহার পূর্ব্বনাম জিজ্ঞাসা করায় বলিল "পূর্ব্বে আমার নাম ছিল খয়রূউন্নিসা, এখন হইয়াছে প্রেমহরিদাসী"। হরিদাসীকে দেখিলে কখন যে তাহার নাম খয়রূউন্নিসা ছিল তাহা মনেই হয় না। উপযুক্ত হিন্দুপাত্র অর্থাৎ যে দেবসেবা বজায় রাখিতে পারিবে এরূপ হিন্দুর সন্তান পাইলে পিতা কুমারীর বিবাহ দিতে সম্মত।

বেলা একটা বাজিল। ভোগের আয়োজন জন্য প্রেমহরিদাস উঠিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেবালয়ে প্রবেশ করিলাম। বেড়া দিয়া ঘেরা খানিকটা জমির মধ্যে কয়েকখানি চালাঘরে মাচার উপর দেবমূর্ত্তিসকল স্থাপিত। ভিতরে যাইতেই বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দেবতার নাম করিতে বলায় প্রেমহরিদাস বলিয়া যাইতে লাগিলেন "প্রথম চালার মধ্যে জগন্নাথদেবের রথ ও ইন্দ্র-সভা, যমসভা, নরসিংহ অবতার, বিষ্ণু অবতার। পরবর্ত্তী চালার নীচে ও মাচার উপর সাজান রামসীতার রাজ্যাভিষেক, বিষেভদ্রা (বিষ্ণুভদ্রা), ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মূর্ত্তি, গৌর, নিতাই ও রাধা, জগন্নাথ, বলদেব, লক্ষ্মী, জন্মাষ্টমী (বসুদেবের কোলে কৃষ্ণ, মাথার উপর এক সর্প ফণা ধরিয়া আছে); তৃতীয় চালায় মাচার উপর বৃহৎ শিবমূর্ত্তি, মূর্ত্তির সম্মুখে দুই ঋষির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি; মহাদেবের বাম দিকে চতুর্থ চালা ঘরে দশভূজার মূর্ত্তি; পঞ্চম চালাঘরে বাসন্তী মূর্ত্তি, ষষ্ঠ চালার নীচে মাচার উপর মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি।" আমরা শুক্রবার গিয়াছিলাম। শুনিলাম আগামী-রবিবার জগদ্ধাত্রী ও সীতেশ্বরী কালী (?), এই গৃহের একাংশে স্থান পাইবেন। মূর্ত্তি গঠিত হইতেছে। সপ্তম চালার মধ্যে কৃষ্ণকালী, তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্বে জটিলা ও পদতলে রাধা, পার্শ্বে স্বতন্ত্র মঞ্চে বসন, বড়ায়া

(চণ্ডীর ভগ্নী শীতলা); অষ্টম চালাগৃহে গঙ্গাদেবী, মনসা ঠাকুরাণী, বুড়ী ঠাকুরাণী (চণ্ডী), ও মশান ঠাকুর (চণ্ডীর পুত্র ওলাউঠা ঠাকুর)। ঘরগুলি বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত। সমুদয় মূর্ত্তিই মৃণ্ময়। বর্ষার জলে এবং করতোয়া নদীতে বন্যা আসিয়া এস্থান জলমগ্ন হইলে মাটি গলিয়া রং উঠিয়া মূর্ত্তিগুলি অল্পাধিক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। মহাদেব যোগাসনে বসিয়া আছেন, নয়নদ্বয় কিন্তু বিস্ফারিত। জল লাগিয়া রং অনেক উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই উন্নতদেহ বিরাট্ মূর্ত্তিই এখানকার প্রধান দর্শনীয়। শুনিলাম, শিবস্থাপনাই এখানে প্রথম এবং অনাদিলিঙ্গ শিলামূর্ত্তি কত প্রাচীনকাল হইতে এখানে ছিল কেহ বলিতে পারে না। সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হয় কিন্তু এই শূন্যস্থান বহুকাল হইতে পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল। এক্ষণে ঠিক সেইস্থানে মৃণ্ময়মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ক্রমে একটির পর একটি করিয়া হিন্দুর যাবতীয় দেবকুল এখানে স্থান পাইতেছেন। মূর্ত্তিগুলি দেখা হইলে একটি কৌপীনপরিহিত হিন্দু ধীবরকে কলাপাতের টুক্‌রায় প্রত্যেক মঞ্চের সম্মুখে ভোগ সাজাইয়া দিতে বলিয়া প্রেমহরিদাস নিজে একটি কাঁসর বাজাইতে বাজাইতে প্রত্যেক দেবতার আগে দাঁড়াইতে লাগিলেন। ভোগের সামগ্রী মাত্র গুড়মাখা খই। কিছুক্ষণ কাসর বাজাইবার পর যবন হরিদাস মহাদেবের অগ্রে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া যুক্তহস্তে বসিয়া মানসিক পূজা ও প্রার্থনা করিলেন।

প্রেমহরিদাসী পূজা ও সন্ধ্যারতি করিয়া থাকে। পিতা ভোগ দেয়। চয়ন বিবির দেবসেবায় অধিকার নাই। শেখ খেরকেটুর এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া—তাহাদের ঐকান্তিক ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। পূর্ব্বোক্ত দেবমূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে খেরকেটু এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করে—"আমি গত ১৩১৯ সালে স্বপ্নাদেশ জানিয়া নিম্নলিখিত দেবতাদিগের পূজা করিতে অধিকারী হইয়াছি। আশা করি, হিন্দু ভ্রাতৃগণ আমার সহায়তায় বিমুখ হইবেন না। আমি প্রথমে

মহাদেব সন্ন্যাস ঠাকুরের পূজায় ব্রতী হই, পরে শক্তির বিভিন্ন মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছি, যথা—ভগবতী, জগদ্ধাত্রী, কালী, কৃষ্ণকালী, গঙ্গাদেবী, মনসা ঠাকুরাণী, বুড়ী ঠাকুরাণী, বসন বড়ুয়া, মশান ঠাকুর। বর্ত্তমানে বাসন্তী দেবীকে স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। এই জন্য হিন্দু ভ্রাতৃগণের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করি। মহাদেব ঠাকুরের দর্শন হইলে পর জন্মাষ্টমী মূর্ত্তি, রাম সীতার রাজ্যাভিষেক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গৌরনিতাই ও দোললীলা মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছি। বাদশাহী আমলে বাধ্য হইয়াই হউক অথবা লোভে পড়িয়াই হউক আমার পূর্ব্ববংশ নবীর দীন মানিয়া চলিলেও আমি পৌত্তলিক ধর্ম্ম মানিব, কেন না আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও দেশান্তরিত হন নাই। * * * হিন্দুস্থানের গৌরব রক্ষার জন্য আমি বৈদিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পূজা-পার্ব্বণ করিব।" পরমহংস পরি-ব্রাজকাচার্য্য গঙ্গানন্দ স্বামীজি মহারাজ প্রমুখ কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু যবন হরিদাসের হিন্দুধর্ম্মে আস্থা, প্রগাঢ় ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখিয়া লিখিয়াছেন—"মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে এই ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দু ছিল, কিন্তু মুসলমান রাজার পীড়নে বা লোভে যে কারণেই হউক, মুসলমান হইতে বাধ্য হইয়াছিল, সম্প্রতি এই ব্যক্তি দৈবা-দেশ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রীতিমত 'বার মাসে তের পার্ব্বণ' করিতে ইচ্ছা করে ও যথাসম্ভব করিয়া থাকে। ইহাতে সকল হিন্দু সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ইহার আনন্দোৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।"

আমরা খেরকেটুর মুখে শুনিলাম, যে ভূখণ্ডের উপর বর্ত্তমান দেব-মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত হইয়াছে তাহার নিম্নদেশে—বহু নিম্নে প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী আছে। সেই পাতালপুরী অসংখ্য দেব দেবীতে পূর্ণ। এক দিন স্থানীয় ব্রাহ্মণ জমীদার শিবেন্দ্র বাবু, তাহার ভ্রাতা বিজয় বাবু, জনৈক ক্ষত্রী এবং শেখ খেরকেটু রাত্রিযোগে একই সময় স্বপ্ন দেখেন যে ইঁহারা এই পাতালপুরীতে দেবতাদিগের মধ্যে নীত হই-য়াছেন। শিব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে এই সকল

দেবতার পূজা ও নিয়মিত সেবা করিতে পারিবে?” এতগুলি দেবতার পূজা ও রীতিমত সেবা করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া অপর তিন জন পশ্চাৎপদ হইলে যবন হরিদাস বলিলেন “আপনি যদি ভরসা দেন তাহা হইলে, আমি মুসলমান হই আর যাই হই, আপনার প্রসাদে সকল ভার লইতে পারি।” তখন মহাদেব প্রসন্ন হইয়া দেবসেবার ভার ইহারই উপর ন্যস্ত করিলেন। ইহার কন্যাকে কুমারী রাখিবার কারণ এই যে, কন্যাটির ৭ বৎসর বয়সে একবার জ্বর হয় এবং তাহাতে আট দিন পর্য্যন্ত তাহার অন্ন বন্ধ ছিল। নবম দিনের রাত্রি দশটার সময় জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে এবং শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়। সকলেই কন্যাটি মৃত জানিয়া আর্ত্তনাদ করে। কিন্তু সেই সময় তন্দ্রাবেশে জ্যোতির্ম্ময় শিবমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া বলেন “তুমি আমার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া আমার সেবা কর, নিত্য ভোগ দাও, কন্যা ভাল হইবে, কিন্তু যদি তাহার বিবাহ দাও তাহা হইলে মুসলমানের সঙ্গে নহে, হিন্দুমতে ও হিন্দুর সহিত।” বলা বাহুল্য শিবের আদেশ পালিত হয় ও কন্যা অচিরে পুনর্জ্জীবিত হয়। পিতা ও কন্যা প্রায়ই স্বপ্নে দেবতাদের আদেশ প্রাপ্ত হয়—তাহাদের অলৌকিক রূপ-মাধুরী ও লীলা দর্শন করিয়া চরিতার্থ হয়। এই পরিবারের বিনীত ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই তৃপ্ত হয়, কিন্তু ইহাদের প্রতি স্থানীয় মুসলমানসমাজ খড়্গহস্ত। বিদ্বেষের বহ্নি পূর্ব্ববৎ তীব্র না থাকিলেও আজিও লুপ্ত হয় নাই। তাহার ফলে হবি প্রভৃতি কতিপয় মুসলমান পিতাকে আক্রমণ ও প্রহার করিয়া কন্যাকে লইয়া পলায়ন করে। তৎপূর্ব্বে হিমাতুল্লা মণ্ডল উক্ত হবির পুত্র নজরের সহিত খেরকেটুর কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে খেরকেটু তাহাতে স্বীকৃত হয় না। প্রস্তাব ব্যর্থ হইল দেখিয়া এবং মুসলমানের হিন্দু আচার অনুষ্ঠানে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা বলপূর্ব্বক কন্যাকে লইয়া গিয়া নজরের সহিত বিবাহ দিবার চেষ্টা করে। মোকদ্দমায় অপরাধীদিগের কারাদণ্ড হয়। প্রতিবাদীপক্ষ বলে ইতিপূর্ব্বে নজরের সহিত খয়রুন্নিসার যথাবিধি বিবাহ

হইয়াছিল কিন্তু কন্যার পিতা কন্যাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া তাহার স্বামী তাহাকে লইয়া গিয়াছিল। দিনাজপুর সেশন আদালতে আপীল হইলে পিতা ও কন্যা বিবাহ অস্বীকার করে। কন্যার এজাহার শ্রবণকালে তাহার অধরে ঈষৎ হাসির রেখা দেখিয়া এবং অনর্গল উক্তির পারিপাট্য লক্ষ্য করিয়া জজ বাহাদুর তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন, অধিকন্তু পুলিসের ডাইরী—যাহার সাহায্যে কন্যাপক্ষেরও মোকদ্দমার অনেকটা কিনারা হইতে পারিত—কোন অজ্ঞাত কারণে অদৃশ্য হওয়ায়, যথেষ্ট প্রমাণাভাবে দণ্ডিত অপরাধীরা নিষ্কৃতি লাভ করে। কন্যাকে দেখিলে, তাহার যে বিবাহ হইয়াছিল, ইহা মনে করিতে পারা যায় না।

আমরা দেখিলাম, প্রেম হরিদাসের গৃহে বিবিধ দেবদেবী পূজা প্রাপ্ত হইলেও শিবই তাহার প্রধান উপাস্য। হরিদাস নাম হইলেও অন্তরে তিনি পূর্ণ শিবদাস। কিন্তু হরি আর হরে যখন প্রভেদ নাই তখন হরিদাস বলিতে আপত্তি কি? দেখিলাম যত কিছু প্রার্থনা, যত মানত, যাত্রীদিগের জন্য মঙ্গল কামনা অর্থাৎ তাহার আবেদন ও নিবেদন সমস্তই শিবের সম্মুখে এবং তাঁহারই চরণে।

কৃষ্ণকালী মূর্ত্তি জলে ভিজিয়া অনেকটা বিরূপ হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম করতোয়ায় বন্যা আসিয়া এই সকল স্থান জলপ্লাবিত হয়। সেই জলে এই মূর্ত্তি ও গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি বিসর্জ্জিত হইয়াছিল, কিন্তু তিন দিন পরে মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠে। তখন খেরকেটু প্রবল জ্বরে অভিভূত ছিল। মঙ্গলবার প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হয়। বুধবার জ্বর হয় এবং বৃহস্পতিবার রাত্রে স্বপ্ন হয়। স্বপ্নে মহাদেব বলেন, "প্রতিমা জলে দিলি কেন? কৃষ্ণকে জলে দিতে নাই। গলিয়া বা চূর্ণ হইয়া গেলেও বিসর্জ্জন করিতে নাই। তুই একখানা ঠাকুরও জলে দিবি না প্রতি বৎসর নূতন মৃণ্ময় মূর্ত্তি গড়াইবি ও পুরাতনগুলি রাখিয়া দিবি। স্বপ্নাদেশ পাইয়া খেরকেটু প্রভাত হইতেই কৃষ্ণকালী ও গঙ্গাদেবীকে তুলিতে গিয়া দেখিল মূর্ত্তি জলে ভাসিয়া উঠিয়াছে। কোথা হইতে দুই জন ব্রাহ্মণ সাঁতার দিয়া প্রতিমা লইয়া আসিতেছে এবং এক বৃদ্ধ লাঠি

ধরিয়া জল ভাঙ্গিয়া সঙ্গে আসিতেছে। খেরকেটু বৃদ্ধাকে বিনা ভেলা বা ডোঙ্গায় সেই জলরাশি ভেদ করিয়া আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণদের নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, "সে খবরে তোমার প্রয়োজন নাই, তুমি আর প্রতিমা ভাসাইও না।" ঠাকুর ঘরে তুলিয়া খেরকেটু ফিরিয়া দেখিল কেহই তথায় নাই। তাঁহাদের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। তদবধি যবন হরিদাসের গৃহে হিন্দুর দেবপ্রতিমাগুলি ক্রমাগত সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে, প্রতিবৎসর নুতন নুতন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতেছে এবং সকলেই এই ভক্ত পিতা ও কন্যার সেবায় তৃপ্ত হইতেছেন।

এখানকার দেবতাদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ শুনিলাম। কিছুদিন হইল লক্ষণপুরের জনৈক মুসলমান হিম্মতুল্লা গণেশ ঠাকুরের কাপড় চুরি করিয়া লইয়া যায়। সেই দিনই তাহাকে বাঘে খায়। তাহার পরিবার ও বংশধরেরা পরে ভিটা-ছাড়া হয়। আমরা যাইবার দুইদিন পূর্ব্বে মোহন নামক এক হিন্দুস্থানীর ছেলেকে ভূতে ধরে এবং তাহার উৎকট প্রমেহ রোগ হয়। মোহন এক ছড়া কলা, পাঁচ ছিলিম গাঁজা, ও আধসের মুড়কী ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া দেয়। পরদিন তাহার পুত্র আরোগ্য লাভ করে। আর একদিন এক মুসলমান স্ত্রীলোক, নাম ফেলানী বিবি, মহিষমর্দ্দিনীকে নিবেদিত নারিকেল চুরী করিয়া খায়। সে পাঁচ ছয় দিনের জ্বরে ও চুরির তিন দিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মোকদ্দমা মামলা হইলে অনেকে এখানে আসিয়া পূজা দেয় এবং দেবতাস্থানে মানত করিয়া জয়ী হইয়া যায়। এইরূপ নানা কথা শুনা যায়। পূজাপার্ব্বণে এখানে নানাস্থান হইতে হিন্দুনরনারী আসিয়া যোগদান করে। তখন কলিকাতা হইতে প্রায় আড়াইশত মাইল দূরে এই নিস্তব্ধ কুটীর ও পল্লীঘাট জনকোলাহল এবং হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া উঠে।

আমাদিগকে আহার করাইবার জন্য প্রেমহরিদাস ও তৎপত্নী চয়ন বিবি বিশেষ অনুরোধ করিলেও আমরা আহারাদি করিয়া

তথায় যাত্রা করিয়াছিলাম বলিয়া সে সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। অগত্যা তাঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আমাদেরই জন্য তাহাদের ক্ষেত্র-জাত ধান্য হইতে স্বহস্তে প্রস্তুত তণ্ডুল ও গুড় এবং সদ্যোধৃত কিছু মৎস্য লইয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। তথা হইতে আমরা শমী বৃক্ষ দেখিবার জন্য পশ্চিম দিকের পল্লীপথ ধরিয়া বহু ধান্যক্ষেত্র, বিল ও জলাভূমি অতিক্রম করতঃ সেই 'অচিনা গাছে'র দর্শন পাইলাম এবং তথা হইতে অর্দ্ধ মাইল চলিয়া বিলাইচণ্ডী ষ্টেশন হইতে সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিলাম।

স্বপ্নতত্ত্ব।

(৬)

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্য বা সমাধি-চৈতন্যের কথা আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিম্নতম চৈতন্য বা প্রতিক্রিয়া-মূলক চৈতন্যের (Reflex action) বিষয়ে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। আমাদের জাগ্রদবস্থার জ্ঞানময়-চৈতন্য ব্যতীত আর এক প্রকার নিম্নশ্রেণীর চৈতন্য আছে। উহাকে দৈহিক-চৈতন্য বলা যাইতে পারে, এবং উহাকে জাগ্রৎ-চৈতন্যের অপেক্ষা না রাখিয়াই স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে।

মনে করুন, একটি লোক গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় কলিকাতার কোন রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তিনি এতদূর চিন্তামগ্ন হইয়াছেন যে একরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য বলা যাইতে পারে—তথাপি যখনই কোন গাড়ি, ঘোড়া, সাইকেল বা মোটর তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা হইতেছে, তখনই তিনি আপনাকে বিপদ্ হইতে

রক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা কলিকাতার রাস্তায় চলিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এইরূপ আত্মরক্ষার জন্য আর জাগ্রৎ-মনের চিন্তা এবং বিবেচনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহাদের স্থূল দেহই যেন চৈতন্যময় হইয়া স্বতঃই এই কার্য্য সম্পন্ন করে। দেহ-বিজ্ঞানের একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা আরও স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

যদি একটি ভেকের মস্তিষ্ক নষ্ট করিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাধীন-ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় যদি তাহার সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য রাখা যায়, তাহা হইলে সে তাহা গ্রহণ করিবে না, কিন্তু উহা তাহার মুখের মধ্যে দিলে সে তৎক্ষণাৎ তাহা গিলিয়া ফিলিবে। ইহা ভেকটির জ্ঞানকৃত আহার নহে—যন্ত্রবৎ গিলিয়া ফেলা মাত্র। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপে খাওয়াইয়া ভেকটিকে বহুদিন যাবৎ এমন কি, এক বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়। যদি ভেকটির কোন পায়ে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ ঐ পা-টিকে সরাইয়া লইবে। আর যদি বেশী আঘাত করা যায় তাহা হইলে লাফাইয়া সরিয়া যাইবে। অথবা তাহার পায়ে কোন তীব্র দ্রাবক প্রয়োগ করিলে সে অপর পা দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। কিম্বা ভেক-টিকে হাতের উপর রাখিয়া হাতটি আস্তে আস্তে কাৎ করিতে থাকিলে যখন সে পড়িয়া যাইবার মত হইবে, তখন এরূপ ভাবে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিবে যাহাতে পড়িয়া না যায়।

আপাতদৃষ্টিতে ভেকের এই সমস্ত কার্য্য বুদ্ধিপ্রণোদিত কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাতে বুদ্ধির লেশ মাত্র নাই; কারণ তাহার মস্তিষ্ক নষ্ট করা হইয়াছে। একটি যন্ত্রের কোন একটি অংশ টিপিলে একরূপ কার্য্য হয়, অপর একটি অংশ টিপিলে অন্যরূপ কার্য্য হয়, এইরূপ ব্যবহৃত অংশের পার্থক্য হিসাবে কার্য্যেরও পার্থক্য হইয়া থাকে। এস্থলেও সেইরূপ ঘটিতেছে। বাহির হইতে যেরূপ উত্তেজনা পাইতেছে ভেকের দেহটিও তদনুরূপ

যন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়া যাইতেছে। সকলের পেশী-ক্রিয়া কিরূপে যন্ত্রবৎ সম্পন্ন হয়, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়—

অনেক সময় প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও দেহকে এইরূপ যন্ত্রবৎ কার্য্য হইতে বিরত রাখা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডারউইন (Darwin) কৃত একটি পরীক্ষার উল্লেখ করা যাইতে পারে। একদিন তিনি একটি বিষাক্ত সর্পকে একটি কাচের বাক্সে বন্ধ করিয়া ঐ বাক্সের গাত্রে আপনার গণ্ডদেশ স্থাপন করিয়া সর্পটিকে দংশন করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। মধ্যে দৃঢ় কাচ ব্যবধান থাকায় সর্পের শত চেষ্টাতেও তাঁহার সর্পদংশনের কোনই ভয় নাই, এ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেও যতবার ঐ সর্পটি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ছোঁ মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল ততবারই তিনি বাক্স হইতে গণ্ডদেশ সরাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগেও সর্পের ছোঁ মারিবার সময় নিজ গণ্ডদেশ বাক্সগাত্রে সংলগ্ন করিয়া রাখিতে পারেন নাই।

নিদ্রিতাবস্থায় মশকাদি দংশন করিলে দেখা যায়, নিদ্রিত ব্যক্তির হস্ত আপনা হইতেই উহাকে তাড়াইবার জন্য আঘাত করে। ইহাও দেহেরই প্রতিক্রিয়া।

অনেকে নিদ্রিতাবস্থায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। ইহাকে ইংরাজীতে somnambulism বলে। স্বপ্নাবস্থায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়ান দেহের প্রতিক্রিয়া দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই জন্য বোধ হয় নিদ্রাচর ব্যক্তি কখন কখন এরূপ কার্য্য করে যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় তাহা দ্বারা আদৌ সম্ভবপর নহে। যেমন কেহ কেহ নিদ্রাবস্থায় বাঁশের উপর দিয়া বা সরু প্রাচীরের উপর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। জাগ্রৎ অবস্থায় দেহের ভারকেন্দ্র এরূপভাবে স্থির রাখিয়া সঙ্কীর্ণ উচ্চস্থানের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেরূপ বিপৎসঙ্কুল কার্য্যে অনেকেরই মন স্থির থাকে না, মনের অস্থিরতাবশতঃ শরীরেরও ভারকেন্দ্র স্থির

না থাকাতে উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় দেহের যান্ত্রিক-চৈতন্য নিপুণভাবে ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিয়া অনায়াসে সেরূপ সঙ্কটস্থল পার হইয়া যায়। এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে যে, নিদ্রাচর ব্যক্তি অন্ধকারে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার কোন খানে একটিও ভুল হয় নাই।*

লেলৎ (Lelut), গাই (Guy) প্রভৃতি কতকগুলি পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, নিদ্রাচর ব্যক্তি কখন কখন সম্পূর্ণরূপে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও দেখিতে পায়। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই অবস্থায় চক্ষুর মণি (pupil) এত বিস্তৃত হয় যে, চক্ষুর পাতা দুইটির মধ্যে যে সামান্য ফাক থাকে, তাহার মধ্য দিয়াই সে দেখিতে পায়। ফ্রাঙ্ক (Frank) একটি নিদ্রাচর মহিলাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাঁহার চক্ষু একেবারে মুদ্রিত থাকিলেও তিনি স্পর্শের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ চিনিতে পারেন।† স্বপ্নাবস্থার এবম্বিধ অনুভূতিসমূহ বিজ্ঞানবিদ্ লম্‌ব্রোসোর (Lombroso) পরীক্ষিত একটি হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত বালিকার বিবরণের সহিত মিলে। তাহা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

হিন্দুদর্শনমতে আমাদের স্থূলদেহের ন্যায় একটি সূক্ষ্মদেহ আছে। এই সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব কেবল হিন্দুদর্শনের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত নহে। যাঁহারা প্রেততত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে এই সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়াছেন। আমাদের এরূপ অনেক অবস্থা আছে, যাহা শুধু স্থূলদেহের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, কাজে কাজেই একটি সূক্ষ্ম দেহের সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে।

হিপ্‌নটিজম্ (hypnotism) সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেই সূক্ষ্ম দেহের আভাস পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত

---

* Diderot's *Encyclopædie*—vide, article on 'Somnambulism.'

† Sleep—By Marie De Manaceine.

স্বরূপ, ঐ বিষয়ক কতকগুলি পরীক্ষা লেখক কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া একখানি ডাক্তারী পত্রিকায় * প্রকাশিত হইয়াছে। প্যারীর বিজ্ঞান-সভায় পঠিত হিপ্‌নটাইজড্‌ অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি তাহাদের অন্যতম।

যদি কোন সহজ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি একটি উজ্জ্বল চিত্রের প্রতি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া সাদা দেয়ালের উপর দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে সে সেই উজ্জ্বল চিত্রের একটি প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইবে। কিন্তু ঐ প্রতিচ্ছবির বর্ণ যথার্থ ছবির বর্ণের complementary হইবে। অর্থাৎ যথার্থ ছবিটি লাল হইলে প্রতিচ্ছবিটি সবুজ হইবে অথবা উহা হরিদ্রাবর্ণ হইলে, এই প্রতিচ্ছবিটি নীলবর্ণ হইবে।

যদি কোন লোককে হিপ্‌নটাইজ্‌ করিয়া তাহার হস্তে একখানি সাদা কাগজ দিয়া বলা যায় যে ইহাতে একটি লালরংয়ের ক্রুশ (cross) অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ঐ সাদা কাগজের উপর যথার্থই একটি লালরংয়ের ক্রুশ দেখিতে থাকিবে। অতঃপর তাহাকে আর একখানি সাদা কাগজ কিম্বা দেওয়ালের উপর তাকাইতে বলিয়া যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তুমি কি দেখিতেছ? তাহা হইলে সে উত্তর দিবে আমি একটি সবুজ রংয়ের ক্রুশ দেখিতেছি, এবং যখন এই হিপ্‌নটাইজড্‌ ব্যক্তি সবুজ রংয়ের ক্রুশের প্রতিচ্ছবি দেখিতেছে, তখন যদি তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার নিকট একটি চুম্বক (Magnet) আনা যায়, তাহা হইলে ঐ প্রতিচ্ছবিটি কিছু বিকৃত হইয়া যায়, অর্থাৎ উহার সবুজ রংয়ের উপর লাল রং দেখা যায় এবং উহার আকৃতিরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।†

হিপ্‌নটাইজড্‌ অবস্থায় এইরূপ কোন কোন বিশেষ স্থলে চৌম্বিক শক্তিতে শুদ্ধ মানসিক চিত্রেরই পরিবর্ত্তন হয় এমন নহে, মানসিক সংকল্পরও পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়।

---

* Vide—The Calcutta Medical Journal, November, 1910.

† Parinand—*Society-de-Biologie.*

কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, স্বপ্নেও চৌম্বিক শক্তিতে মানসিক চিত্রের ঐরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে।* উত্তরদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবার বিরুদ্ধে আমাদের যে সংস্কার আছে, তাহার কারণ ইহাও হইতে পারে।

স্থূল দেহের উপরে চৌম্বিক শক্তির এরূপ প্রভাব দেখা যায় না। কোন কোন হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর উপর চৌম্বিক শক্তির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় বটে। যেমন কোন হিষ্টিরিয়া রোগীর শরীরের একদিকের অনুভূতি লোপ পাইলে তাহার ঐ অঙ্গে চৌম্বিক শক্তি প্রয়োগ করিলে উহার অনুভব শক্তি ফিরিয়া আসে; কিন্তু তাহার শরীরের অপর দিকের অনুভবশক্তি লোপ পাইয়া যায়। হিষ্টিরিয়া রোগীর এইরূপ অবস্থার বিষয় লেখক কর্তৃক একখানি ডাক্তারী পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, এই অবস্থা স্থূলদেহের পীড়া বিশেষ মনে করা অপেক্ষা, কোন সূক্ষ্মদেহের পীড়াজনিত মনে করাই সঙ্গত।†

১৯৯৬ সালে মুর্সো জিয়ান বেকোরায়েল (M. Jean Becquerel) স্নায়ুরশ্মি (Nerve rays) নামক একটি প্রবন্ধে তাঁহার একটি নূতন গবেষণা প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, জীবদেহ হইতে একপ্রকার অদৃশ্য রশ্মি বাহির হয়—যাহা উহাকে ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা অচৈতন্য করিলে আর থাকে না। জীব মরিবার সঙ্গে সঙ্গে দেহ হইতে এই রশ্মি লোপ পায়। ইহাও সূক্ষ্মদেহের একরূপ ক্রিয়া বলিয়া বোধ হয়।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থূলদেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে কার্য্য করিতে পারে এমন কোনও চৈতন্যের অস্তিত্ব সহজে স্বীকার করিতে চাহেন না। ১৯১১ সালের ব্রিটিস এসোসিয়েসন সভার শারীর-বিজ্ঞান-শাখার প্রফেসর জে, এস্, ম্যাকডোনাল্ড (J. S. Macdonald)

---

* Vide, Traite de Physiologie Vol. V. Page, 206.

† Vide, Journal Calcutta Medical Club, 1911, Vol. VI. Page 256, and also Vol. V Page 169.

সভাপতি ছিলেন। তিনি এই সভায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন,—আমাদের মন যে স্থূলদেহের ক্রিয়ার ফল এরূপ সিদ্ধান্ত সকল সময় টিকে না। স্থূলদেহ হইতে মনের একটি পৃথক্ সত্তা আছে। নিদ্রিতাবস্থায় এবং ঔষধাদির দ্বারা কৃত অচৈতন্যাবস্থায় মন যে কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল নহে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। * প্রফেসর ম্যাকডোনাল্ডের এই সব কথায় সভার মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হয় এবং আপত্তি উঠে।

হিন্দুদর্শনের ন্যায় জীববিজ্ঞান শাস্ত্রে সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে জীবতত্ত্বের অনেক জটিল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়।

দার্শনিক প্রবন্ধলেখক এমারসন (Emerson) বলিয়া গিয়াছেন, "Nature is self-similar," অর্থাৎ প্রকৃতি সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের ভিতর একটি মিলনের পক্ষপাতী। প্রকৃতির নিম্নস্তরের বিভাগগুলিও যে নিয়ম দ্বারা পরিচালিত, উচ্চস্তরের বিভাগগুলিও ঠিক সেই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। প্রকৃতির নিম্নস্তরে যদি আমরা কোন নিয়ম দেখিতে পাই, উহার উচ্চস্তরেও যে ঐরূপ নিয়ম বিদ্যমান তাহা অনুমান করা অযৌক্তিক নহে।

আমরা প্রবন্ধারম্ভেই অনুমান করিয়া লইয়াছি যে, আমাদের স্থূলদেহের একটি পৃথক দৈহিক-চৈতন্য আছে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেও তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। সেইরূপ যদি আমরা অনুমান করিয়া লই যে, আমাদের সূক্ষ্মদেহেরও এক প্রকার দৈহিক-চৈতন্য আছে, তাহা হইলে স্থূলদেহের দৈহিক-চৈতন্যের সহিত সূক্ষ্মদেহের দৈহিক-চৈতন্যের মিলের একটি লক্ষণ সুস্পষ্টই বুঝা যায়। সেটি

---

* In man mind was associated with the brain. There was also the point that even in the case of the brain, such phenomena as sleep and deep anæsthesia familiarize us with the fact, that the mind was not necessarily always associated with the brain, but only with this when in a certain condition—Professor J. S. Macdonald's Presidential Speech

এই যে উভয় চৈতন্যই যেন কোন উত্তেজনায় প্রবুদ্ধ হইয়া নাটকীয় দৃশ্যের ন্যায় অভিনয় দ্বারা স্বীয় উপলব্ধি প্রকাশ করে। স্থূলদেহের দৈহিক-চৈতন্যের লক্ষণ যেমন বাহিরের উত্তেজনার সংঘাতে হস্তপদ-সঞ্চালন প্রভৃতিতে অভিনয়ের ভাবে প্রকাশ পায়, যদি স্বপ্নের সহিত সূক্ষ্মদেহের কোন সম্বন্ধ মানিয়া লওয়া যায়, তবে তাহাও সেইরূপ বাহিরের উত্তেজনার সংঘাতে মনোরাজ্যে ঘটনামূলক দৃশ্যাবলী অভিনয় দ্বারা উপলব্ধি প্রকাশ করে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হয় না।

নিদ্রিতাবস্থায় দেহের উপর নানাপ্রকার উত্তেজনা প্রয়োগে কিরূপ স্বপ্ন দৃষ্ট হয় তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত মনোবিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া যাইতেছে—

(১) নিদ্রিতাবস্থায় পদতলে গরম বোতল লাগাইলে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, শয়তান তাঁহাকে নরকাগ্নির উপর দিয়া লইয়া যাইতেছে। একজন আমেরিকান স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তাম্র হইতে কিরূপে স্বর্ণ উৎপন্ন করা যায় তাহা বলিয়া দিতেছেন না বলিয়া আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ তাঁহাকে অগ্নির উপর দাঁড় করাইয়াছে। একজন মহিলা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি যেন প্রজ্জ্বলিত গৃহ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আর একজন মহিলা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি যেন একটি ভল্লুকী। তাঁহাকে নৃত্য শিখাইবার জন্য গরম প্লেটের উপর দাঁড় করান হইতেছে।

(২) একজন স্ত্রীলোকের নিদ্রিতাবস্থায় বৃদ্ধাঙ্গুলী চুষিবার অভ্যাস ছিল। তিনি ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করিবার জন্য একদিন শয়ন করিবার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলীতে তিক্ত ঔষধ মাখাইয়া নিদ্রা গেলেন। অতঃপর স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি যেন নিম্বকাষ্ঠের মত তিক্ত কাষ্ঠের একখানি জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইতেছেন। জাহাজের হাওয়া এরূপ তিক্ত যে তাঁহার সর্ব্বশরীর তিক্ত হইয়া যাইতেছে। তিনি যাহা খাইতেছেন, যাহা পান করিতেছেন, সমস্তই তিক্ত বোধ হইতেছে। কূলে আসিয়া তিনি মুখ ধুইয়া

ফেলিবার জন্য এক গ্লাস ভাল জল চাহিলেন। কিন্তু তাঁহাকে নিম্ব কাষ্ঠ সিদ্ধ করা জল দেওয়ায় তাহাও অত্যন্ত তিক্ত বোধ হইল। কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত হওয়ায় তিনি তাহাই খাইয়া ফেলিলেন। পরে তিনি প্যারী গিয়া জনৈক বিখ্যাত ডাক্তারের পরামর্শ চাহিলেন। ডাক্তার গরুর পিত্তের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে যদিও তাঁহার শরীর হইতে কাষ্ঠের তিক্ত রস নির্গত হইয়া গেল, তথাপি ঐ পিত্তের তিক্তরসে তাঁহার সর্ব্বশরীর যেন জর জর হইয়া উঠিত। অগত্যা তিনি এক ধর্ম্মযাজক পোপের শরণাপন্ন হইলেন। পোপ ব্যবস্থা করিলেন যে, অমুক দেশে অমুক লোকের স্ত্রীর দেহ লবণ-ময় হইয়া রহিয়াছে। এই মহিলা যদি সেখানে গমন করিয়া ঐ মূর্ত্তির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত কতকটা অংশ ভক্ষণ করেন তাহা হইলে তাঁহার পীড়া সারিয়া যাইবে। মহিলাটি অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সেই মূর্ত্তির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মনে করিলেন ইহার বৃদ্ধাঙ্গুলীটি ভাঙ্গিয়া খাইতেছেন। এই সময় তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তিনি দেখিলেন যে, নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীটিই চুষিতেছেন। *

(৩) গন্ধ হইতেও স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। কোন ডাক্তারকে পনীর বিক্রেতার দোকানে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছিল। দোকানটি পনীরের গন্ধে ভরপূর ছিল। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক অপরাধের জন্য তাঁহাকে পনীরের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে এবং চতুর্দ্দিক হইতে ইঁদুর আসিয়া তাঁহার শরীর দংশন করিতেছে। ঘরটিতে ইঁদুরের বিশেষ উপদ্রব ছিল এবং নিদ্রার পূর্ব্বে তাঁহার ঘুমের যথেষ্ট ব্যাঘাত করিয়াছিল।

নিদ্রিত ব্যক্তির চক্ষুর উপরে আলোক ফেলিলে, সে যেন স্বর্গের আলোক বা জ্যোতির মধ্যে কিছু দেখিতেছে, এইরূপ স্বপ্ন দেখিবার কথা বিরল নহে। †

---

* Treatise on Insanity by W. A. Hammand.

† Journal of Psychological Medicine, July—1856.

(৪) বিখ্যাত দার্শনিক হেন্‌রী বার্গসের স্বপ্নতত্ত্বের পুস্তকে চক্ষুতে আলো লাগায় স্বপ্নদর্শনের একটি বিবরণ আছে। উহা এইরূপ;—কোন হাঁসপাতালের নার্শ (Nurse) শয়ন করিতে যাইবার সময় আলো হাতে লইয়া রোগীগুলি কিরূপ অবস্থায় আছে তাহা একবার দেখিয়া যাইতেছিল। তাহার হস্তস্থিত আলোকের রশ্মি চলিয়া যাইবার সময় এক নিদ্রিত রোগীর চক্ষুর উপর পড়ায় সে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল।—"পীড়িত হইবার পূর্ব্বে সে যে কার্য্যে ছিল, সেই নৌ-সৈনিকের কার্য্যেই পুনরায় নিযুক্ত হইয়াছে। যুদ্ধের কার্য্যে তাঁহাকে ফ্রান্স হইতে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্, টুলোঁ, ক্রিসিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতে হইল। সে বিদ্যুৎ দেখিতে পাইল ও বজ্রধ্বনি শুনিতে পাইল। অবশেষে এক যুদ্ধে তাহার সম্মুখে একটি কামানের গোলা পড়িতে দেখিয়া ভয়ে চমকিত হইয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়া দেখিল, গমনশীলা সেবিকার হস্তস্থিত আলোক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চোখের উপর পড়িয়াছে মাত্র।*

নিদ্রিত ব্যক্তির কাণের কাছে পিস্তল আওয়াজ করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে, সে কোন স্বপ্ন দেখে কিনা। প্রায়ই দেখা গিয়াছে, তাহার স্বপ্নের কথা মনে থাকে না; কিম্বা হয়ত সে কিছু স্বপ্ন দেখে নাই। কিন্তু কখন কখন এই শব্দ হইতে উৎপন্ন স্বপ্নের বিবরণ পাওয়া যায়। নিম্নে এইরূপ একটি স্বপ্নের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

(৫) নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিয়াছিল, যেন সে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়াছে। কিছুদিন সৈনিকের কাজ করিয়া তাহার আর ঐ কাজ ভাল লাগিল না। একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পলায়ন করিল। তাহাকে ধরিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। সে অশেষ চেষ্টা করিয়া তাহাদের হাত এড়াইয়া চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে ধৃত হইল। তখন সামরিক বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হইল,

* Dreams—by Henri Bergson.

এবং তাহাকে গুলি করিয়া মারিবার হুকুম দেওয়া হইল। অতঃপর যখন তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া গুলি করা হইল, তখন গুলির আওয়াজে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একজন টেলিগ্রাফের সিগ-নালার (Signaller) রাত্রে হঠাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া টেলিগ্রাফের খবর লইতে লাগিল। কিন্তু তখনও তাহার চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিতে-ছিল। প্রথম ৩।৪টি শব্দ শুনিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার জানিত একটি বড় নাম তারযোগে আসিতেছে। ইতিমধ্যে সে একটু ঘুমাইয়া পড়িল। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে শুনিতে পাইল যে ঐ নামের শেষের অক্ষরগুলি তারযোগে আসিতেছে। বোধ হয় সে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র ঘুমাইয়াছিল। ইতিমধ্যে সে এক দীর্ঘ ব্যাঘ্র শীকারের স্বপ্ন দেখিয়াছিল। সম্ভবতঃ টেলিগ্রাফের টক্ টক্ শব্দগুলি, স্বপ্নে ব্যাঘ্র-শীকারের গুলির আওয়াজে পরিণত হইয়াছিল।

ডাক্তার ফ্রুডের মতে যে সকল স্বপ্ন বাহিরের উত্তেজনা হইতে জাত সেগুলি, মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিলে, কোন না কোনরূপ উদ্দেশ্যজড়িত দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্ন অনেক সময় এইরূপ ভাবে সৃজিত হয় যে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইয়া দেওয়াই যেন ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। অনেক সময় স্বপ্ন খুব বিকট হয়—তাহার উদ্দেশ্য স্বপ্নের বিকটতা দ্বারা উহার উত্তেজনার তীব্রতাকে চাপা দেওয়া। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নিজের কোন গূঢ় ইচ্ছার সহিত স্বপ্নদৃশ্যের সংযোগ থাকে। তাহার ফলে উত্তেজনার সত্যতা লোপ পাইয়া উহা স্বপ্নেরই অংশীভূত হইয়া যায়। এইরূপে স্বপ্ন যেন কোন প্রকারে নিদ্রিত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া অবোধ শিশুর মত শান্ত করিয়া রাখে। ফলে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইতে দেয় না। উত্তেজনার জন্য সে যদি সজাগ হয়, তবে সেই স্বপ্ন-ব্যাখ্যার কথা অস্পষ্টভাবে মনে উদয় হওয়ায় বোধ হয় যে উত্তেজনাটি যথার্থ নহে—উহা একটি স্বপ্ন কিম্বা বাজে জিনিস, অতএব আমি নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাই।

স্বপ্ন যেন রাত্রিকালের প্রহরীর কার্য্য করে। পথে কোন গোলমাল হইলে যাহাতে লোকের নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, এই জন্য প্রহরী গোলমাল মিটাইয়া দেয়। কিন্তু যদি এরূপ বিশেষ কোন গোলমাল হয় যে সে নিজে উহা মিটাইতে অক্ষম, তখন পল্লীর লোকদিগকে ডাকিয়া তুলিবার চেষ্টা করে।

স্বপ্নের অনুভূতির মধ্যে কোন বিশেষরূপ উত্তেজনা উপস্থিত হইলে স্বপ্নদ্রষ্টাকে জাগাইয়া দিবার চেষ্টার ভাব দেখা যায়। শিশুর মাতা গৃহকর্ম্মে পরিশ্রান্ত হইয়া গভীর নিদ্রা যাইতেছেন। ঘরের উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গেলেও তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু শিশু-সন্তানের অল্প নড়াচড়ার শব্দেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। যাঁহারা রোগীর সেবা করেন, তাঁহাদেরও এইরূপ হইয়া থাকে। রোগীদের সামান্য শব্দেই তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে। অন্য শব্দে তাঁহাদের বড় একটা নিদ্রাভঙ্গ হয় না। অনেকের চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হয় না; কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তির নাম ধরিয়া আস্তে আস্তে ডাকিলেই নিদ্রাভঙ্গ হয়। কোন স্থলে আবার শব্দ বন্ধ করিলে নিদ্রাভঙ্গ হয়। যেমন, বিলাতে রাত্রে যে সব কল চলে তাহা যদি কোন কারণে বন্ধ হইয়া উহার ঘড়ঘড়ানি শব্দ থামিয়া যায়, তাহা হইলে পার্শ্ববর্ত্তী নিদ্রিত লোকদিগের তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়।

---

* বিলাতের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স তাঁহার প্রসিদ্ধ হাস্যরসময় উপন্যাস "পিক্‌উইক্ পেপারস্"এ একজন জজের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন যে, যতক্ষণ তাঁহার আদালতে উকীলদের বক্তৃতা চলিত ততক্ষণ তিনি চেয়ারে ঠেসান দিয়া ঘুমাইতেন, বক্তৃতা বন্ধ হইলে নিস্তব্ধতার দরুণ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত।

ভিক্টর হিউগো তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস "লে মিজারেবল্"এ—বেরিকেডের যুদ্ধ-প্রসঙ্গে "গ্রাণটেয়ার" নামক একজনের নিদ্রার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন। বেরিকেডে যতক্ষণ যুদ্ধ হইতেছিল ততক্ষণ অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ও কোলাহলেও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, কিন্তু যখন বেরিকেড অধিকৃত হইল এবং যুদ্ধকোলাহল থামিয়া গেল, তখন সেই নিস্তব্ধতায় গ্রাণটেয়ারের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

এ সব স্থলে নিদ্রিত ব্যক্তির মনে জাগিবার একটি ইচ্ছা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকে। স্বপ্ন যেন এই ইচ্ছাটিকে ভুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখে। কিন্তু বিশেষ কোনও উত্তেজনা আসিলে এই ইচ্ছাটিকে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাতে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত অপরাপর স্থলে ভয়ের স্বপ্ন প্রভৃতি দেখাইয়া নিদ্রিত ব্যক্তিকে স্বপ্ন যেন জাগাইবার চেষ্টা করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ দীর্ঘ স্বপ্ন দেখা কিরূপে সম্ভবপর, তাহার ব্যাখ্যা কোন পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের পুস্তকে খুঁজিয়া পাই নাই। মস্তিষ্ক যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত দীর্ঘ চিন্তা করিতে পারে, জাগ্রদবস্থায় তাহার কোন দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেই জন্য স্বপ্নে মস্তিষ্ক ব্যতীত অন্য কোনরূপ সূক্ষ্মতর যন্ত্রের ভিতর দিয়া মন কার্য্য করে, এরূপ অনুমান আমাদের বাধ্য হইয়াই করিতে হয়।

থিওজফিক্যাল সোসাইটির বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট সুপ্রসিদ্ধা আনি-বেশান্ত তল্লিখিত একখানি পুস্তকে এইরূপ স্বপ্নের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি পিস্তলের আওয়াজ উৎপন্ন স্বপ্নটির বিষয় লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে যখন নিদ্রিত ব্যক্তির কর্ণের নিকট পিস্তলের আওয়াজ করা হইয়াছিল, তখন এই শব্দ দুইটি বিভিন্ন পথ দিয়া তাহার মস্তিষ্কে পৌঁছিয়াছিল। পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে এক পথে তাহার সূক্ষ্মদেহ এই শব্দের উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল এবং অন্যপথে এই শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল। যেন দুইটি পৃথক সংবাদ-বাহক বিভিন্ন সময়ে একই সংবাদ লইয়া আসিল। প্রথম সংবাদদাতা উপস্থিত হইয়া কথায় না বুঝাইয়া অভিনয় করিয়া সংবাদ দানে প্রবৃত্ত হইল এবং পরবর্ত্তী সংবাদদাতার সংবাদ মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া মনের নিকট আসিতে যে বিলম্ব হইল, তাহারই মধ্যে সে এক বিস্তৃত নাটকের অভিনয় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

কর্ণের ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে পিস্তলের শব্দ পৌঁছিতে কত সময় লাগে তাহা গণনা করা যায়। ইহা এক সেকেণ্ডের শতাংশের এক ভাগ অপেক্ষাও অল্প। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই এত দীর্ঘ স্বপ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল।

আনি-বেশান্ত বলিয়াছেন যে, নিদ্রিতাবস্থায় অনেক অনুভূতি আমাদের সূক্ষ্মদেহের দ্বারা অপরোক্ষভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। এই অনুমানটিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে স্বপ্নতত্ত্বের অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা সরল হইয়া যায়—পরবর্ত্তী কতিপয় প্রবন্ধে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

—*—

গত ২৮শে অক্টোবর পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উত্তর-বঙ্গ বন্যা-কার্য্যের বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে দুবলহাটী ও হাঁসাইগাড়ী কেন্দ্র দুইটী, যাহা উক্ত তারিখেও বন্ধ হয় নাই, গত ৪ঠা নভেম্বর ও ৩০শে অক্টোবর তারিখে শেষ বিতরণান্তে বন্ধ করা হইয়াছে। শেষ সপ্তাহে দুবলহাটী কেন্দ্র হইতে ৫।।৪ মণ চাউল ৩৭ খানি গ্রামের ১১২ জন ব্যক্তিকে ও হাঁসাইগাড়ী কেন্দ্র হইতে ৯/৪ মণ চাউল ২৩ খানি গ্রামের ১৮২ জন ব্যক্তিকে এবং ৯৪০টী গরুর জন্য ১৩।৶০ কাহন খড় সাহায্য করা হইয়াছিল। উক্ত সপ্তাহে ৫০ জোড়া নূতন বস্ত্রও বিতরণ করা হইয়াছিল।

চাউল বিতরণ বন্ধ করিয়া দিলেও মিশনের এলাকাধীনে এরূপ অনেক দুঃস্থ পরিবার ছিলেন যাঁহাদের তখনও সাহায্য করা প্রয়োজন

ছিল। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এত অধিক নহে যে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সাহায্য করা চলে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল পরিবারবর্গকে এক কালীন কিছু অর্থসাহায্য করিয়া কার্য্য একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া স্থির হয়। ঐরূপ ৫৩৪টী পরিবারকে ১৮৪৪৷৵০ টাকা সাহায্য করিয়া গত ১৮ই নভেম্বর মিশনের সেবকগণ চলিয়া আসিয়াছেন। নিম্নলিখিত ৫টী কেন্দ্র হইতে অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল এবং নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ দেওয়া হইল।

কেন্দ্রের নাম	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ
নওগাঁ	৭০	২৭৮৲
ডুবলহাটী	৮৯	২৫৭৲
হাঁসাইগাড়ী	৩৯	১৪৫৷৹
ভাণ্ডারগ্রাম ও বিলকৃষ্ণপুর	১০১	৩৬৭৲
রাতওয়াল	২৩৫	৭৯৭৲

যুদ্ধ থামিয়া গেলেও এখনও নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। কলিকাতায় বস্ত্রের দাম পূর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পমূল্য হইলেও রেল কোম্পানী এখনও বস্ত্রের চালান গ্রহণ করিতেছেন না বলিয়া মফঃস্বলের বাজারসমূহে বস্ত্রের মূল্য পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। তাহার উপর শীত পড়ায় বস্ত্রাভাব যে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে এ সংবাদ মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ পাইতেছেন। এ দেশের দরিদ্রগণ বস্ত্রের অর্দ্ধভাগ পরিধান করিয়া অপরার্দ্ধ আচ্ছাদনরূপেই ব্যবহার করিয়া থাকে—কারণ, তাহাদের পৃথক আচ্ছাদন-বস্ত্র ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই। আচ্ছাদন বস্ত্রের অভাব হেতু অধিকাংশ দরিদ্র ব্যক্তিই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। শীতের প্রথম হইতেই এই ব্যাধিটীর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহাও দেখা যাইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে মিশন যতদূর সাধ্য দেশবাসীর সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া সাধারণকে বস্ত্রাদি দিয়া সেবা করিতে চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। এই কার্য্যে যিনি যেরূপ

সহায়তা করিতে চান তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারীর নামে প্রেরিত হইলে অতি সাদরে গৃহীত এবং স্বীকৃত হইবে।

গত অগ্রহায়ণ মাসের বস্ত্রবিতরণ-বিবরণী প্রকাশিত হইবার পর দুপতারায় (ঢাকা, ৩৬ জোড়া, ও সোণারগাঁয় (ঢাকা) ৩০ জোড়া, নোয়াখালীতে ৫২ জোড়া ও বাঁকুড়ায় ৩০ জোড়া বস্ত্র, এবং বস্ত্র বিতরণ জন্য কোটালিপাড়ায় (ফরিদপুর) ৫০৲ টাকা ও কোয়ালপাড়ায় (বাঁকুড়া) ১০০৲ টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে।

নোয়াখালীর চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে অসংখ্য ব্যক্তি ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তথায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সেবার জন্য বস্ত্র, ঔষধ এবং অর্থ প্রেরিত হইয়াছে।

কাশীর চারিদিকেও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইতেছে। স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হইতে তথায় সেবাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। রুগ্নকে ঔষধ, পথ্য এবং অভাব বুঝিলে বস্ত্রাদি দিয়া সেবা করা হইবে।

বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, মান্দ্রাজ প্রদেশেও এ বৎসর অন্নাভাব ঘটিয়াছে। তজ্জন্য এমন কি মান্দ্রাজ সহরে পর্য্যন্ত লুট-পাট আরম্ভ হয়। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উৎসাহে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ময়লাপুরের (উহা মান্দ্রাজ সহরের একটী পল্লী) দুঃস্থ পরিবারবর্গকে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে চাউল সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মিশন যে প্রণালীতে উক্ত সেবাকার্য্য করিয়া থাকেন তথায়ও সেই প্রণালীর অনুসরণ করা হইতেছে। বর্ত্তমানে সেবাকার্য্য অতি অল্পপরিসর লইয়া হইতেছে। প্রত্যহ যেরূপ অভাব বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে বোধ হয় শীঘ্র কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর বাড়াইতে হইবে। কিন্তু উহাতে সাধারণের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। স্থানীয় মিশন বিশ্বাস করেন যে, সাধারণের সহানুভূতির অভাব হইবে না।